তফসীরে নূরুল কোরআন

দ্বাদশ পারা

১২

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

দ্বাদশ খণ্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

দ্বাদশ খন্ড

দ্বাদশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, মরহুম ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	শাওয়াল-১৪৪০ জুন-২০১৯ আষাড়-১৪২৬
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
সর্বস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে	ঃ	নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
হাদিয়া	ঃ	৩৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (12): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam (R). Published by Al-Balag Publications. 12/17, Sir Sayed Ahmed Road. Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889
Price : 350.00

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم.

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অনন্ত অসীম শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বাদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। এটি তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন গ্রন্থের দ্বাদশ খন্ড পর্যন্ত রচিত এবং প্রকাশিত হওয়া লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক সকলের প্রতিই আল্লাহ্ পাকের এক অপূর্ব নেয়ামত। যাদেরকে আল্লাহ্ পাক এমন নেয়ামত দানে ধন্য করেন তাদের পবিত্রতম কর্তব্য হল আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া। তাই তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বাদশ খন্ডের প্রকাশনার এ শুভ-মুহূর্তে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আদায় করি সেজদায়ে শোকরানা। একথা ধ্রুব সত্য যে, আমাদের জীবন ও আমাদের শোকর গুজারীর সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত, অথচ আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত অনন্ত অসীম। তাই আল্লাহ্ পাকের অগণিত নেয়ামতের শোকর গুজারীতেও আমরা অক্ষম। এ অক্ষমতার জন্যে দরবারে এলাহীতে হই করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ্ পাক তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন। হে আল্লাহ্! দরুদ পেশ কর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদ ও আসহাবের প্রতি, পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে সে সব বস্তুর সংখ্যা অনুসারে।

বিশ্ব-স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের মা'রেফাত হাসিল করতে হলে এবং আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে হলে বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। কেননা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার জ্বলন্ত নিদর্শন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

(সূরা আলে-এমরান)

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً

"তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্ পাক তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ.

(সূরা যারিয়াত)

"এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে পৃথিবীতে বিশ্ব-স্রষ্টা ও পালনকর্তার বহু নিদর্শন রয়েছে"।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিশ্ব-স্রষ্টার পরিচয় বা মা'রেফাত হাসিল করা এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

বিশ্ব-স্রষ্টার মা'রেফাত হাসিল করার জন্যে কোরআনে করীমে আরো একটি পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে, আর তা হল আত্ম-পরিচয় লাভ করা। যে পর্যন্ত কেউ আত্ম পরিচয় লাভ না করবে সে পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না কেননা, মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অগণিত অপূর্ব নিদর্শন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

(সূরা যারিয়াত)

"আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাতের অনেক নিদর্শন, তবুও কি তোমরা দেখনা"?

পবিত্র কোরআন মানুষকে আত্ম-পরিচিতি লাভের পর তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার পরিচয় লাভের এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে আহ্বান জানিয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(সূরা নাহল)

"এবং আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে মাতৃ-গর্ভ থেকে বের করে আনেন, এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শ্রবণের জন্যে কর্ণ, দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর দান করেছেন, হয়তো তোমরা তাঁর হুজুরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে"।

বস্তুতঃ এভাবেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা-ধন্য হয়ে শূণ্যের তিমির অন্ধকার থেকে বাস্তবতার আলোয় আত্ম প্রকাশ করে।

আত্ম-পরিচয় লাভ করে স্রষ্টা ও পালনকর্তার পরিচয় অর্জনের সাধনায় অনুপ্রাণিত করে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

(সূরা মুলক)

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে শ্রবণের জন্যে কর্ণ এবং দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর দান করেছেন। তোমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ"।

আত্মবিস্মৃত এবং গাফলতের আবর্তে নিপতিত মানুষ যখন তার চোখের সামনে বিদ্যমান বাস্তব সত্যকেও দেখেনা, তখন তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়েও দেখাতে হয়। কখনো পবিত্র কোরআন এভাবেই মানুষকে সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্যে এবং বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়ঃ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ○ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ○ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ.

(সূরা বালাদ)

"আমি কি মানুষের চক্ষুদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহবা সৃষ্টি করে ভাল ও মন্দ, ডান ও বাম উভয় পথের পরিচয় দান করিনি"?

মানুষ যখন এভাবে আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করে তখন তার কর্তব্য হয় আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হওয়া। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল তার স্রষ্টার বন্দেগী করা। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আর জ্বীন ও মানুষকে আমি এজন্যে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার এবাদত করে"। আর এবাদতের মূলকথা হল আল্লাহ পাকের জিকর, জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা, জীবনের কোন মুহূর্ত তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল না থাকা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ.

(অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে স্মরণ কর দন্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়) আর আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيْمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ.

(সূরা আলে-এমরান)

"যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ করে, দন্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়"।

আর আল্লাহর প্রিয় বন্দারা শুধু যে সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে স্মরণ করে তাই নয়; বরং তারা রাত্রি যাপন করে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত অথবা দন্ডায়মান অবস্থায়।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

(সূরা ফোরকান)

"আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের দরবারে সেজদারত এবং দন্ডায়মান অবস্থায়"।

যারা এ অবস্থায় জীবন-যাপন করে তারাই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করাই হল মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনে এ উদ্দেশ্যের কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(সূরা আন্‌আম)

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী আমার জীবন (জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড) এমনকি, আমার মৃত্যু পর্যন্ত এক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে"।

মানব জীবনের এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যখন নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং যখন মানুষ এ উদ্দেশ্যে সাধনায় রত হয়, তখনই মানুষ তার জীবনের সঠিক পথের সন্ধান পায়। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাকে জীবনের আঁকা বাকা পথের মধ্যে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

(সূরা আনকাবুত)

"আর যারা আমার পথে সাধনা করে আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি এবং নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন"।

যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তারা শুধু আল্লাহর জন্যেই জীবন-যাপন করে আর তাঁরই জন্যে মৃত্যুবরণও করে, এটিই হল মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পরিপূর্ণ রূপ এবং মানবতার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের সর্বশেষ স্তর। যারা জীবনকে এক আল্লাহর জন্যে যাপন করে তাদের অবস্থা অনুধাবন করার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

শায়খ আবদুল্লাহ খফীফ (রঃ)-কে তাঁর এক ভক্ত দাওয়াত দেয়, মজলিশে রকমারী সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয়। শায়খ একটি লুচি খেয়ে খুশী হলেন। লুচিটি ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু, তাই তিনি আরেকটি লুচি মুখে তুলে দিলেন, কিন্তু তখন মনে এ ধারণা হলো দ্বিতীয় লুচিটি আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে গ্রহণ করিনি, বরং তার স্বাদের জন্যে গ্রহণ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁত দ্বারা তাঁর জিহ্বাকে কেটে ফেললেন, রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে? তিনি বললেনঃ আমি একটি লুচি খেয়েছি তা অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল, পরে আরও একটি নিয়েছি, কিন্তু তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নয়; বরং স্বাদের জন্যে, তাই জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছি।

বস্তুতঃ এটিই হলো আল্লাহ পাকের জন্যে জীবন-যাপন করা। যারা জীবনকে আল্লাহর জন্যে বিলীন করে দেয়; তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়, তাদের জীবনই হয় সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম। তারা জীবন ও জীবনের যথা–সর্বস্ব আল্লাহ পাকের নামে কোরবান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহর হুকুমে জবেহ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আজীবন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সাধনা করে গেছেন। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে মদিনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেছেন। বদর, ওহোদ, খন্দক, মওতা, খায়বর, হোনায়েন এবং অন্যান্য রণাঙ্গণে জেহাদ করেছেন। আর এ মহান উদ্দেশ্যেই কারবালার মরু প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন।

আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ আজীবন এলমে হাদীসের সুমহান খেদমত করেছেন।

ইমাম তাবারী (রঃ), আল্লামা আলুসী (রঃ), বয়যাভী (রঃ), ইমাম রাজী (রঃ), সয়ুতী (রঃ) এবং এবনে আরাবী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ পবিত্র কোরআনের তফসীরে অক্লান্ত সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এমনিভাবে, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সহ অন্যান্য ইমামগণ শরীয়তের বিধি-বিধান প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই একই উদ্দেশ্যে গওসুল আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), জোনায়েদ বগদাদী (রঃ), সিররী সকতী (রঃ), শিবলী (রঃ), হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), মাহবুবে এলাহী হযরত খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ), শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) এবং তাঁর বংশধরগণ আজীবন আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। আর এই একই উদ্দেশ্যে হাজী

এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মককী (রঃ) থেকে শুরু করে উপমহাদেশের বহু ওলামায়ে কেরাম দ্বীন ইসলামের অসাধারণ খেদমত করে গেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমাদের দেশেও বহু সাধক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। যেমন এ পর্যায়ে শাহজালাল ইয়ামনী (রঃ), শাহ আলী বোগদাদী (রঃ) এবং শাহ মখদুম শাহ (রঃ) সহ বহু আউলিয়ায়ে কেরামের নাম উল্লেখযোগ্য। নিকট-অতীতে হযরত মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

মূলতঃ ঠিক এমনিভাবে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের মহান উদ্দেশ্যেই একদিন শুরু হয়েছিল "তফসীরে নূরুল কোরআনের" পূণ্যময় সাধনা। বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের একখানি মৌলিক, বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ রচনার আরাধনা। কোন্ ভাষায় আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করব যে, তিনি আজ এ মহান গ্রন্থের দ্বাদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। এ শুভক্ষণে আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করি, "হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনকে কবুল কর। এ মহান গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, এতে যে ভুল-ত্রুটি হয় তা মাফ করে দিও। বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকবৃন্দের নিকট তোমার মহান বাণী পৌঁছাবার, এর যারা তোমার সন্তুষ্টি লাভের তৌফিক দিও। এ দীনহীন গোলামকে এবং যারা তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেন, যারা এ মহান গ্রন্থ পাঠ করেন তাদেরকেও মাফ করে দিও। এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তোমার নৈকট্য লাভের সাধনায় অতিবাহিত করার তৌফিক দিও। এর বরকতে আমার মরহুম আব্বাজান ও আম্মাজানকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চতর মাকামে স্থান দিও, আমাকে তোমার পথে আনার জন্যে তাঁদের উভয়ের সাধনা ছিল চিরস্মরণীয়। হে আল্লাহ! হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় কবুল কর, আমীন"।

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا
محمد وعلى اله واصحابه وسلم.

আরজ গুজার
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
১০/৯/৯১ ইং

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

তফসীরে নূরুল কোরআন
দ্বাদশ খন্ড

বিষয় :	পৃষ্ঠা
তফসীরুল কোরআন	১৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৪
আল্লাহ্ পাকই সকলের রিয্কদাতা	১৪
রিয্ক প্রদানের নিশ্চয়তা	১৬
অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ	২০
শানে নুযুল	২৩
তফসীরুল কোরআন	২৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২৫
মোমেনের বৈশিষ্ট্য	২৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২৬
তফসীরুল কোরআন	২৯
পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা	২৯
এক মহাসত্যের ঘোষণা	৩১
জীবন-সাধনাকে সার্থক করার পন্থা	৩২
তফসীরুল কোরআন	৩৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৩৫
দ্বীন ইসলামের সত্যতার প্রমাণ	৩৬
আয়াতের মর্মকথা	৩৬
কেয়ামতের দিন যা সাক্ষী হবে	৪০
তফসীরুল কোরআন	৪৪
কাফেরদের অবস্থা ও ভয়াবহ পরিণতির ঘোষণা	৪৪
মোমেনদের সত্য-সাধনা ও শুভ পরিণতির ঘোষণা	৪৬
মোমেন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত	৪৬
তফসীরুল কোরআন	৪৮
সর্বপ্রথম যিনি কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন	৪৯
তফসীরুল কোরআন	৫২
তফসীরুল কোরআন	৫৯
তফসীরুল কোরআন	৬৩
নূহ (আঃ)-এর তরীর বিবরণ	৬৩
তন্নুরটি কোথায় ছিল	৬৭

নূহ (আঃ)-এর যুগের মোমেনদের সংখ্যা..... ৬৭
তফসীরুল কোরআন..... ৭০
জুদী পাহাড়টি কোথায়?..... ৭৩
নৌকায় অবস্থান কাল..... ৭৪
তরজমা..... ৭৬
তফসীরুল কোরআন..... ৭৭
আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য..... ৭৯
নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ..... ৮১
তফসীরুল কোরআন..... ৮৩
আদ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়..... ৮৪
তফসীরুল কোরআন..... ৮৮
অবাধ্য আদ জাতি ধ্বংস হলো..... ৯১
তফসীরুল কোরআন..... ৯৪
আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য..... ৯৪
আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর পরিণাম ভয়াবহ..... ৯৫
তফসীরুল কোরআন..... ৯৯
তফসীরুল কোরআন..... ১০৩
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সুসংবাদ..... ১০৫
তফসীরুল কোরআন..... ১১০
হযরত সারার ফজিলত..... ১১১
হযরত খাদিজাতুল কোবরার ফজিলত..... ১১১
তফসীরুল কোরআন..... ১১৬
হযরত লুত (আঃ)-এর জন্য সুসংবাদ..... ১২০
তফসীরুল কোরআন..... ১২২
পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী..... ১২৪
তফসীরুল কোরআন..... ১৩০
নামায মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে..... ১৩১
তরজমা..... ১৩৫
তফসীরুল কোরআন..... ১৩৫
শোয়ায়েব (আঃ) অধিক পরিমানে কাঁদতেন..... ১৩৭
তফসীরুল কোরআন..... ১৪১
তফসীরুল কোরআন..... ১৪৫
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা..... ১৪৭
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী..... ১৪৮
পূর্বকালের ঘটনাবলী উল্লেখ করার উপকারিতা..... ১৪৮
তফসীরুল কোরআন..... ১৫১
পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র..... ১৫১

জান্নাত বা দোযখের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী ১৫৪
গুনাহগার মোমেনগণ অবশেষে নাজাত লাভ করবে ১৫৫
বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন ১৫৮
ভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের কথা ১৫৯
ভাগ্যবানদের বৈশিষ্ট্য ১৬০
হতভাগ্যদের পাঁচটি আলামত ১৬০
তফসীরুল কোরআন ১৬১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৬১
আয়াতের মর্মকথা ১৬৩
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ ১৬৬
তফসীরুল কোরআন ১৭১
কাফের মুশরেকদের সাথে সম্পর্কের পরিণাম ভয়াবহ ১৭২
আলোচ্য আয়াতের মর্মকর্থা ১৭৩
নামায কায়েম করার তাৎপর্য ১৭৬
তফসীরুল কোরআন ১৮৪
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ১৮৯
সূরা ইউসুফ ১৯২
তরজমা ১৯২
সূরা ইউসুফ প্রসঙ্গে– ১৯২
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১৯৩
শানে নুযুল ১৯৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১৯৫
আ'মালুল কোরআন ১৯৫
স্বপ্নের তা'বির ১৯৬
তফসীরুল কোরআন ১৯৬
পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা ১৯৬
সুন্দরতম কাহিনী ১৯৯
হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কিছু তথ্য ২০০
স্বপ্নের তাৎপর্য ২০১
নেয়ামত দু' প্রকার ২০২
স্বপ্নের তা'বির ২০৩
তফসীরুল কোরআন ২০৬
পিতৃ পুরুষদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ২০৯
শিক্ষণীয় বিষয় ২১০
তফসীরুল কোরআন ২১৩
মারাত্মক অপরাধ ২১৭
তফসীরুল কোরআন ২২০

উত্তম সবরের তাৎপর্য ২২৫
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ২২৬
তফসীরুল কোরআন ২২৭
বিদায়ের করুণ দৃশ্য ২৩০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৩৩
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের কয়েকটি নেয়ামত ২৩৩
আল্লাহ পাকের ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয় ২৩৫
"হুকুমের" ব্যাখ্যা ২৩৬
আয়াতের মর্মকথা ২৩৭
তফসীরুল কোরআন ২৩৯
যে নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন ২৪৪
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি মোজেযা ২৪৫
তফসীরুল কোরআন ২৪৯
তরজমা ২৬৪
তফসীরুল কোরআন ২৫৫
কল্যাণের জন্যে দোয়া করাই কর্তব্য ২৫৯
তফসীরুল কোরআন ২৬৩
পুর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৬৩
কারাগারে হযরত ইউসুফ (আঃ) ২৬৪
জ্ঞান আল্লাহ পাকের দান ২৬৬
তফসীরুল কোরআন ২৬৮
তরজমা ২৭৩
তফসীরুল কোরআন ২৭৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৭৩
স্বপ্নের তা'বির ২৭৪
হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজ দরবারে আহুত ২৭৭
তফসীরুল কোরআন ২৭৯
স্বপ্নের তা'বির ২৮১
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মহান আদর্শ ২৮২
বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ ২৮৩
তফসীরুল কোরআন ২৮৪
বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী ২৮৫
মহিলাদের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত ২৮৫
অপরাধ স্বীকার ২৮৬
লেখক পরিচিতি ২৮৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم.

তফসীরে নূরুল কোরআন

দ্বাদশ খন্ড দ্বাদশ পারা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦ وَ
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ
عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ
إِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ
هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلٰٓى أُمَّةٍ
مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨

তরজমা

(৬) পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী মাত্রেরই রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবগত। সুস্পষ্ট গ্রন্থে সব কিছুই আছে।

(৭) তিনিইতো আসমান জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ করে? আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে বলেন, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে তবে তারা বলবে, এ-তো সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৮) আর যদি আমি একটি নিদৃষ্ট কালের জন্যে তাদের আযাব স্থগিত রাখি তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, কোন্ জিনিস আযাবকে ঠেকিয়ে রেখেছে? সাবধান যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন তাদের নিকট থেকে তা নিবৃত্ত করা হবেনা। মনে রেখ, তারা যে বিষয়ে বিদ্রুপ করতো তাই তাদেরকে ঘেরাও করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ.

(তোমরা যা কিছু গোপন কর আর যা কিছু প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্ পাক জানেন) শুধু তাই নয়, তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। অর্থাৎ-আল্লাহ্ পাকের এলম সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। পৃথিবীর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নখদর্পণে।

আল্লাহ্ পাকই সকলের রিয্কদাতা

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকই সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং রিয্কদাতা। পৃথিবীতে বিচরণকারী সৃষ্টি মাত্রেরই রিয্কের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ পাক নিজে গ্রহণ করেছেন। এটি সৃষ্টি জগতের প্রতি তাঁর করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন প্রাণীকে যতক্ষণ তিনি জীবিত রাখার ইচ্ছা করেন ততক্ষণ রিয্ক যে কোন উপায়ে তার নিকট পৌঁছতে থাকে। ক্ষুধার কারণে যদি কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় তবে এর এই অর্থ নয় যে, আল্লাহ্ পাকের ভাণ্ডারে রিয্ক কম হয়ে গেছে (নাউজুবিল্লাহ্)। বরং এর অর্থ হল ঐ প্রাণীকে জীবিত রাখা আল্লাহ্ পাকের মর্জি ছিলনা।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا.

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রত্যেকটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন।

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

"আর তিনি তার স্থায়ী এবং অস্থায়ী আবাসস্থল জানেন"।

এ বাক্যটিতে আল্লাহ্ পাক তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা ঘোষণা করেছেন।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ সফররত অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। তাই তিনি একটু আগুনের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২০

খোঁজে বের হন, ঠিক ঐ সময় আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে নবুওয়্যত দানে ধন্য করেন এবং তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন। এ সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে এ ভাবনা এসেছিল যে, তাঁর স্ত্রীর এখন কি অবস্থা? আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন, হে মূসা! তোমার লাঠি দ্বারা একটি পাথরে আঘাত দাও, হযরত মূসা (আঃ) তাই করলেন, ফলে ঐ পাথরটি থেকে আরেকটি পাথর বের হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) দ্বিতীয় পাথরটিতে আঘাত করলেন। তখন তা ফেটে তৃতীয় আরেকটি পাথর বের হল। ঐ পাথরটিতে আঘাত করলে তা থেকে বালুকণার ন্যায় একটি কীট বের হল এবং তার মুখে খাদ্য জাতীয় একটি বস্তু ছিল। আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত মূসা (আঃ) এবং কীটের মধ্যকার আবরণ সরিয়ে দেয়া হল এবং তার কথা শোনার শক্তি হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রদান করা হল। তিনি তখন শ্রবণ করলেন সে বলছিলোঃ

سبحان من يرانى ويسمع كلامى ويعرف مكانى ويذكرنى ولاينسانى.

"পবিত্র সেই আল্লাহ পাক, যিনি আমাকে দেখেন এবং আমার কথা শ্রবণ করেন, যিনি আমার অবস্থান সম্পর্কে জানেন এবং আমাকে স্মরণ করেন আর আমাকে ভোলেন না"।[১]

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের নিকট পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নেই, এরশাদ হয়েছেঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ.

"আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে গায়বের অজানা ভান্ডারের চাবি সমূহ, তিনি ব্যতীত তা কেউ জানেনা"।

এর পাশাপাশি এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, প্রাণী মাত্রেরই রিয্‌কের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন। তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ), আবু মালেক (রাঃ) এবং আবু আমের (রাঃ) যখন হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারায় পৌঁছলেন, তখন তাঁরা ছিলেন রিক্তহস্ত, হৃতসর্বস্ব। এক ব্যক্তিকে তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন যেন সামান্য খাবারের জন্যে তাঁর নিকট আবেদন করে। ঐ ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে দেখলেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করছেন। এ আয়াত শ্রবণ করে তিনি চিন্তা করলেন, যখন আল্লাহ পাক কীট-পতঙ্গেরও রিয্‌কের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি কি আমাদের খবর নেবেন না! এমন অবস্থায় তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আর এ সম্পর্কে কোন আরজী পেশ করলেন না। সাথীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন, তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, তোমরা যে জন্যে ফরিয়াদ করেছিলে তা এসে গেছে। লোকেরা মনে করল, হয়ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন অঙ্গীকার করেছেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে দু' ব্যক্তি এসে গোশ্‌তে পূর্ণ একটি পাত্র এবং রুটি পেশ করলেন। তারা সকলে আহার করে তৃপ্তি লাভ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৮৬

করলেন। এরপর বললেন, আমরা তৃপ্ত, এ খাবার তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে যাও।

এরপর তারা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঐ খাবারের প্রশংসা করলেন যে, এমন সুস্বাদু খাবার আমরা কোনদিন খাইনি, তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমিতো তোমাদের জন্যে কিছুই প্রেরণ করিনি। তখন তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হল। তিনি এরশাদ করলেন, এ রিয্ক আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন।

একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, খাদ্য সমস্যা মানব-জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এ সমস্যা মানুষকে বিব্রত এবং চিন্তিত করে রেখেছে। আর এ জন্যে মানুষকে আজীবন ব্যস্ত থাকতে হয়।

বিগত শতকের শুরুতে খাদ্য সমস্যার সমাধানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে বিপ্লব পর্যন্ত হয়ে যায়। আত্ম প্রকাশ করে সমাজবাদ। খাদ্য সমস্যার সমাধানের নামে সমাজবাদ মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বাধীনতাকে হরণ করে, ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জন করে কিন্তু তবুও খাদ্য সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারেনি।

রিয্ক প্রদানের নিশ্চয়তা

পবিত্র কোরআন মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সর্বপ্রথম মানব মন থেকে এ পর্যায়ের সকল হতাশা এবং নিরাশার অবসান ঘটিয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রতিটি মানুষকে তার রিয্ক লাভের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

আমাদের এ জীবন যাঁর দান, তিনি দিয়েছেন জীবিকার সন্ধান। জীবিকার অফুরন্ত ও অগণিত দ্রব্য সামগ্রী তাঁরই দান। তিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, লালন-পালন তাঁরই কাজ। তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ

"প্রাণী মাত্রেরই জীবিকার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকের উপর এবং তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী আবাস স্থল। মূলতঃ সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

শুধু মানুষই নয়, বরং সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পাকই গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا

"জীবিকা সংগ্রহে কত অক্ষম প্রাণী পৃথিবীতে রয়েছে, আল্লাহ পাকই সরবরাহ করেন তাদের জীবিকা"।

এমনিভাবে আরও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. (সূরা যারিয়াত)

"তোমাদের জীবিকা এবং তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সবই রয়েছে আসমানে"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাষায়-

وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ.

(আল্লাহ পাকই দান করেন আমাকে আমার আহার্য এবং পানীয়) আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ.

(সূরা ইয়াসীন)

"এবং তাদের জন্যে এ মৃত, শুষ্ক জমীনও একটি নিদর্শন, যাকে আমি নব জীবন দান করি ও সবুজ সতেজ করে তুলি এবং এই জমীন থেকেই খাদ্য বীজ উৎপন্ন করি যা থেকে তারা আহার করে থাকে"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ.

"এবং আমি জমিনের অভ্যন্তরে পরিমাপ মোতাবেক যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য সম্ভার সংরক্ষণ করে রেখেছি, যাতে অন্বেষণকারীদের জন্যে সমান সুযোগ ও অধিকার রয়েছে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি জমীনকে তোমাদের সম্পূর্ণ অনুগত করে দিয়েছেন তথা তোমাদের বিচরণের ও জীবিকা আহরণের উপযুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধের উপর চলাফেরা কর এবং জমিন থেকে উৎপন্ন রিয্ক আহার কর। তবে সর্বদা মনে রেখ, তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

পবিত্র কোরআনে এভাবে বহু আয়াতে মানব জাতিকে তার জীবিকার সন্ধান এবং নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় এবং সেই প্রাণী সমূহকে কিভাবে আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির খাদ্য সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারও বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে, অর্থাৎ মানুষকে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের শুধু নিশ্চয়তা বিধানই করা হয়নি, বরং কিভাবে এর সমাধান হবে তার বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে

পারে, মধু সর্বকালে এবং সকল অবস্থায় মানুষের সবচেয়ে প্রিয় উপাদেয় এবং উপভোগ্য সুপেয় পানীয়, পবিত্র কোরআন মধুমক্ষিকার মৌচাক নির্মাণ প্রসঙ্গে ফুল থেকে মধু আহরণ এবং পরবর্তী পর্যায়ের যাবতীয় কলা-কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবি মহলকে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত ও হেকমতের প্রতি চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছে। সূরায়ে নাহলে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"এবং তোমার প্রতিপালক মধু মক্ষিকাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, পর্বতমালায় এবং বৃক্ষ সমূহে ও সুউচ্চ শিখরে মধু চক্র নির্মাণ কর। এরপর ফল ও ফুল থেকে ভক্ষণ কর এবং এরপর তোমাদের প্রতিপালকের পথ সমূহে পরিক্রমণ কর। তাদের উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পানীয় দ্রব্য নির্গত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মানব জাতির জন্যে রয়েছে রোগমুক্তি। নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে তার জীবিকা সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন এ পর্যায়ে যে বিশ্বাস মানব মনে বদ্ধমূল করে রাখতে চায় তা হল এই, যিনি তোমাদের স্রষ্টা, তিনিই তোমাদের রিয্কদাতা, তিনিই পালনকর্তা এবং তিনি রব্বুল আলামীন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানেও পবিত্র কোরআন নীরব নয়; বরং যেহেতু পবিত্র কোরআন বিশ্বগ্রন্থ, বিশ্ব প্রতিপালকের ঘোষণা পত্র, যেহেতু ইসলাম আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধান, তাই এতেই রয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান। আধুনিক বিশ্বে মানব জাতির এ চরম দুর্দিনে মানুষ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে এবং তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানকে ফেলে রেখেছে বিস্মৃতির অতল তলে, পরিণামে সে হয়েছে আত্মবিস্মৃত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ.

(সূরা হাশর)

"এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা, যারা বিস্মৃত করেছে আল্লাহ পাককে ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন"।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রাণী মাত্রেরই রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ পাকের। এর অর্থ হল তিনি নিজ দয়ায় নিজের থেকেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কেউ তাঁর উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামাআতের আকীদা হল কোন কাজই আল্লাহ পাকের অবশ্য কর্তব্য নয়, তিনি যদি স্বীয় রহমতে কোন কিছুর অঙ্গীকার ঘোষণা করেন তা তাঁর কৃপা এবং মর্জির ব্যাপার। তিনি কোন ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর নিজের অনন্ত অসীম জ্ঞান এবং বিবেচনা মোতাবেকই তিনি যাবতীয় কাজ করেন। কার কি প্রয়োজন, কার জন্যে কি উপকারী বা অপকারী সবই তিনি জানেন। মানুষকে হালাল রিয্কের অনুসন্ধানে চেষ্টা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মানুষের কর্তব্য হল যথা নিয়মে চেষ্টা করা। কাকে কতখানি দিতে হবে তা আল্লাহ পাকের চেয়ে বেশী কেউ জানেনা। তাই তিনি যাকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা দান করেন।

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.

"আল্লাহ পাক জানেন প্রত্যেকের স্থায়ী ও অস্থায়ী আবাসস্থল"।

আল্লামা বগভী (র.) এবনে মোকাস্যেমের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। مستقر অর্থ হলো সে স্থান, যেখানে জন্তু চলাফেরা করে ফিরে আসে এবং বিশ্রাম গ্রহণ করে। আর مستودع হলো দাফন হওয়ার স্থান তথা কবর। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, مستقر হলো মায়ের উদর আর مستودع অর্থ হলো পিতার পৃষ্ঠদেশ। সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), আলী এবনে তালহা এবং একরামা (র.)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই অভিমত বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে, مستقر হল অস্তিত্ব প্রকাশের পূর্ব অবস্থানস্থল। আর مستودع অস্তিত্ব প্রকাশের পরবর্তী জাগতিক অবস্থানস্থল। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, مستقر হল জান্নাত বা দোযখ। আর مستودع হল কবর। কেননা পবিত্র কোরআনে حسنت مستقرا বলে জান্নাত এবং ساءت مستقرا বলে দোযখ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

কোন কোন তফসীরকার এ সম্পর্কে বলেছেন, مستقر অর্থ হল সে স্থান, যেখানে কোন প্রাণী স্বেচ্ছায় অবস্থান গ্রহণ করে। আর مستودع হল সে স্থান, যেখানে অবস্থান করা তার ইচ্ছাধীন থাকেনা যেমন মায়ের উদরে, হযরত শাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর তফসীরে একথাই লিখেছেন।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হল, এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাক যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রত্যেককে তিনি রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টির স্থায়ী অস্থায়ী আবাস-স্থল তিনি জানেন। তাই রিয্ক পৌঁছানোর দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। আর আল্লাহ পাক একথাও জানেন কে কোথায় কতক্ষণ থাকে। আর কার কোথায় মৃত্যু হবে, সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জুযাজ (রহ.) বলেছেন, এর আরও একটি অর্থ হতে পারে তা হল সবই আল্লাহ পাকের জ্ঞান-ভান্ডারে রয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছে–

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১
তফসীরে কুরতবী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮

كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রাণীর রিয্ক, তার অবস্থান এবং জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে ও তার গতিবিধি সম্পর্কে সবই আল্লাহ পাকের জ্ঞান-ভান্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে কোন কিছুই আল্লাহ্ পাকের অজানা নেই, কোন কিছুই অজানা থাকতে পারেনা।

অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহ.) এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক আসমান জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল সৃষ্টির অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেনঃ তখন আল্লাহ পাকের সিংহাসন পানির উপর ছিল। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক প্রত্যেক বন্দার ব্যাপারে পাঁচটি কথা লিপিবদ্ধ করা সম্পন্ন করেছেন। ১. জীবন কাল ২. আমল, ৩. মৃত্যুর স্থান ৪. যা সে ছেড়ে যাবে, ৫. রিয্ক। (আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি উপকরণ শুক্র রূপে মায়ের উদরে চল্লিশ দিন থাকে। এরপর এ পরিমাণ সময় জমাট রক্ত হিসেবে থাকে, এরপর এ পরিমাণ সময় প্রাণহীন দেহ হিসেবে থাকে। এরপর চারটি কথা লিপিবদ্ধ করার জন্যে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়, ফেরেশতা ঐ ব্যক্তির আমল, বয়স, মৃত্যুকাল, রিয্ক নেককার কি বদকার লিপিবদ্ধ করে। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

"আর তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন আসমান জমীন। আর তাঁর আরশ ছিল তখন পানির উপর। তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আসমান" শব্দ দ্বারা আকাশের সব কিছুকে বোঝানো হয়েছে। আর জমীন বলে পাতালের সব কিছুকে বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম জ্ঞানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং আধিপত্যের ঘোষণা রয়েছে যে, মাত্র ছয়দিনে বিশাল আসমান ও বিস্তৃত জমীন এবং আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে সবই সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের সব কিছু আল্লাহ পাকের নখদর্পণে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, ঠিক তেমনি সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁর কর্তৃত্বাধীন, কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার আওতার বাইরে নয়।

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ

আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ পাকের আরশ (সিংহাসন) ছিল পানির উপর, এরপর আল্লাহ পাক আসমান, জমিন এবং কলম সৃষ্টি করেছেন। আর কলম দ্বারা সব বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর সব কিছু লিখবার পূর্বে কলম হাজার বছর ধরে আল্লাহ পাকের তসবীহ এবং হামদ পাঠ করেছে।

বোখারী শরীফে হযরত এমরান এবনে হোসাইনের (রাঃ) বর্ণনা সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের পূর্বে কিছুই ছিলনা। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। এরপর তিনি আসমান এবং জমীন সৃষ্টি করেছেন আর সব কিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হল যে, আসমান জমীন সৃষ্টির পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পানি সকল সৃষ্টির মূল উপাদান। তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ.

(পানি থেকেই সব কিছুর জীবন দান করেছি) আর এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হল যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জীবন ধারণের উপকরণ আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। যেমন সব কিছুর নিয়ন্ত্রণও তাঁরই নিকট রয়েছে। কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আসমান জমীনের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তার বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

রবি এবনে আনাস বলেন, আল্লাহর আরশ তখন পানির উপর ছিল যখন তিনিই আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন। ঐ পানিকে তিনি দু'ভাগ বিভক্ত করেছেন। একভাগ আরশের নিচে রয়েছে। আর এটিই হল "বাহরে মাছযুব"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আরশকে তার উচ্চতার কারণেই আরশ বলা হয়। সাদ তাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আরশ হল লাল ইয়াকুতের।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক সেভাবেই ছিলেন যেভাবে তিনি স্বয়ং তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা তখন কিছুই ছিলনা, শুধু পানির উপর আরশ ছিল। আর আরশের উপর সর্ব গুণাকর, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছিলেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পানি কিসের উপর ছিল? তিনি বলেন, বাতাসের পৃষ্ঠদেশে। এরপর তিনি বলেন, আসমান জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে। আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে, যেন তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না কর। আর মনে রেখ তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا.

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে না"?

বরং প্রকৃত অবস্থা এই, তোমাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অবশ্যই তোমাদেরকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১]

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান জমীন সৃষ্টির ঘোষণা এবং তার সৃষ্টির উপকরণের বর্ণনা রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সৃষ্টির কারণ বর্ণিত হয়েছে। এ বিশাল বিস্তৃত নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টির এবং পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান এবং তার ভোগ ও সম্পদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের সকল আয়োজন শুধু তাকে পরীক্ষা করার জন্যে, এই মর্মে যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে কে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আর কে তার নেয়ামত দাতাকেই ভুলে যায়।

যদিও আল্লাহ পাক তোমাদের সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত কিন্তু তবুও তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে তোমাদের অবস্থা প্রকাশ করতে চান। যাতে করে তোমাদের সওয়াব বা আযাবের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত اَحْسَنُ عَمَلًا বলা হয়েছে, اكثر عملا বলা হয়নি। অর্থাৎ কে বেশী কাজ করে তা গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়, বরং কে উত্তম কাজ করে এটিই বড় কথা। আর উত্তম আমলের মধ্যে উত্তম আকীদা এবং উত্তম কাজ উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত।

উত্তম আমলের ব্যাখ্যায় একখানি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা।[২]

বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বের বিস্ময়কর নিয়ম শৃঙ্খলা এবং মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করতে হয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু অনেকেই তা করেনা। কে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর কে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, কে তাঁর বিধি-নিষেধ মোতাবেক সুন্দর জীবন-যাপন করে, আর কে তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিশাল আয়োজন।

অতএব এই পৃথিবী মানুষের পরীক্ষাকেন্দ্র। প্রতিটি কথা এবং কাজের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে মৃত্যুর পর। তাই আলোচ্য আয়াতে মানুষের জীবনকে একটি পরীক্ষা হিসেবে অভিহিত করার পরই পরবর্তী বাক্যে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩
* ছয় দিনে আসমান যমীন সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৫৯-২৬২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩

وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ

"(হে রসূল!) যদি আপনি মুশরেকদেরকে বলেন মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমাদের পুনরুত্থান হবে, তখন কাফেররা অবশ্যই বলবে, এটিতো সুস্পষ্ট যাদু"।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি মুশরেকরা বিশ্বাস করতো না। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা শ্রবণ করে মুশরেকরা বলতো এ-তো সুস্পষ্ট যাদু। আমরা যাদুতে বিশ্বাস করিনা। আমাদের উপর এ যাদু চলবে না।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম কাতাদার (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, যখন নাযিল হল এ আয়াত–

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

(অর্থাৎ কেয়ামত মানুষের নিকটবর্তী হয়েছে) একথা শ্রবণ করে কিছু লোক মন্দ কাজ বর্জন করলো। কিন্তু কিছু দিন পর পুনরায় তারা মন্দকর্মে লিপ্ত হল তখন নাযিল হলঃ

اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ

অর্থাৎ আল্লাহর আযাব অতি আসন্ন, অতএব তাকে ত্বরান্বিত করোনা। এ আয়াত শ্রবণ করে কিছু লোক মন্দ কাজ পরিহার করে, কিন্তু কিছুদিন পর তারা পুনরায় মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়ঃ[১]

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ

আমি যদি কাফেরদের উপর আসন্ন আযাবকে কিছু দিনের জন্যে মুলতবী রাখি তখন তারা বলে আযাবকে কে থামিয়ে দিল? কোথায় সেই আযাব?

আলোচ্য আয়াতে امة শব্দটির অর্থ সময় (কামুস)। মোল্লা আলী কারী লিখেছেন, এর অর্থ হল নিদৃষ্ট মেয়াদ আর আল্লামা বয়যাবী এর অর্থ লিখেছেন, সময়ের সমষ্টি এবং معدودة এর অর্থ লিখেছেন, সামান্য। যাহোক, আয়াতের অর্থ হল দুবৃত্ত কাফেরদের অনিবার্য আযাবকে যদি আল্লাহ পাক কিছু দিনের জন্যে মুলতবী রাখেন তখন তারা বলে, সেই আযাব কোথায় যার সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে? তাদের এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৮

اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ.

সাবধান! আযাব তার নিদৃষ্ট সময়েই আসবে। তোমাদের ইচ্ছা মত নয়, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সময়েই আসবে তবে মনে রেখ, যখন আযাব এসে পড়বে তখন তাকে ঠেকাবার কোন কিছুই থাকবে না। তোমাদের আত্মরক্ষার জন্যে কোন পথই খোলা থাকবেনা। যে আযাব সম্পর্কে তোমরা বিদ্রুপ কর তা অবশ্যই তোমাদের প্রতি আপতিত হবে। আল্লাহ পাকের এলমে তার সময় নিদৃষ্ট রয়েছে যেমন বদরের যুদ্ধের দিন কাফেরদের শাস্তির জন্য নিদৃষ্ট ছিল, যখন সেদিন আসলো তখন কেউ কাফেরদের রক্ষা করতে পারেনি। এ আয়াতে কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا

الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ⑨

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ

السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ⑩ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑪

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهٖ

صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ

مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ⑫ ؕ

তরজমা

(৯) আর যদি আমি মানুষকে আমার রহমত ভোগ করতে দেই, এরপর তা কেড়ে নেই তবে সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।

(১০) আর যদি দুঃখের পর তাকে সুখ ভোগ করতে দেই তখন সে বলে বসে আমার বিপদ কেটে গেছে তখন সে আনন্দে ফেটে পড়ে এবং অহংকারী হয়।

(১১) কিন্তু যারা সবর অবলম্বন করে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

(১২) (হে রসূল!) আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি কি তার কিছুটা বর্জন করবেন? আর এতে কি আপনার মন সংকুচিত হবে এজন্যে যে তারা বলে, তাঁর নিকট ধন-ভান্ডার প্রেরিত হয়না কেন? অথবা তাঁর সাথে ফেরেশতা আসেনা কেন? (হে রসূল!) আপনিতো শুধু সতর্ককারী, সব কিছুর দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করতেন তখন তারা অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে বলতো, আযাব কেন আসেনা? তা এখনই আসুক। আর আলোচ্য আয়াতে মানব চরিত্রের দু'টি দিক বর্ণিত হয়েছে। মানুষ এক অবস্থানে থাকেনা। আল্লাহ পাক যদি মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন এবং সে আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে, এরপর যদি কোন কারণে আল্লাহ পাক মানুষ থেকে তাঁর নেয়ামত ছিনিয়ে নেন, ফলে সুখের দিন বিদায় নেয়, দুঃখের দিন আসে, তখন মানুষ আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় এবং ধৈর্য্যহারা হয়। ভবিষ্যতে আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভে সে ধন্য হবে এই আশা সে আর করেনা, এমনকি ইতিপূর্বে সুখের দিনে সে যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেছিলো তা-ও ভুলে যায়। আর যে নেয়ামত সমূহ বর্তমানে ভোগ করছে তার জন্যেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। এভাবে সে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, যেন কোন দিন তাকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেননি। অতীতের নেয়ামতের ব্যাপারে সে অকৃতজ্ঞ হয়, আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে হতাশ হয়।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ.

মানুষের এ চরিত্রের পাশাপাশি আরেকটি চরিত্র হল এই, যদি আমি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করি এবং তাকে নেয়ামত দান করি এবং তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করি, তখন সে এত আনন্দিত হয় যে মনে করে তার বিপদ কেটে গেছে, আর কখনও এ জীবনে দুঃখ আসবেনা। ফলে সে শুধু যে আনন্দিত হয় তাই নয়; বরং সে অহংকারী হয়ে পড়ে। নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হলে নিরাশ হওয়া, আর নেয়ামত পেলে অহংকারী হওয়া-এ দু'টি মন্দ স্বভাবই মানুষের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। অথচ মানুষের কর্তব্য হল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে সবর করা এবং নেয়ামত লাভ হলে শোকর আদায় করা। বস্তুতঃ এটিই হল প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

মোমেনের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু যারা মোমেন, যারা আল্লাহর পেয়ারা বন্দা তাদের মধ্যে এসব চারিত্রিক দুর্বলতা নেই। দুঃখের দিনে তারা ভেঙে পড়েনা; বরং আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করতে থাকে, সবর অবলম্বনের মাধ্যমে কঠিন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। এমনিভাবে প্রকৃত মোমেন যখন আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে তখন আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হয়। কথায়-কাজে, ওঠা-বসায় মহান আল্লাহ পাকের দরবারে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। অতএব, মোমেনের বৈশিষ্ট্য হল দুঃখের দিনে সবর করা এবং সুখ ও শান্তিতে শোকর করা।

হযরত সোহায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর। তার প্রতিটি কথাই ভাল। আর এ বৈশিষ্ট্য শুধু মোমেনেরই। যদি সে লাভ করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তবে সে শোকর আদায় করে, আর তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে, যদি কোন কারণে সে দুঃখ পায় তবে সে সবর করে, আর তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। (মুসলিম শরীফ)

أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.

এরাই সে সব লোক যাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের মাগফেরাত এবং মহা পুরস্কার তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত।

হযরত ইয়ায এবনে আসযায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা বিনয় প্রকাশ কর, কারো প্রতি অহংকার করোনা এবং কারো প্রতি জুলুম করোনা।[১] (মুসলিম শরীফ)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ.

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং কোরআনের আলোচ্য বিষয় হল, তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শকরূপে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এজন্যে প্রেরিত হয়েছেন, যেন মানুষ অন্যায় আচরণ থেকে তওবা করে এবং আত্ম-সংশোধনে প্রয়াসী হয়।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবান্তর প্রশ্ন করে তাঁকে বিরক্ত করতো, তাঁর কথাকে মিথ্যাজ্ঞান করতো এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের প্রতি বিদ্রুপ করতো এবং এমন অহেতুক প্রশ্নবাণে তাঁকে বিদ্ধ করতো যা তাঁর জন্যে সত্যিই কষ্টকর হত। কখনও তারা বলতো যদি আপনি সত্য নবী হন তবে ওহোদ পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। আপনি সত্য নবী হলে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ধন-ভান্ডার কেন আসলো না? আপনার নবুওয়্যতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্যে কোন ফেরেশতা কেন আসলো না? কখনও বলতো, কোরআনে আমাদের মূর্তি পূজার প্রতিবাদে যে সব কথা রয়েছে সেগুলো বের করে দেন।

কাফেরদের এসব আপত্তিকর উক্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হতেন আর এটিই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় এমন ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে, যদি কিছুটা বিনম্র পন্থা অবলম্বন করা হয় তবে হয়তো তাদের আচরণে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে, হয়তো তারা পথে আসতে পারে। এখানে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৫

প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল এই, যখন সারা আরব অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত, শেরক-কুফরী-নাফরমানীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, জুলুম-অত্যাচার যাদের বৈশিষ্ট্য, যারা পথভ্রষ্ট, দিশেহারা, যাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে কু-প্রথা এবং কু-সংস্কার যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আছে, যে সমাজে অবিচারই বিচার, অনাচারই আচার, যারা অসত্যকেই সত্য মনে করছে তাদের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, এক আল্লাহ পাকের নিকটই আশা কর, নিজেদের হাতে বানানো বা পাথর নির্মিত মূর্তিগুলোর পূজা পরিহার কর, তখন তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, সকলেই তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল, এমন অবস্থায় তিনি যদি কোন বিনম্র পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করেন তবে তা আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, কাফেরদের এসব আপত্তিকর আচরণ এবং উক্তিতে আপনি আদৌ ব্যথিত হবেন না, আপনার প্রতি নবুওয়্যতের যে মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করুন, কাফেরদের অন্যায় আচরণের কারণে আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হয়েছে তার কণা মাত্রও আপনি বাদ দিতে পারবেন না, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতিই আপনি ভরসা করুন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ.

(হে রসূল!) তবে কি আপনার নিকট অবতীর্ণ ওহীর কিছু অংশ আপনি বাদ দিয়ে দেবেন এজন্যে যে, কাফেররা বলে আপনার নিকট ধন-ভান্ডার কেন আসেনা? তাঁর সাথে ফেরেশতা কেন নাযিল হয়নি?

إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ

(হে রসূল!) আপনিতো শুধু ভয় প্রদর্শক মাত্র, আপনি তাদের অন্যায় আচরণে মনক্ষুণ্ন হবেন না। তাদেরকে পথ দেখানোই আপনার কাজ, পথে আনা নয়। অতএব, আপনি এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন। আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব একাগ্রচিত্তে পালন করতে থাকুন। তাদের বিষয় আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিন।

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

আর সব কিছুর দায়িত্ব আল্লাহ পাকই গ্রহণ করেছেন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই, ধন-ভান্ডার এবং ফেরেশতা ব্যতীতই তিনি আপনার দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। অতএব, তাদের অন্যায় আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

ইমাম রাজী (রহ.) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আবদার করলো, যদি আপনি সত্য রসূল হন তবে মক্কার পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন।

অন্য একদল কাফের এসে বললো, আপনি যদি সত্য রসূল হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহর ফেরেশতা এসে আপনার রেসালতের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করুক, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, কাফেররা এমন দাবীও করতো যে আপনি এমন গ্রন্থ নিয়ে আসুন যাতে আমাদের মূর্তি পূজার সমালোচনা না থাকে, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, এসব অন্যায় আবদার ও অহেতুক কথাবার্তার প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। আপনার কাজ তাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছে দেয়া, অন্যায়ের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা। আর আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন। তাদের বিষয় আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিন।[১]

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَّ
ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ
زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তরজমা

(১৩) তারা কি বলে, কোরআন আপনি তৈরী করেছেন? (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এর অনুরূপ স্বরচিত দশটি সূরা আনয়ন করতো দেখি? আর আল্লাহ পাক ব্যতীত যাকে পার ডেকে লও।

(১৪) যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে না পারে, তবে জেনে রেখ পবিত্র কোরআন আল্লাহর ওহী দ্বারাই নাযিল হয়েছে। আর একথাও জেনে রেখ যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, এখন কি তোমরা অনুগত হবে?

(১৫) যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে তবে আমি দুনিয়াতে তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি। এতে তাঁদেরকে এতটুকু কম দেয়া হবেনা।

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৯২-৯৩

(১৬) এরাই সে সব লোক, আখেরাতে যাদের জন্যে অগ্নি ব্যতীত কিছুই নেই এবং তারা এখানে যা কিছু করেছিল তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হলো, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল তার সবই বিনষ্ট হলো।

তফসীরুল কোরআন

মুশরেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মোজেযার ফরমায়েশ করতো। অথচ তাদের সম্মুখেই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট মোযেজা। আর তা হল আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন। কিন্তু এ দূরাত্মা কাফেররা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করতো না। তারা এ ভ্রান্ত ধারণা করতো যে পবিত্র কোরআন আপনার স্বরচিত গ্রন্থ, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ

"তারা কি একথা বলে পবিত্র কোরআন আপনিই রচনা করেছেন"?

قُلْ

(হে রসূল!) আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিন, যদি কোরআন আমার রচিত হয় বা কোন মানুষের রচিত হয় তবে তোমরাও তো মানুষই। ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যে পারদর্শিতার দাবী তোমরাও করে থাক।

فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ

অতএব, তোমরা সকলে মিলে পবিত্র কোরআনের সূরার ন্যায় দশটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ কর এবং যাকে ইচ্ছা সাহায্যের জন্যে ডাক। আল্লাহ পাক ব্যতীত যত সাহায্যকারী পাও, সকলকে হাযির কর। সকলে সম্মিলিতভাবে পবিত্র কোরআনের অনুরূপ সূরা রচনায় সচেষ্ট হও। তবে মনে রেখ তোমরা কখনও পবিত্র কোরআনের অনুরূপ সূরা প্রণয়নে সক্ষম হবেনা। শুধু তোমরাই নও, সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হয়েও পবিত্র কোরআনের অনুরূপ রচনা পেশ করতে সক্ষম হবেনা।

পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা

সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হয়েও পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করতে পারেনা-পারবেনা তা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা। পবিত্র কোরআন অলৌকিক, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী

১. যেভাবে আল্লাহ পাক অদ্বিতীয়, অতুলনীয় তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনও অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। তার সৌন্দর্য অকল্পনীয়, তার বর্ণনা-শৈলী অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

২. পবিত্র কোরআনে দ্বীন ইসলামের মূলনীতি তৌহিদ, রেসালত এবং আখেরাতের বিবরণ এত সুন্দর এবং বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যার দশভাগের এক ভাগও তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিলে স্থান পায়নি।

৩. পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ এবং কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে যে সব জ্বলন্ত-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, পৃথিবীর সকল যুগের দার্শনিকদের পক্ষে তার জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি।

৪. পবিত্র কোরআনে হালাল-হারামের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫. পবিত্র কোরআনে পূর্বকালের নবীগণের মূল্যবান নসিহত এবং তাৎপর্যবহ উপদেশ সমূহ স্থান পেয়েছে।

৬. পবিত্র কোরআন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করে।

৭. পবিত্র কোরআন পূর্বকালের উম্মতদের ঘটনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে। আর ভবিষ্যতের জন্যে মোমেনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিজয় দান করবেন।

৮. পবিত্র কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব দেয়। পৃথিবীতে যে পরিবর্তন আসবে তার সন্ধানও দেয় এবং কিভাবে কেয়ামত আসবে তার বিবরণও পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে। ভাষার অলংকার, ভাবের নতুনত্ব, বক্তব্যের যৌক্তিকতা সব কিছুই পবিত্র কোরআনে অভূতপূর্ব, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কোরআনে সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ কোরআনের সমতুল্য বাণী পেশ করার জন্য কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এরপর আলোচ্য আয়াতে মাত্র দশটি সূরা প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। অবশ্য অবশেষে মাত্র একটি সূরা প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا.

"যদি তা না পার, আর কখনও পারবেনা তবে সেই অগ্নিকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর যা কাফেরদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে"। পবিত্র কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিশ্ববাসীর সম্মুখে আজও রয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-বাসীর পক্ষে পবিত্র কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার সমতুল্য সূরা পেশ করা আজও সম্ভব হয়নি। পবিত্র কোরআনের এমনি উজ্জল মহিমা দেখা সত্ত্বেও যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করেনা তাদেরকে ভাগ্যাহত ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! এমন লোকদের পরিণাম সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ.

যারা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনা এবাং পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে মানেনা, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মোতাবেক জীবন যাপন করেনা; বরং দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উল্লাসে

মেতে ওঠে, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতেই তারা থাকে মুগ্ধ, মত্ত, কোন সময় কোন সৎ কাজ তারা করেনা, এমনকি যদি কোন সৎ কাজ তারা কখনও করেও, তবে তা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করেনা; বরং দুনিয়াতে খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যেই তা করে। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

যারা দুনিয়ার এ পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৌন্দর্য কামনা করে তাদের নিরাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের সকল প্রচেষ্টার ফল তাদেরকে এখানেই দেয়া হবে। এতটুকু তাতে কম করা হবেনা। তারা যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদ চায় তবে তাদেরকে কারুণের মত ধনী করা হবে। যদি দুনিয়ার ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি চায় তবে ফেরাউনের মত তাদেরকে ক্ষমতাবান করে দেয়া হবে।

نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا.

তাদের ভাল কাজের বদলা এখানেই পুরাপুরি দেয়া হবে, তাদের সৎ কাজের প্রতিদান এখানেই তারা লাভ করবে।

এক মহাসত্যের ঘোষণা

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন এক মহাসত্য ঘোষণা করেছে। আর তা হল যে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উন্নতি-অগ্রগতিকেই জীবনের সকল সাধনার উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে এ পৃথিবীতেই তাদের কাম্য বস্তু পুরোপুরিই দেয়া হবে। আজকের পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য দিবালোকের মত সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে কী ব্যক্তি কী সমাজ কী জাতি সকলেই পার্থিব জীবনের উন্নতি-অগ্রগতিকেই জীবন-সাধনার উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ পবিত্র কোরআন এ পর্যায়ে মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করে ঘোষণা করেছেঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ (সূরা নেছা)

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য"।

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى. (সূরা আলা)

"আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী"।

অতএব, চিরস্থায়ী সুখ বা দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর অন্বেষণে জীবনকে ব্যয় করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ লাভ করতে হলে চাই আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং আনুগত্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং অনুকরণ ও পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ। যারা এ কল্যাণকর পথ বর্জন করবে এবং আল্লাহর প্রতি

ঈমান ব্যতীত কিছু সৎ কাজও করবে তারা দুনিয়াতে তাদের সৎ কাজের প্রতিদান পেলেও আখেরাতে হবে রিক্তহস্ত, আখেরাতের নেয়ামত থেকে তারা হবে বঞ্চিত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

"তারা সে সব লোক, আখেরাতে যাদের জন্যে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই নেই, তারা পৃথিবীতে যা কিছু ভাল কাজ করেছে তা আখেরাতে নিষ্ফল এবং নিরর্থক প্রমাণিত হবে"।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, যে সব কাফেররা সৎ কাজ করে, যেমন দান খয়রাত করে তাদের দান খয়রাত ব্যর্থ হয়না; বরং এ পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখ্যাতির আকারে তাদের প্রতিদান তারা ভোগ করে। কিন্তু আখেরাতে তারা হয় শূণ্য হস্ত। কেননা যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই করেনা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজই করেনা, তারা আখেরাতে কিছুই পেতে পারে না। ইসলামী তত্ত্ববিদগণ বলেছেন, যদি কোন সৎ কাজ যেমন আল্লাহর জিকর, তেলাওয়াতে কোরআন প্রভৃতি দুনিয়ার লাভ এবং লোভে করা হয়, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না করা হয় তবে আখেরাতে তার কোন সওয়াব বা শুভ পরিণতি পাওয়া যাবে না।

জীবন-সাধনাকে সার্থক করার পন্থা

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অতএব, সর্ব প্রথম ঈমান একান্ত জরুরী, ঈমান ব্যতীত কোন নেক আমল গ্রহণযোগ্য হয়না।

দ্বিতীয়তঃ নেক আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে নিয়্যত সঠিক হওয়া পূর্বশর্ত তথা নেক আমল হতে হবে এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এ নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ঠিক না হলে নেক আমলের উপকারিতা পাওয়া যাবেনা।

তৃতীয়তঃ নেক আমল যাই হোক, তাতে অনুসরণ করতে হবে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। শুধু এভাবেই আখেরাতে নেক আমলের সওয়াব বা শুভ পরিণতি লাভ হবে।

অতএব, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার জন্য তিনটি গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবেঃ

১. ঈমান,

২. এখলাস,

৩. এতায়াত

এ তিনটি গুণ পরিপূর্ণভাবে অর্জন করার মাধ্যমে আখেরাতের চির সাফল্যের আশা করা যায়। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে, কেউ বলেছেন এ আয়াত কাফের ও মুশরেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদী নাসারাদের সম্পর্কে। আর কেউ বলেছেন এ আয়াত

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬১

নাযিল হয়েছে মুনাফেকদের সম্পর্কে বা সে সব লোকদের সম্পর্কে যারা লোক দেখানোর জন্যে সৎ কাজ করে।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেনঃ এ আয়াতের মর্ম সকলের জন্যেই প্রযোজ্য। কাফের, মুনাফেক, ইহুদী, নাসারা বা রিয়াকার সকলের জন্যেই রয়েছে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী যে, আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে অগ্নির শাস্তি। তারা হয়তো দান খয়রাত করেছে, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করেছে, সমাজের কল্যাণে কোন ভাল কাজ করেছে তাদের জন্যে দুনিয়াতে যশ খ্যাতির আকারে প্রতিদান থাকবে, কিন্তু আখেরাতে তারা ভোগ করবে দোযখের শাস্তি।[১]

وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

আর তারা যা সৎ কাজ করে তা প্রকৃত অবস্থায় নিরর্থক হবে, কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা কোন কাজই করেনি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, প্রকাশ্যে মনে হয় আয়াতখানি কাফেরদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। বোখারী শরীফে হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিবরণ সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহে তিনটি চামড়া ব্যতীত কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ পাক আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। পারশ্যবাসী এবং রোমবাসীদেরকে আল্লাহ পাক আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর এবাদত করেনা তবুও তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বালিশে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। একথা শ্রবণ করে তিনি বসে গেলেন এবং এরশাদ করলেন, হে এবনে খাত্তাব! তুমি এখনও এই ধারণায় রয়েছ? তারাতো দুনিয়ার প্রার্থী সেজন্যে দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাস তাদেরকে দেয়া হয়েছে। অথচ মোমেনের উদ্দেশ্য দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য। আর আখেরাতের সাফল্য মোমেনের নিকট অধিকতর প্রিয়। এজন্যে মোমেনকে নেক কাজের বদলা দুনিয়াতেও দেয়া হয় এবং আখেরাতেও সওয়াব দেয়া হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক মোমেনের প্রতি জুলুম করেন না। তার নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেও দেয়া হয়, আখেরাতেও তার সওয়াব দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, কাফেরের সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতে তাকে দেয়া হয় কিন্তু আখেরাতে সে যখন পৌঁছবে তখন দেখবে যে তার এমন কোন নেকী নেই, যার বদৌলতে তাকে কিছু দেয়া যায়। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) আরও লিখেছেন,

لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩১-৩২

এ আয়াতাংশে ইঙ্গিত রয়েছে যে আয়াতখানি কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কেননা, ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একমত যে, ঈমানদারগণ অবশেষে জান্নাতে যাবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথা বলেছেন, আয়াতখানি সে সব লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নেক আমল করে। হযরত আবু সাঈদ এবনে ফুজালা বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন। সেদিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে কোন আমল করেছে কিন্তু তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও শরীক করেছে, সে যেন তার আমলের প্রতিদান সেই শরীক থেকে চেয়ে নেয়। আল্লাহ পাক সকল প্রকার শেরক থেকে পবিত্র। (আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার নিয়্যত আখেরাতের সাফল্য, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে দুনিয়ার সকল কিছু থেকে তথা দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে দেন এবং তার পেরেশানী দূর করে দেন। আর দুনিয়া অপমানিত হয়ে তার নিকট হাযির হয় আর যদি দুনিয়ার লাভই নিয়্যত হয় তবে আল্লাহ পাক তার নয়ন যুগলের সম্মুখে পরমুখাপেক্ষিতা এনে দেন অর্থাৎ তার অনেক প্রয়োজন দেখা দেয় এবং আল্লাহ পাক তাকে পেরেশান করে দেন। অথচ দুনিয়ার সম্পদ সে এতখানিই লাভ করে যতখানি আল্লাহ পাক তার জন্যে লিখে দিয়েছেন।[১]

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ ﴿١٧﴾
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ
يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯-৩০

তরজমা

(১৭) (অতএব যে কোরআনকে অস্বীকার করে) সে কি তেমন ব্যক্তির সমান হতে পারে? যে তার প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত সুস্পষ্ট দলিল (পবিত্র কোরআন)-এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তার সঙ্গে তো একটি সাক্ষী তাতেই বিদ্যমান, আর এর পূর্বে মূসার কিতাব রয়েছে, যা অগ্রণী এবং রহমত স্বরূপ। এমন লোকেরাই কোরআনে করীমের প্রতি ঈমান রাখে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি কোরআনকে অমান্য করবে, তার প্রতিশ্রুত স্থান হবে দোযখ, অতএব (হে শ্রোতা পাঠক) তুমি তাতে সন্দেহে পতিত হয়োনা। পবিত্র কোরআন নিশ্চয় (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, কিন্তু অনেক লোকই তা বিশ্বাস করেনা।

(১৮) আর যে আল্লাহ পাকের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির করা হবে। সাক্ষীরা বলবে, এরাই সে সব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছিল। মনে রেখ, জালেমদের উপরই রয়েছে আল্লাহ পাকের লা'নত।

(১৯) যারা আল্লাহ পাকের পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে, তারাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব লোকের কথা আলোচিত হয়েছে যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লাভ-লোভ নিয়ে ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে। তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আলোচ্য আয়াতে দুনিয়াদার এবং যারা আখেরাতের সাফল্য কামনা করে তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং উভয় দলের অবস্থার বিবরণের পর তাদের পরিণতিও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এভাবেঃ

افمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحيواة الدنيا وزينتها وليس له فى الاخرة الا النار

এরূপ মহান ব্যক্তি যে তার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে অবতীর্ণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে তথা সঠিক পথে রয়েছে সে-কি দুনিয়া-প্রিয়-ব্যক্তির ন্যায় হবে যে দুনিয়ার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য চায়, আখেরাতে যার অগ্নির শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নেই, উভয়েই কি সমান হতে পারে? তা কখনও হতে পারে না।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) এ পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে যার বিবরণ স্থান পেয়েছে তিনি কে? দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে بَيِّنَةٍ শব্দের ব্যাখ্যা কি? এরপর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যিনি আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, সুস্পষ্ট দলিলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তিনি হলেন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ বাক্য দ্বারা তাদেরকে

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-২০০

বোঝানো হয়েছে, যারা ইহুদীদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)। আর بَيِّنَةٍ এর অর্থ সুস্পষ্ট এবং সঠিক পথ, যা অবলম্বন করলে মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারে।[১]

আর সে পথ হল দ্বীন ইসলাম যা স্বভাব ধর্ম যেমন হাদীস শরীফে আছে–

كل مولود يولد على الفطرة وابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

অর্থাৎ প্রতিটি নবজাতকই স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা এবং অগ্নিপূজক করে দেয়।

মুসলিম শরীফে একখানি হাদীসে কুদসী সংকলিত হয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আমি সকল বন্দাকে তৌহিদবাদী হিসেবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান এসে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং আমার হালাল করা জিনিসগুলো তাদের জন্যে হারাম করে দেয় এবং তাদেরকে বলে আমার সাথে শিরক করতে, যার কোন দলিল আমি নাযিল করিনি"।[২]

দ্বীন ইসলামের সত্যতার প্রমাণ

অতএব, সর্বপ্রথম মানুষকে তার স্বভাবই সত্য দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করে কেননা, এটি নির্ভুল পথ। আলোচ্য আয়াতে شَاهِدٌ শব্দটি দ্বারা পবিত্র কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম যে সত্য ধর্ম তার জীবন্ত সাক্ষী হল পবিত্র কোরআন অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহান বাণী-যা জীব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। অতএব, পবিত্র কোরআনের বাহক হচ্ছেন জীব্রাইল (আঃ) এবং ধারক হলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, এ দ্বীনের সত্যতার সাক্ষী জীব্রাইল (আঃ) এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর জীবনাদর্শ, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য, তাঁর নূরানী চেহারা মোবারক, তাঁর মধুর বাণী এসব কিছুই দ্বীন ইসলামের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ আর যেহেতু পবিত্র কোরআন অলৌকিক, তার মোকাবেলা করা সমগ্র বিশ্ববাসীর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই পবিত্র কোরআন নিজেই নিজের সত্যতার প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত নাযিল হয়েছে, তৌরাতেও পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

অতএব, আয়াতের মর্মকথা হল এই, যে ব্যক্তি আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে সে কোন দিনও "দুনিয়াদার" "রিয়াকার" এর মত হতে পারেনা যার উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়ার লোভ-লালসা চরিতার্থ করা। এটি তো

---

[১]। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০১
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৭

মানুষের স্বভাবের দাবী, তদুপরি যখন পবিত্র কোরআন নাযিল হয় এবং পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়না, এমন অবস্থায় দ্বীন ইসলামের সত্যতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এতদ্ব্যতীত, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ তৌরাতও দ্বীন ইসলামের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। সে যুগে বনী ইসরাঈলের সকল নবীগণ এবং তাদের অনুসারীগণ তৌরাতকে মেনে চলতেন এবং তৌরাতই তখন আল্লাহর রহমত লাভের উপকরণ ছিল। অতএব, দ্বীন ইসলামের সত্যতার প্রমাণ স্বয়ং পবিত্র কোরআন এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তৌরাতও।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, আবুশ্ শেখ এবং এবনে মরদবিয়া বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে شَاهِدٌ শব্দটি দ্বারা জীব্রাঈল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন নিয়ে আসতেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে তাঁকে শোনাতেন। যেভাবে জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন, তেমনি তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকটও তৌরাতের তেলাওয়াত করতেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, شَاهِدٌ শব্দটির যে ব্যাখ্যা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) করেছেন আলকামা (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) এ সম্পর্কে অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য হাসান (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ মত পোষণ করতেন যে, আলোচ্য আয়াতে شَاهِدٌ শব্দ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অতএব, দ্বীন ইসলামের সত্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষী স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, পবিত্র কোরআন এবং তৌরাত। এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ্ শেখ মুজাহেদ (রঃ)–এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আয়াতের প্রথম বাক্য مَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। আর شَاهِدٌ ছিলেন একজন ফেরেশতা, যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আলোচ্য আয়াতে شَاهِدٌ শব্দ দ্বারা হযরত আলী (রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ একবার হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, কোরায়শের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যাপারে কোন একখানি আয়াত অবশ্যই নাযিল হয়েছে। এক ব্যক্তি আরজ করলেন, আপনার সম্পর্কে কি কোন আয়াত নাযিল হয়েছে? তখন তিনি আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যটি তেলাওয়াত করেছিলেনঃ

وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ.

অর্থাৎ আমার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হল হযরত আলী (রাঃ)-কে شَاهِدٌ কেন বলা হয়েছে? হয়ত এর কারণ এই, শিশু কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)-ই সর্ব প্রথম ঈমান এনেছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আমার মতে, হযরত আলী (রাঃ)-কে شَاهِدٌ বলার বড় কারণ হল এই, তিনি বেলায়েতের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বেলায়েতের কেন্দ্রবিন্দু। সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরাম এমনকি, সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত বেলায়েতের মাকামে তাঁর অনুসারী ছিলেন।

অবশ্য একথা সত্য যে, প্রথম তিন জন খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ) অবশ্যই তাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় ছিলেন এবং তাঁদের ফজিলতের অন্য কারণও রয়েছে যার ব্যাখ্যা হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) তাঁর মকতুবাতের শেষে করেছেন।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا دار الحكمة وعلى بابها

আমি জ্ঞানের গৃহ, আর আলী হল এ গৃহের দ্বার। তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ

انا مدينة العلم وعلى بابها.

আমি এলমের শহর, আলী হল ফটক। যাহোক, আয়াতের ব্যাখ্যা হল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণও নিয়ে এসেছেন। তাঁর মোজেযা সমূহ এর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা হল কোরআনে মজীদ। যারা এ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণকে গ্রহণ এবং বরণ করেছে, তারাই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

তারাই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তথা যারা সুস্পষ্ট দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ.

পক্ষান্তরে যারা তাকে অবিশ্বাস করেছে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাদের জন্যে দোযখ নির্ধারিত হয়ে আছে।[১]

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ! সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, এই উম্মতের যে কেউ কাফের, মুশরেক, ইহুদী, ঈসায়ী হবে আর ঐ অবস্থায় তার

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

মৃত্যু হবে এবং আমাকে যে হেদায়েত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তার উপর ঈমান আনবে না, তবে সে অবশ্যই দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মুসলিম শরীফ)

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ

পবিত্র কোরআনের পাঠক বা শ্রোতা মাত্রের উদ্দেশ্যেই এ নির্দেশ যে, হে পাঠক বা শ্রোতা! তুমি পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করোনা। পবিত্র কোরআন যে আল্লাহ পাকের মহান বাণী এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, এটি ধ্রুব সত্য যে পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই অবতীর্ণ। অথবা আলোচ্য বাক্যটিতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে সকলকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

"সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে মিথ্যা কথা রচনা করে"।

অর্থাৎ যে এমন অন্যায় করে সে সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, তাঁর নিজস্ব কালাম, অতএব মানুষ মাত্রেরই তাঁর প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করে তাকে মানুষের রচনা বলে ধৃষ্টতা দেখায় তবে তার চেয়ে বড় অপরাধী আর কেউ নেই। এমনিভাবে কাউকে আল্লাহ পাকের শরীক মনে করা, তাঁর সন্তান-সন্ততি বলা, এমন বিধানকে আল্লাহ পাকের বিধান মনে করা যা তিনি নাযিল করেন নাই, অথবা আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাকে অস্বীকার করা এবং একথা বলা যে, এমন বিধান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়নি এসব কিছুই হল আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করা।

اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ

কেয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহ পাকের সম্মুখে হাযির করা হবে এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তখন সাক্ষীগণ বলবেন, এরাই সে সব লোক যারা আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করেছে অর্থাৎ আমলের লেখক ফেরেশতাগণ তখন একথা বলবেন।

আবুশ্ শেখ মুজাহেদ (রহঃ)-এর সূত্রে এ ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এখানে সাক্ষী হিসাবে আম্বিয়ায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আর যাহ্যাক (রহঃ) এই মতই পোষণ করেছেন কেননা, অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا.

"(অর্থাৎ) তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী নিয়ে আসবো এবং (হে রসূল!) আপনাকে সকলের উপর সাক্ষী হিসাবে পেশ করবো"। এ আয়াতে শহীদ (সাক্ষী) বলতে পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল তত্ত্বজ্ঞানী একমত। এবনে মোবারক (রহঃ) সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এমন কোন দিন যায় না যখন প্রত্যেক উম্মতের পয়গম্বরের সম্মুখে তাদের আমল সকাল এবং বিকালে পেশ করা না হয়। নবী তাদের আমল এবং চিহ্ন দেখে তাদের চিনে ফেলবেন এবং কেয়ামতের দিন তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের কীর্তিকলাপের দপ্তর তাদের সম্মুখে উম্মুক্ত করা হবে তখন ফেরেশতাগণ এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ

هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ

"এরাই সেই পাপীষ্ঠের দল যারা আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রটনা করেছিল"।

কেয়ামতের দিন যা সাক্ষী হবে

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতের বক্তব্য সমগ্র মানব জাতির জন্যেই, তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে তিনি বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ পাক মোমেনকে কাছে এনে স্বীয় কুদরতী হস্ত মোবারক তার স্কন্ধের উপর স্থাপন করবেন এবং গোপনে বলবেন, তোমার অমুক গুনাহর কথা মনে আছে? মোমেন আরজ করবে, জ্বী হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে মোমেন থেকে তার গুনাহ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি নিয়ে নেবেন। মোমেন তখন ধারণা করবে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার গুনাহ সমূহের উপর আবরণ রেখেছি (তথা তোমার গুনাহ গোপন রেখেছি) আজ আমি তোমার গুনাহ মাফ করছি। এরপর তাকে নেকী সমূহের লিখিত বিবরণ প্রদান করা হবে।

পক্ষান্তরে কাফের এবং মুনাফেকদেরকে সকলের সম্মুখে হাযির করে বলা হবেঃ

هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

"এরাই সেই পাপীষ্ঠের দল যারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করেছিল। সাবধান! জালেমদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ পাকের লা'নত"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেন, ইতিপূর্বে কেয়ামতের দিন যাদের সাক্ষ্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে শুধু তারাই সাক্ষ্য দেবেনা, বরং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে যেমন সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

(আজকের দিনে তাদের রসনাকে মোহরাঙ্কিত করে দেব, তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কীর্তি কলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে) যেমন অন্য আয়াত এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন তাদের হাত এবং পাগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে"।

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ

كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا - وبالكرام الكاتبين شهيدا.

(আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।) এতদ্ব্যতীত স্থান এবং কালও সেদিন সাক্ষ্য দেবে যে, কোন্ বন্দা এবং কোন্ বাঁদী জমিনের উপর কি করেছে। বোখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোয়াজ্জেনের আওয়াজ যতদূর পৌঁছবে এবং যে পর্যন্ত জ্বীন ও মানুষ মোয়াজ্জেনের আওয়াজ শ্রবণ করবে কেয়ামতের দিন তার পক্ষে তারা সাক্ষ্য দেবে। এবনুল মোবারক (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি যে স্থানে সেজদা করবে সেখানে বৃক্ষ থাকুক বা পাথর কেয়ামতের দিন তা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আবু নাঈম হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসারের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মানুষের জীবনে যে দিনই আসুক সেদিন ঐ ব্যক্তিকে ডেকে বলে, হে আদম সন্তান! আমি নতুন, তুমি যা কিছু করবে আমি আগামীকাল তার সাক্ষ্য দেব। এজন্যে তুমি আমার মধ্যে নেক আমল কর যাতে করে কাল আমি তোমার পক্ষে ভাল সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আজ আমি বিদায় নেই তবে তুমি আর কখনও আমাকে দেখতে পাবে না। রাতও এভাবেই বলে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এই অর্থ সম্পদ বড় সুন্দর, মিষ্টি মধুর, মুসলমানের উত্তম সাথী। যে ধন-সম্পদ বন্দী, এতিম, অভাবগ্রস্ত, পথিক মুসাফিরকে দান করা হয় সেই ধন-সম্পদ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে পরের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করে তার অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয়না, কেয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রটনা করেছে এবং আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করেছে তারা শুধু যে নিজেরাই দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে রয়েছে তাই নয়; বরং অন্য মানুষকেও আল্লাহর দ্বীন থেকে বিরত রেখেছে এবং দ্বীন ইসলামে বক্রতা অনুসন্ধান করেছে।

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ.

আর তারা আখেরাতকে অস্বীকার করেছে। আখেরাতকে অস্বীকার করা যেন তাদের বৈশিষ্ট্য। তাই তারা হয়েছে অভিশপ্ত। তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ পাকের লা'নত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর অবাধ্য নাফরমানদের অবস্থা এবং শোচনীয় পরিণাম ঘোষণা করা হয়েছে। অবস্থা হল এই,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.

১. তারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা রটনা করেছে।

اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ.

২. তাদেরকে কেয়ামতের দিন অপমানিত অবস্থার দাড় করানো হবে।

وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ

৩. আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মনোনীত সাক্ষীগণ তাদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছিল।

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

৪. এই জালেমরা আল্লাহ পাকের নিকট অভিশপ্ত।

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৫. তারা শুধু যে সত্যকে গ্রহণ করতো না তা নয়, বরং অন্যকেও সত্য গ্রহণে বাধা দিত।

وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا

৬. দ্বীন ইসলামের মহান শিক্ষায় ত্রুটি, খুঁত অন্বেষণ করতো এবং সন্দেহ সৃষ্টি করতো।

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

৭. তারা আখেরাতকে অস্বীকার করতো।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

৮. আল্লাহ পাকের ক্ষমতার আওতা থেকে তারা কোন অবস্থাতেই পলায়ন করতে সক্ষম হবে না।

وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

৯. তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ

১০. তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে।

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ

১১. তারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল, তাই তারা সত্য কথা শ্রবণ করতে এবং সঠিক পথ দেখতে সক্ষম ছিলনা।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم
مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ
أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ
وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২০) তারা পৃথিবীতে (পলায়ন করে) আল্লাহকে অপারগ করতে পারতো না। আর আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভিভাবকও ছিলনা। তাদের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা। তারা (সত্য কথা) শ্রবণ করতে পারছিল না এবং (সঠিক পথ) দেখতেও সক্ষম ছিলনা।

(২১) এরাই সে সব লোক যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করলো, আর তারা যে অলীক কল্পনা করতো তা তাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেল।

(২২) নিশ্চয় তারা হবে আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয় প্রকাশ করেছে, তারাই হবে বেহেশতবাসী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

(২৪) উভয় দলের দৃষ্টান্ত হল অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির, উভয়ের অবস্থা কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেকদের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা শুধু নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলনা; বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছে, তারা দুনিয়ার মোহে অন্ধ ছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

কাফেরদের অবস্থা ও ভয়াবহ পরিণতির ঘোষণা

পৃথিবীতে কোথাও আত্মগোপন করে তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। তথা তাদের প্রতি আপতিত আযাবকে তারা প্রতিহত করতে পারবে না, পলায়ন করে আল্লাহর আযাব থেকে তারা রক্ষা পাবেনা।

مُعْجِزِينَ

এর অর্থ সম্পর্কে কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, পলায়নকারী। আর মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল যারা ছুটে যায়। তবে উভয় তরজমার মর্ম একই, অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে তাদের শাস্তি প্রদানে আল্লাহ পাককে বিরত রাখতে পারবেনা। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি বিধান করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ পাক অবকাশ দিয়ে থাকেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহ পাক জালেমদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। তাদের শাস্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতেই থাকে। কেননা তারা আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিগুলোর সদ্ব্যবহার করে নাই, তাদের শ্রবণ শক্তিকে সত্য কথা শ্রবণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে, সত্যকে দেখার ব্যাপারে তাদের দর্শন শক্তিকেও ব্যবহার করেনি। তাই দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তারা নিজেরাই বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

(যদি আমরা সত্য কথা শ্রবণ করতাম অথবা সত্যকে বুঝতাম তবে আজ দোযখবাসী হতাম না) আর এ ফরমানই ঘোষণা করা হয়েছে অন্য আয়াতে এভাবে–

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

"যারা কাফের হয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে তাদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করতেই থাকবো"।[১]

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ.

(আর আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবে না) কেননা যাকে আল্লাহ পাক আযাব দেবেন তাকে কেউ সাহায্য করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার আযাবের চেয়ে আখেরাতের আযাব অধিকতর কঠিন এবং চিরস্থায়ী।

يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ

তাদের আযাবকে দ্বিগুণ করা হবে, কাফের হওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, আর যেহেতু তারা অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতো, তাই তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। কাফেররা একথা বলতো যে, ফেরেশতাগণ, মূর্তি এবং দেব-দেবীরা তাদের জন্যে আখেরাতে সুপারিশকারী হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের একথা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। কেননা এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হলো যে, আখেরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী হবেনা। সত্যের সাথে শত্রুতার কারণে তাদের অবস্থা এমন ছিল যে,

مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ.

তারা সত্য কথা শ্রবণ করতে পারতো না এবং সত্য পথ দেখতেও পারতো না অর্থাৎ সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। এজন্যে সত্যের ডাক তাদের নিকট পৌঁছলেও তারা সাড়া দিতনা এবং সত্যের পথ দেখেও দেখতো না। পথ প্রদর্শক তাদের নিকট উপস্থিত হতো, কিন্তু তাঁদের আহ্বানে তারা কর্ণপাত করতো না, ফলে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ দেখে তারা উপদেশ গ্রহণ করতো না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ.

এরাই সে সব লোক যারা নিজেদেরকে সর্বস্বান্ত করেছে, নিজেরাই নিজেদের উপর কুঠারাঘাত করেছে। আল্লাহ পাকের এবাদত পরিত্যাগ করে পাথরের পূজা করেছে। চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের বিনিময়ে চিরশাস্তির কেন্দ্র দোযখকে ক্রয় করেছে। এভাবে তাদের জীবনের সাধনা শুধু যে পন্ড হয়েছে তাই নয়; বরং তাদের জন্যে মহাবিপদের কারণ হয়েছে। তারা চিরস্থায়ী শাস্তিতে পতিত হয়েছে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

(আর তারা যে মিথ্যা রচনা করতো তাও হারিয়ে গেছে) অর্থাৎ তাদের নিজেদের বানানো উপাস্যরাও তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। আর তারা যে আশা করতো যে,

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-১৯

তাদের মূর্তিরা সুপারিশ করে তাদেরকে রক্ষা করবে সে আশাও দূরাশায় পরিণত হয়েছে কেননা, তারা দ্বীনের বদলে দুনিয়াকে ক্রয় করেছে, তাই তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ.

"নিশ্চয় তারা হবে আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত"।

মোমেনদের সত্য-সাধনা ও শুভ পরিণতির ঘোষণা

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ.

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে রয়েছে মোমেনদের অবস্থার বিবরণ এবং তাদের শুভ পরিণতির ঘোষণাঃ "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের সমীপে বিনয় প্রকাশ করেছে, তারাই হবে বেহেশতবাসী এবং তারা তাতে চিরদিন থাকবে"।

وَاَخْبَتُوْٓا

আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো "যারা আল্লাহকে ভয় করেছে"।

কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো "যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে নিশ্চিন্ত হয়েছে" তথা "এতমিনানের" মকামে পৌঁছেছে। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ "কামুসে" এর অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, "বিনয় প্রকাশ করা"।

যাহোক, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমান মোতাবেক নেক আমল করেছে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ভীত সন্ত্রস্ত ও বিনীত হয়ে হাযিরী দিয়েছে, তারা হবে জান্নাতবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে।

মোমেন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ.

"মোমেন ও কাফেরদের দৃষ্টান্ত হলো যেমন অন্ধ ও বধির, চক্ষুষ্মান এবং শ্রবণ শক্তির অধিকারী, উভয়ে কি কখনও সমান হতে পারে"?

কাফের হলো অন্ধ ও বধিরের ন্যায়, অন্ধ ব্যক্তি কিছুই দেখে না আর বধির কারো কথা শ্রবণ করেনা। ঠিক এভাবে কাফের সত্যকে দেখেনা এবং সত্য কথা শ্রবণও করেনা। আর মোমেন সত্যকে দেখে এবং সত্য কথা শ্রবণ করে। যেভাবে অন্ধ আর চক্ষুষ্মান এক সমান হতে পারে না, ঠিক তেমনি মোমেন এবং কাফেরও এক সমান হতে পারে না। যে বধির আর যে শ্রবণ শক্তির অধিকারী তারা যেমন এক সমান হতে পারে

না, ঠিক তেমনি মোমেন ও কাফের এক সমান হতে পারে না। যে চক্ষুস্মান, সে সত্যকে সত্য হিসেবে দেখে এবং বাতিলকে বাতিলই দেখে এবং বাতিল থেকে আত্মরক্ষা করে সত্যকে গ্রহণ করে, কিন্তু যে অন্ধ সে সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়।

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

এখনও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? অর্থাৎ এমন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেয়ার পর, সত্যকে গ্রহণের এমন সুযোগ লাভের পরও কি তোমরা ভবিষ্যত সম্পর্কে ভেবে দেখবে না? এবং নসিহত হাসিল করবে না?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۖ وَمَا نَرَىٰ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۖ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৫) আর নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করি, সে বলেছিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী।

(২৬) তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুর এবাদত করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক অত্যন্ত মর্মান্তিক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

(২৭) তখন তাঁর জাতির কাফের প্রধানরা বলে, আমরাতো তোমাকে আমাদের ন্যায় একজন মানুষই দেখছি। আমাদের মধ্যে যারা অধম, নীচ তারা ব্যতীত আর কেউতো তোমার অনুগত হয়েছে বলে দেখতে পাইনা। আর আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্যও দেখিনা; বরং আমরা মনে করি তোমরা মিথ্যাবাদী।

(২৮) নূহ বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে বল, যদি আমি আমার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং যদি তিনি আমাকে তাঁর তরফ থেকে রহমত দানে ধন্য করেন অথচ এই বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হয়ে থাক, তবে কি আমি এ সম্পর্কে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি? যখন তোমরা তা অপছন্দ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যেভাবে অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান এক হতে পারেনা ঠিক তেমনি সত্যের অনুসারী ও অসত্যের পূজারীও এক হতে পারেনা। আলোচ্য আয়াত থেকে এ সত্যের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকে তিনি প্রায় হাজার বছর ধরে নসিহত করেছেন। কিন্তু তারা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। পরিণামে তাদের উপর প্রলয়ংকরী বন্যার আযাব এসেছে, যাতে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ ঘটনা সূরা ইউনুসে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। এ সূরায় আলোচ্য ঘটনার আরো বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়্যত লাভ করেন। সাড়ে নয়শ' বছর ধরে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে নসিহত করতে থাকেন। কিন্তু যখন তারা তাঁর সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে পূর্বাহ্নেই একটি জাহাজ তৈরী করেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা তাতে আরোহণ করে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পান।

পবিত্র কোরআনে এমনি ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমানদের সতর্ক করা যে, এমন বিপদ তোমাদের উপরও আপতিত হতে পারে। অতএব, সাবধান হও, এক আল্লাহর বন্দেগী কর। তাঁর অবাধ্য হয়োনা। দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) যদিও মক্কার কাফেররা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে আপনি তাতে মনক্ষুণ্ন হবেন না, ধৈর্য সহকারে আপনার রেসালতের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কাফেররা যখন হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহর আযাবকে ত্বরান্বিত করার কথা বলে তখন ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ইউনুসে হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। আলোচ্য সূরায় হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হওয়ার প্রেক্ষিত হলো এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে চরম কষ্ট দিত এবং তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করতো। তিনি সবর করতেন। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক ঐ জালেম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন এবং হযরত নূহ (আঃ)-কে নাজাত দেন। এ প্রসঙ্গেই হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১]

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪০

এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ

আর আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করি। তিনি বলেনঃ "আমি এসেছি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী রূপে"। অর্থাৎ আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবো কেন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আযাব নাযিল হয়? কোন্ জাতি কেন কোপগ্রস্ত হয়? এ পর্যায়ে প্রথম কথা হলো–

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ

"তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা"। কেননা তোমরা যদি তা কর তবে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এমন অবস্থায় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক অত্যন্ত মর্মান্তিক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

আলোচ্য আয়াতে কোন্ দিনের আযাবের কথা বলা হয়েছে? তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দুটি অর্থ হতে পারে।

১. এ দিন হলো কেয়ামতের দিন,

২. যেদিন দুনিয়াতে তাদের প্রতি আযাব আপতিত হবে।

সর্বপ্রথম যিনি কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন

কুফরী ও নাফরমানী তথা মূর্তি পূজা বন্ধ করার জন্যে সর্বপ্রথম যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত নূহ (আঃ)। তিনি তাঁর জাতিকে বললেন, যদি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা বর্জন না কর তবে তোমরা আল্লাহ্ পাকের আযাবে নিপতিত হবে। অতএব, তোমরা শুধু এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, আর কারো নয়। যদি তোমরা এর বরখেলাফ কর তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে কেয়ামতের দিন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের আশঙ্কা করি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ

হযরত নূহ (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তির জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বললো, প্রথম কথা হলো আমাদের ধারণা মোতাবেক নবী রসূলগণের মধ্যে কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, কিন্তু হে নূহ! আমরা তোমার মধ্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখছি না। তুমি যে আমাদের ন্যায়ই সাধারণ মানুষ, তুমি আসমানের ফেরেশতা নও, মানুষ হিসেবেও তোমার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই, তুমি কোন ধন-সম্পদ বা ঐশ্বর্যের মালিকও নও এবং তোমার কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থও নেই।

দ্বিতীয়তঃ যারা তোমার অনুসারী হয়েছে তারা আমাদের সমাজের অত্যন্ত নীচ, অসম্মানিত এবং অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত। আমরা তাদের সঙ্গে একসাথে বসতেও পারিনা। তবে কি নবুওয়্যতের দায়িত্ব অর্পণের জন্যে তুমি ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেউ ছিলনা? অথচ তারা কোন প্রকার চিন্তা-চর্চা না করেই তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। যদি তারা চিন্ত

া-চর্চা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তবে কখনও তোমার প্রতি ঈমান আনতো না। যদি আজ তোমার অনুসারীরা সমৃদ্ধশালী লোক হতো তবে না হয় তোমার প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে আমরা চিন্তা করে দেখতাম।

কোন কোন আধুনিক তফসীরকার এ পর্যায়ে লিখেছেন, বতমান যুগেও ক্ষেত্রবিশেষে নেককার পরহেযগার লোকদেরকে এভাবে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হয়। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে সম্মান এবং মর্যাদার উপকরণ হলো ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা। যার কাছে এই উপকরণ রয়েছে তাকে সম্মানিত মনে করা হয়। আর ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য না থাকলে তাকে সম্মানিত মনে করা হয়না।[১]

তৃতীয়তঃ

وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

আমরা তোমার মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিনা। এমন অবস্থায় তোমাকে কিভাবে আল্লাহর রসূল মেনে নেব? মূলতঃ পৌত্তলিকদের ধারণায় কোন ব্যক্তির আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য হওয়া বা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হওয়ার আলামত হলো সে ব্যক্তি পানাহার করবেনা, নিদ্রিত হবে না তথা সকল মানবিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকবে। সে পানির উপর চলাফেরা করবে, অগ্নিকুণ্ডে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করবে বা আকাশে উড়ে বেড়াবে। যদি এসব গুণাবলীর অধিকারী কেউ হয় তবে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে। অথচ এ হলো তাদের মূর্খতা প্রসূত কথাবার্তা। তাই হযরত নূহ (আঃ)-কে তারা বললো,

بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ

"বরং আমরা তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি"।

অর্থাৎ তোমাকে নবুওয়্যতের দাবীতে মিথ্যাবাদী মনে করি। আর তোমার সাথীদেরকে তাদের এ দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী মনে করি যে, তারা তোমার নবুওয়্যতের দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করেছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির এসব ভিত্তিহীন কথা বার্তার বিবরণ সম্বলিত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে যখন তাঁর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলার জন্যে মক্কার কোরায়শদের তরফ থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট গিয়েছিল, তখন রোমক সম্রাট আবু সুফিয়ান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল যে, উঁচু দলের লোকেরা এই নবীর অনুসারী হয়েছে না দুর্বল লোকেরা? এর জবাবে আবু সুফিয়ান বলেছিল, সমাজের অত্যন্ত দুর্বল লোকেরাই এই নবীর অনুসারী হয়েছে। তখন রোমান নৃপতি বলেছিল হ্যাঁ, দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ নবী রসূলগণের অনুসরণ করে থাকে। অথচ সত্যকে অবিলম্বে গ্রহণ করা কোন দোষনীয় ব্যাপার নয়; বরং বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। বুদ্ধিমান

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কতৃ-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪১

ব্যক্তির কাজই হলো সত্যকে গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। আর এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের সমস্ত নবী রসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। হাদীস শরীফ রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি যত লোককে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি সকলেই ইসলাম গ্রহণে কিছুটা ইতঃস্তত করেছে শুধু আবুবকর (রাঃ), তিনি বিনা দ্বিধায় কোন প্রকার ইতঃস্তত না করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এই, আমরা তোমার মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, তাদের এ কথাটিও মূর্খতা-প্রসূত এবং তাদের মনের অন্ধত্বের পরিচায়ক। কেননা আল্লাহর নবীর মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলি উপলব্ধি করার শক্তিই তাদের ছিল না।[১]

যাহোক, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির এসব প্রশ্নের জবাবে বলেছেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ

নূহ (আঃ) বললেন, হে আমার জাতি! আমি যদি আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট দলিলের উপর থাকি, আর তিনি যদি আমার প্রতি রহমত নাযিল করেন এরপরও তা তোমাদের চোখে না পড়ে তবে কি আমি তোমাদের বিরক্তি সত্ত্বেও তা মেনে নিতে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি?

হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন, নবী রসূলগণ হবেন অসাধারণ এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার নিদর্শন ধন-সম্পদ নয়, রাজকীয় ক্ষমতা নয়, বরং সে বৈশিষ্ট্য হলো গুণ-জ্ঞান, চরিত্র-মাধুর্য, তাকওয়া পরহেযগারী, ন্যায় পরাণতা প্রভৃতি। আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণকে এসব গুণাবলী দান করে থাকেন।

এতদ্ব্যতীত, তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমতও অহরহ হতে থাকে। এ নিয়মে আল্লাহ পাক আমাকেও এসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী দান করেছেন। কিন্তু তোমাদের মনের কপাট বন্ধ, মনের দিক থেকে তোমরা অন্ধ, তাই এসব গুণাবলী দেখতে তোমরা আমার মধ্যে পাওনা, এমনকি অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতেও প্রস্তুত হওনা। অন্ধ মানুষ সূর্য উঠলেও দেখতে পায়না, এমন অবস্থায় আমি কি তোমাদেরকে আমার প্রতি ঈমান আনয়নে বাধ্য করবো?

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ ওয়ালাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর দ্বারা তাঁর জাতি হাজার বছরের নসিহতের পরও উপকৃত হতে পারেনি।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-১১
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৫

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ وَمَآ اَنَا
بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا
لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৯) হে আমার জাতি! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন অর্থ-সম্পদ চাইনা। আমার পারিশ্রমিক এক আল্লাহ পাকের জিম্মায় রয়েছে, আর আমি মোমেনদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারিনা। নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করবে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

(৩০) হে আমার জাতি! যদি আমি মোমেনদেরকে তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখনা?

(৩১) আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ পাকের ধন-ভান্ডার রয়েছে। আর আমি গায়বী খবরও জানিনা। আর একথাও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্পর্কে আমি বলিনা যে আল্লাহ পাক তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না। আল্লাহ পাক তাদের মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন। অতএব, এমন কথা যদি বলি তবে আমি অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

তফসীরুল কোরআন

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির আপত্তিকর উক্তির জবাবে যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা মনে রেখ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমি তা পালন করছি। তোমাদের অর্থ-সম্পদের প্রতি আমার দৃষ্টি নেই। তাই তোমাদের নিকট কোন প্রকার পারিশ্রমিক চাইনা যা আদায় করা তোমাদের জন্যে কষ্টকর হয়। আমিতো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিযুক্ত, আমি তাঁর নির্দেশ মোতাবেকই কাজ করি, আমার কাজই হল তোমাদেরকে নসিহত করা, আল্লাহ পাকের প্রতিই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি নয়, তাই আমার দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান। আমার বিনিময়

আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। কেননা, তিনিই আমাকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। অতএব, তিনিই দান করবেন আমার পুরস্কার।

দ্বিতীয়তঃ তোমাদের এই আবদার যে, আমি দারিদ্র-প্রপীড়িতে মানুষদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু তা কখনও হবেনা কেননা, তাদের নিকট তোমাদের ন্যায় অর্থ-সম্পদ না থাকতে পারে কিন্তু তারা ঈমানের অমূল্য সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ

আর আমি মোমেনদেরকে তাড়াবো না, কেননা নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে হাযির হবে। আমি যদি তোমাদের কথায় তাদেরকে বিতাড়িত করি তবে যখন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এই অভিযোগ করবে, হে আল্লাহ! এই অহংকারীদের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তোমার পয়গম্বর আমাদেরকে বিতাড়িত করেছেন তখন আমার কি উত্তর হবে? অথবা এর অর্থ হল, এই মোমেনগণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবে এবং সফল হবে, এমন নৈকট্য-ধন্য লোকদেরকে আমি কিভাবে বিতাড়িত করতে পারি?

وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ

বরং অবস্থা এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরাই মূর্খ সম্প্রদায়। তোমাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার ব্যাপারে তোমরা অবগত নও। অথবা এর অর্থ এই, মোমেনদের উচ্চ মর্তবা সম্পর্কে অবগত নও। অথবা এর অর্থ হল তোমরা যে তাদেরকে অভদ্র বলেছ এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনিভাবে তাদেরকে মজলিশ থেকে বের করে দেয়ার যে আবদার তোমরা করেছ তা তোমাদের মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

কেননা, তোমরা সম্মান এবং অপমানের মূল তাৎপর্য সম্পর্কেও অবগত নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদকে সম্মানের উপকরণ মনে কর। যাদের কাছে সম্পদ নেই তাদেরকে অপমানিত মনে কর। কেননা তোমরা মূর্খ সমাজ। মূলতঃ আল্লাহ পাকের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা তথা তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নই হলো সম্মানের মূল উপকরণ। আর আল্লাহ পাকের নাফরমানী হলো অপমানের প্রকৃত কারণ। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"আর ইজ্জততো আল্লাহ পাকের জন্যেই এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এবং মোমেনদের জন্যে, কিন্তু মুনাফেকরা তা জানেনা"।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

[১]। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৪০

হে আমার জাতি! মনে কর তোমাদের খাতিরে যদি আমি এই দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষদেরকে বহিস্কার করি তবে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? যারা সত্য-সন্ধানী, যারা কল্যাণকামী, যারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী তারা দরিদ্র হলেও তাদেরকে মজলিশ থেকে সম্পদশালীদের আবদারে বহিষ্কার করা যাবেনা। কেননা এটি হবে জুলুম। আমি তোমাদের খাতিরে আল্লাহ্ পাকের নেক বন্দাদের প্রতি জুলুম করতে পারিনা। নিঃসন্দেহে তোমরা সম্পদশালী কিন্তু সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যায় না। আল্লাহ্ পাক আমাকে নবুওয়্যত এবং রেসালতের উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। আর এই ফকির মিছকিন মোমেনদেরকে দান করেছেন বেলায়েতের মর্তবা, এটি তাঁর দান।

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

এখনও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আর একথাও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না যে, তাদেরকে মজলিশ থেকে বহিস্কার করা অনুচিত হবে।

وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ

এ আয়াত দ্বারা হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে আমার নিকট আল্লাহ্ পাকের ধন-ভান্ডার রয়েছে। তোমরা ধন-সম্পদকে সম্মান এবং মর্যাদার উপকরণ মনে কর আর সম্পদ না থাকাকে ছোট এবং নীচ হওয়ার কারণ মনে কর। কিন্তু তোমরা মনে রেখ, রসূলের জন্যে সম্পদশালী হওয়া শর্ত নয়, আমার দৃষ্টিতে সম্পদ থাকা না থাকা সমান। কেননা সম্মান এবং ইজ্জতের মূল ভিত্তি হল আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য। যার কাছে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য রয়েছে তার জীবন-সাধনা সার্থক। পক্ষান্তরে, যার কাছে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য নেই সে চির বঞ্চিত, চির লাঞ্ছিত।

وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ

আর আমি একথাও বলিনা যে আমি গায়ব জানি। অথবা এর অর্থ হল আমি গায়বী খবর জানিনা যে মানুষের মনে কি আছে তা বলব। তবে আল্লাহ্ পাক আমাকে যা জানিয়ে দেন, তা আমি জানতে পারি।

وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ

আর আমি একথাও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা, বরং আমি মানুষ তবে আল্লাহ্ পাক আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

وَّلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا

যাদেরকে তোমাদের চক্ষু হেয় এবং অপমানিত দেখে, আমি তাদের সম্পর্কে একথা বলিনা যে, আল্লাহ পাক তাদের কল্যাণ সাধন করবেন না। মনে রেখ আল্লাহ পাক সকলের যোগ্যতা এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর প্রত্যেকের সাথে তার যোগ্যতা অনুসারেই তিনি ব্যবহার করেন। তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে গৌরব কর অথচ তোমাদের ধন-সম্পদের এ গর্বই ঈমানের নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করে। দেখা যায় নিঃস্ব দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষই চিরদিন নবী রসূলগণের অনুসারী হয়েছে। মূর্খতার কারণে তোমরা তোমাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারনা। তোমরা অন্ধ এবং অজ্ঞ, তাই তোমাদের আচার-আচরণের ভয়াবহ পরিণতিকে তোমরা ভয় করনা।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

আমার অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি যে মহব্বত রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু তোমরা মনের দিক থেকে অন্ধ বলে তাদের সেই গুণ দেখতে পাওনা। তাই আমি যদি তাদেরকে মজলিশ থেকে বহিষ্কার করি তথা এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা করি–

اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

তবে আমি এমন অবস্থায় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব, তাই তাদেরকে বহিঃস্কার করা সম্ভব নয়।

وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ তোমরা যে বল আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ, আমার প্রতি ঈমান আনয়নের কোন যুক্তি তোমাদের দৃষ্টিতে নেই। কিন্তু আমি কখন দাবী করেছি যে, আমি একজন ফেরেশতা? আমিতো কখনও এমন দাবী করিনি।

মূলতঃ এটি তোমাদের মূর্খতা যে, তোমরা মানুষকে নবুওয়্যতের যোগ্য মনে করনা। তোমরা জাননা যে, নবীর মর্তবা ফেরেশতাদের চেয়ে অনেক বেশী। তোমরা কত মূর্খ তা উপলব্ধি করাও হয়তো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তোমরা বৃক্ষ ও প্রস্তরকে উপাস্য মনে কর, খোদা বলে জান, অথচ মানুষকে আল্লাহর নবী মেনে নেয়ার ব্যাপারেও তোমাদের আপত্তি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আকৃতিতে আমি তোমাদেরই ন্যায়। কিন্তু গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য এবং ফজিলতের দিক থেকে তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র। হযরত নূহ (আঃ) এসব কথা নিজের সম্পর্কে বলেছেন। এরপর তিনি তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ

অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা হেয় এবং অবহেলিত মনে কর তাদের সম্পর্কে আমি এ কথা বলিনা যে, তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। কেননা মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের খবর আল্লাহ পাকই জানেন। তবে যেভাবে তারা প্রকাশ্যে ঈমানের কথা বলছে যদি অন্তরেও ঈমান সঠিকভাবে থাকে তবে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। আর সে প্রতিদান সারা পৃথিবীর রাজত্ব এবং ধন-সম্পদ লাভ করা থেকেও উৎকৃষ্টতর হবে। অতএব, তারা যা প্রকাশ করেছে তার উপর বিশ্বাস করাই হবে আমার কাজ। এমন অবস্থায় তোমাদের আবদার অনুযায়ী তাদেরকে বহিঃষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যদি তা করি তবে আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো।[১]

মাওলানা রুমী (রঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর অভিশপ্ত জাতির অবস্থা এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

اشقیاء را دیدۂ بینا نبود = نیک و بد در دیدہ شاں یکساں نمود

এ হতভাগারা মনের চক্ষু থেকে ছিল বঞ্চিত। তাই ভাল এবং মন্দ তাদের দৃষ্টিতে এক সমান দেখা যাচ্ছিল।

ہمسری باانبیاء برداشتند = اولیاء را ہمچو خود پنداشتند

তারা আম্বিয়ায়ে কেরামের সম মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দাবীদার ছিল এবং আউলিয়াগণকে তারা নিজেদের সমান মনে করতো।

گفتہ اینک ما بشر ایشاں بشر = ماؤ ایشاں بستہ ء خوابیم وخور

তারা বলতো আমরাও মানুষ নবীগণও মানুষ, আমাদের ন্যায় তাদেরও পানাহার এবং নিদ্রার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে আমাদের মধ্যে আর তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ایں ندانستند ایشاں از عمیٰ = ہست فرقے در میاں بے منتہیٰ

তাদের মনের অন্ধত্বের কারণে তারা এ সত্য উপলব্ধি করলো না যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে ও তাদের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে।

ہر دو گوں زنبور خوردند از محل = لیک شد زاں نیش وزاں دیگر عسل

একই ফলের রস চুষে নেয় দুটি পতঙ্গ বোলতা আর মধুমক্ষিকা, একটি থেকে বের হয় ময়লা, আর একটি থেকে আসে মধু।

ہر دو گوں آہو گیا خوردند آب = زیں یکے سرگیں شد وزاں مشکناب

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪৩-৪৪

মওলানা রুমী (রহ.) এ পংক্তিতে আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দুই প্রকার হরিণ, উভয়ে একই চরণ ক্ষেত্র থেকে একই প্রকার ঘাস খায় এবং একই ঘাটের পানি পান করে, কিন্তু একটি হরিণ থেকে শুধু ময়লা বের হয়ে আসে আরেকটি থেকে খাঁটি কস্তরী।

صد ہزاراں ایں چنین اشباہ بیں = فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بیں

এমন লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে যাদের মধ্যে তুমি সত্তুর বছরের ব্যবধান লক্ষ্য করবে।

ایں خورد گر دد پلیدی زو جدا = واں خورد گردد ہم نور خدا

আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি আহার করে এবং তার নিকট থেকে অপবিত্র বস্তু বের হয়। আর যে আল্লাহর হুকুম পালন করে সেও আহার করে তবে তার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত এবং মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং তার নিকট থেকে আল্লাহ্ পাকের নূর বিচ্ছুরিত হয়।

ایں خورد زاید ہمہ بخل وحسد = واں خورد زاید ہمہ نور احد

একজন আহার করে এবং তার মধ্যে কৃপণতা এবং হিংসা সৃষ্টি হয়, আর একজনও খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহর নূর সৃষ্টি হয়।

ہر دو صورت گر بہم ماند رواست = آب تلخ وآب شیرین واصفاست

নেককার এবং বদকার আকৃতির দিক থেকে প্রায় এক প্রকার, যেমন লবণাক্ত পানি এবং মিষ্ট পানি আকৃতির দিক থেকে প্রায় এক প্রকার, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে তাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মূর্খ লোকেরা আল্লাহর নবীর মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কোন মরুভূমিতে দিশেহারা মানুষ যদি সৌভাগ্যক্রমে এমন পথ প্রদর্শকের সাক্ষাত পায় যে পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, সে যদি স্বেচ্ছায় বলে যে, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেব, এমন সময় ঐ দিশেহারা ব্যক্তি বলে, তুমিও আমার ন্যায় মানুষই তোমাকে আমি পথ প্রদর্শক কি করে বানাবো? এমন জবাবের দ্বারা এ ব্যক্তির মনের অন্ধকার এবং নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। ঠিক এভাবেই হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির কথাবার্তা দ্বারা তাদের নির্বুদ্ধিতা এবং মনের অন্ধত্বই প্রমাণিত হয়েছে।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا
فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ
بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ
اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ
فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ
اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩২) তারা বললো হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে কলহ করেছ এবং কলহ করেছ অতি মাত্রায়, এখন তোমার সেই আযাব নিয়ে আস যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

(৩৩) নূহ বললেন, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আযাব নিয়ে আসবেন, আর তোমরা পলায়ন করে তা ঠেকাতে পারবে না।

(৩৪) আর (মনে রেখ) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করলেও তা তোমাদের উপকারে আসবেনা, যদি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক। তাঁরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৩৫) তারা কি বলে, সে কোরআন রচনা করে এনেছে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি তা আমি রচনা করে এনে থাকি তবে আমার অপরাধের জন্যে আমিই দায়ী আর তোমাদের পাপাচারের জন্যে আমি দায়ী নই।

(৩৬) আর নূহের নিকট ওহী এসেছিল, তোমার জাতির যারা ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আর কেউ কখনও ঈমান আনবেনা। অতএব, তারা যা করে তার জন্যে তুমি বিমর্ষ হয়োনা।

(৩৭) আর তুমি আমার সম্মুখে ও আমারই নির্দেশ মোতাবেক একখানি নৌকা তৈরী কর, আর পাপীষ্ঠদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলোনা। নিশ্চয় তারা হবে নিমজ্জিত।

তফসীরুল কোরআন

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির অবান্তর কথা-বার্তার জবাব দিতে থাকেন, তাদের সন্দেহ নিরসন করতে থাকেন, সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত তিনি তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। আর তারা তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করতে থাকে। কখনও তারা তাঁকে পাগল বলতো, কখনও তারা তাঁর প্রতি দৈহিক নির্যাতনও করতো। তিনি এ সুদীর্ঘ সময় যাবত তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে পথে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা কোন অবস্থাতেই সরল সঠিক পথ গ্রহণে প্রস্তুত হলোনা, এমনকি তারা বললো–

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ

হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে অনেক ঝগড়া করেছ, তোমার এসব কথা আমাদের আর সহ্য হয়না। আমরা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকি, তবে তুমি সেই আযাব নিয়ে আস, আমাদেরকে সর্বদা যার হুমকি দিয়ে থাক।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ

হযরত নূহ (আঃ) বললেন, আযাব দেয়ার ক্ষমতা আমার হাতে নেই, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখনই আযাব দেবেন, তবে একথা মনে রেখ যখন সত্যি সত্যিই আযাব এসে পড়বে তোমাদের আত্মরক্ষার আর কোন পথ তখন থাকবে না। তোমরা যে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করবে তারও কোন উপায় থাকবে না।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ

তোমরা যেভাবে কুফরী ও নাফরমানীতে অটল রয়েছ, আর আল্লাহর আযাবকে ত্বরান্বিত করার জন্যে তাগাদা করছো এতে প্রমাণিত হয় তোমাদের অদৃষ্টে আযাব লিপিবদ্ধ আছে, মনে হয় তোমাদের শাস্তি অবধারিত, হয়তো এটিই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। যদি তাই হয়, তবে তোমাদের জন্যে আমার এ নসিহত কোন উপকারে আসবেনা। যাঁর হাতে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ অকল্যাণ, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁর ইচ্ছাই সর্বত্র কার্যকর হয়। তোমরা যা কিছু কর না কেন, অবশেষে তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে এবং তোমাদের কার্যকলাপের বদলা অবশ্যই তোমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ

এ আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ দু'টি অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ

১. এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কেননা মক্কার কাফেররা এই অপবাদ দিয়েছে যে পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রচনা করেছেন (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

এমন অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা করা হবে এভাবেঃ (হে রসূল!) কাফেররা কি এই অপবাদ দেয় যে, কোরআন আপনি রচনা করেছেন? (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি নিজে পবিত্র কোরআন রচনা করে থাকি এবং আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা কথা রটনা করে থাকি, তবে এর শাস্তি আমাকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমাদের কীর্তিকলাপের জন্যে আমি দায়ী থাকবো না।

২. হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতও হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এবং তাঁকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা করা হবে এভাবেঃ নূহ (আঃ)-এর জাতি কি একথা বলে যে, সে আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করেছে। হে নূহ! আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করে থাকি তবে তার জন্যে আমি নিজেই দায়ী, কিন্তু তোমাদের পাপাচারের জন্য আমি দায়ী থাকবো না।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, যেভাবে হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতি মিথ্যাজ্ঞান করেছে ঠিক তেমনি মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গেও অনুরূপ আচরণ করেছে, অথচ পবিত্র কোরআনের সত্যতার দলিল প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এতদসত্বেও দূরাত্মা কাফেররা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করেছে। যাহোক, আলোচ্য আয়াত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা আলোচ্য ক্ষেত্রে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যে একটা সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির কাফেররা তাঁকে এত নির্মমভাবে প্রহার করতো যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন। লোকেরা মৃত মনে করে তাঁকে তাঁর বাসস্থানে ফেলে যেত। কিন্তু পরদিন তিনি আবার বের হতেন এবং মানুষকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাতেন।

বর্ণিত আছে, একবার একজন বৃদ্ধ লোক লাঠি ভর দিয়ে কোথাও গমন করছিল, সঙ্গে ছিল তার পুত্র। পিতা-পুত্রকে হযরত নূহ (আঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললঃ হে আমার পুত্র! এই বৃদ্ধ পাগলের দ্বারা কখনও প্রতারিত হয়োনা। তখন পুত্র বললো আমাকে আপনার লাঠিটি দিন, পুত্র ঐ লাঠি দিয়ে হযরত নূহ (আঃ)-এর মাথায় আঘাত করলো। হযরত নূহ (আঃ) আহত হলেন অত্যন্ত বেশী, তখন হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাকের ওহী প্রেরিত হলো। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ

আর নূহের নিকট প্রত্যাদেশ আসে হে নূহ! তোমার জাতির মধ্য থেকে যাদের ঈমান আনয়নের কথা, তারা ঈমান এনেছে এতদ্ব্যতীত এরপর আর কেউ ঈমান আনবেনা। অতএব, তাদের উৎপীড়নের কারণে বিমর্ষ হয়োনা। কেননা অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরপর আর কেউ ঈমান আনবেনা, যাতে করে তিনি আর তাদেরকে হেদায়েতের ব্যাপারে সচেষ্ট না হন এবং তাদের নির্যাতন-উৎপীড়নের শিকার না হন।

এতে একথাও জানা গেল যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। হযরত নূহ (আঃ) তখন তাঁর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই মোনাজাত করলেনঃ

رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّنَهَارًا

হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে দিবা রাত্রি সত্যের দিকে আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আর আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর তখন তারা কানে আঙ্গুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে রাখে নিজেদেরকে এবং তারা অত্যন্ত বেশী ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে।

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে পরওয়ারদেগার! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা"।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

(যদি তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দাও তবে তারা তোমার বন্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাদের থেকে শুধু দুষ্কৃতকারী ও কাফেরই পয়দা হবে) হযরত নূহ (আঃ)-এর এই বদদোয়ার পর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রত্যাদেশ আসেঃ

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

হে নূহ! আমার সম্মুখে তথা আমার তত্ত্বাবধানে, আমার আদেশ মোতাবেক একখানি নৌকা তৈরী কর। প্রলয়ংকরী প্লাবন অতি আসন্ন, অবাধ্য নাফরমানরা নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে। সাবধান! তাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, তাদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করবো।

وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

অতএব, জালেমদের ব্যাপারে আমার নিকট কোন সুপারিশ করোনা, কেননা তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ

নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে, চিরতরে হবে ধ্বংস।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত জীব্রাইল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে বললেনঃ আপনার প্রতিপালক আপনাকে নৌকা তৈরী করার আদেশ দিয়েছেন।

তিনি বললেনঃ আমি কিভাবে নৌকা তৈরী করবো?

জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তুমি আমার নির্দেশ মোতাবেক এবং আমার তত্ত্বাবধানে নৌকা তৈরী কর। হযরত নূহ (আঃ) তাই করলেন। তফসীরকারগণ লিখেছেন, এটি ছিল একটি বিরাট জাহাজ।[১]

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ
قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ
اللَّهِ مَجْرِاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৮) তিনি (নূহ) নৌকা তৈরী করতে লাগলেন এবং তাঁর জাতির প্রধানরা যখন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন তাঁকে উপহাস করতো। তিনি বলতেন, যদি তোমরা আমাদের উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করবো যেমন তোমরা উপহাস করছো।

(৩৯) অতএব, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কাদের উপর আসে অপমানজনক শাস্তি, আর কাদের উপর আপতিত হয় চিরস্থায়ী আযাব।

(৪০) অবশেষে যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসলো এবং উনান উথলে উঠলো, আমি আদেশ দিলাম প্রত্যেক শ্রেণীর জোড়ের দু'টি করে, আর যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ব্যতীত তোমার পরিবারবর্গ এবং সকল মোমেনকে নৌকায় উঠাও। আর অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার প্রতি ঈমান এনেছিল।

(৪১) নূহ বলেন, তোমরা নৌকায় আরোহণ কর আল্লাহ পাকের নামেই তা চলবে এবং থামবে। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয় এবং অতীব দয়াময়।

---

[১]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৯৪

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক নৌকা তৈরী করতে লাগলেন। কাফেররা তাঁকে উপহাস করতো, তারা বলতো এতদিন সে নবী হওয়ার দাবী করেছিল আর এখন সুতারের কাজ শুরু করেছে। কখনও তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে উপহাস করে জিজ্ঞাসা করতো কি তৈরী করছো? কি হবে এর দ্বারা? হযরত নূহ (আঃ) জবাব দিতেন, একটি ঘর তৈরী করছি যা পানির উপর ভাসবে, যার মাধ্যমে প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে। তখন কাফেররা বলতো লোকটি আস্ত পাগল। এই শুষ্ক স্থানে নৌকা কিভাবে চলবে? নিমজ্জিত হওয়ার ভয় কোথায়?

নূহ (আঃ)-এর তরীর বিবরণ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের হুকুম হয়েছে যে, কাঠ কেটে শুস্ক করে নৌকা নির্মাণের জন্যে তৈরী কর। এতে ১০০শ' বছর অতিবাহিত হয়। সম্পূর্ণভাবে নৌকা তৈরীতে আরো ১০০শ' বছর ব্যয় হয়, মতান্তরে ৪০ বছর।

ইমাম মোহাম্মদ এবনে এসহাক তওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, কাঠ দিয়ে তৈরী এ নৌকাটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৮০ হাত এবং প্রস্থে ৫০ হাত। বাইরে এবং ভেতরে কাঠের উপর এক প্রকার তৈল ব্যবহার করা হয়েছিল।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, দৈর্ঘ্যে তরীটি ৩০০ হাত ছিল। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত, আর প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু' হাজার হাত এবং প্রস্থ ছিল ১০০ হাত। এর উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। নৌকাটি ছিল ত্রিতল। এক এক তলের উচ্চতা ছিল দশ হাত। সর্ব নিম্ন তলে চতুঃস্পদ জন্তু রাখা হয়েছিল। মধ্যস্থ তলে মানুষ ছিল। আর উপরের তলে পাখিদের রাখা হয়েছিল।

এবনে জরীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা তাঁর নিকট এই আরজী পেশ করেন যে, যদি আপনি আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে এমন কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন যে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি দেখেছিল তবে আমরা এ সম্পর্কে কিছু অবগত হতে পারতাম। তখন হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহন করলেন। সেখানে হাম এবনে নূহ এর কবর ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ "আল্লাহ পাকের হুকুমে উঠে দাড়াও"। তখন একজন বৃদ্ধ মানুষ মাটির অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসলো। সে তার মাথার উপর থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার মৃত্যু কি বৃদ্ধ বয়সে হয়েছে? সে বললোঃ না, যৌবনেই আমার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেয়ামত কায়েম হয়েছে এ ধারণা করে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছি। আর সে ভয় আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। হযরত ঈসা (আঃ) তখন বললেন, তুমি আমাদেরকে হযরত নূহ (আঃ)-এর তরী সম্পর্কে কিছু জানাও। সে

বললোঃ তরীটির দৈর্ঘ্য ১২০০ হাত ছিল এবং তার প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। এতে তিনটি স্তর ছিল প্রথম স্তরে বিভিন্ন প্রকার জন্তু রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ, আর তৃতীয় স্তরে ছিল পাখি।

যখন চতুঃস্পদ জন্তুগুলোর গোবর জমে গেল তখন আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেনঃ হাতীর লেজকে নাড়া দাও। যখন হযরত নূহ (আঃ) তা করলেন, তখন এক জোড়া শুকর বের হয়ে এসে গোবরগুলো খেতে লাগলো। এদিকে ইঁদুর নৌকার কাঠগুলো ছিদ্র করতে লাগল। তখন আল্লাহ পাকের আদেশ হলো বাঘের কপালে অঙ্গুলী স্থাপন কর। যখন হযরত নূহ (আঃ) তা করলেন তখন এক জোড়া বিড়াল বের হয়ে ইঁদুরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ হযরত নূহ (আঃ) কি করে জানতে পারলেন যে, শহরগুলো নিমজ্জিত হয়েছে?

তখন লোকটি বললোঃ হযরত নূহ (আঃ) এ সম্পর্কীয় খবর সংগ্রহের জন্যে কাককে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু কাক একটি লাশের উপর বসে গিয়েছিল। সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসলো না। তাই নূহ (আঃ) তার জন্যে এই বদদোয়া করলেন সে যেন সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এজন্যেই কাকেরা কোন সময় ঘরে থাকেনা। অবশেষে হযরত নূহ (আঃ) কবুতরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। সে তার ঠোঁটে জয়তুন বৃক্ষের সামান্য নমুনা নিয়ে আসলো এবং সঙ্গে সামান্য শুকনো মাটিও আনলো। এর দ্বারা জানা গেল যে, শহর নিমজ্জিত হয়েছে। এরপর হযরত নূহ (আঃ) কবুতরের জন্যে নিরাপত্তার এবং মিলে মিশে থাকার তৌফিকের দোয়া করলেন। এজন্যেই কবুতররা মানুষের বাড়ীতে বাসা বেঁধে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। তাঁর নিকট থেকে আরো কথা জানতে পারবো। হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ সে তোমাদের সঙ্গে কি করে যাবে? তার তো দুনিয়াতে জীবিকা নেই।

এরপর তিনি বললেন, "যেমন ছিলে আল্লাহর হুকুমে তেমন হয়ে যাও"। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা হলো এই, এবনে আসাকের সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) এবং হযরত কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আল্লামা বগভী হযরত কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীর দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ৫০০ হাত। উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। এর মধ্যে তিনটি স্তর ছিল। সর্ব নিম্নস্তরে বন্য এবং চতুঃস্পদ জন্তু ছিল। দ্বিতীয় স্তরে অশ্ব, উষ্ট্র আর গৃহপালিত জন্তু ছিল এবং সর্বোচ্চ স্তরে হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সাথী মোমেনগণ ছিলেন এবং খাদ্য-দ্রব্যও ছিল।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন, নৌকাটিতে তিনটি স্তর ছিল। একটি স্তরে বন্য ও চতুঃস্পদ জন্তু ছিল। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সর্বনিম্ন স্তরে ছিল জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ। আর মধ্যম স্তরে ছিল খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, আর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল মানুষ।

আর আল্লামা শামী লিখেছেন, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। আর হাতের অর্থ হলো আঙ্গুল থেকে বাজু পর্যন্ত।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) নৌকা নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। কাফেররা তাঁকে উপহাস করতো। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা বলতেনঃ যত হাসবার হাস, যত বিদ্রুপ করার বিদ্রুপ কর। সামান্য ক'দিন অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করবো। অন্যদিকে নৌকা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির মহিলারা আল্লাহ পাকের হুকুমে বন্ধ্যা হয়ে যায়। এরপর তাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। কাফের প্রধানরা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি উপহাস অব্যাহত রাখলো এবং তিনি তরী নির্মাণের কাজে মশগুল রইলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ

যখন কাফের প্রধানরা তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে উপহাস করতো। তারা বলতো ইতিপূর্বে তুমি নবী ছিলে এখন সুতার মিস্ত্রী হয়েছ।

قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا

হযরত নূহ (আঃ) তাদেরকে বলতেনঃ যেভাবে আজ তোমরা নৌকা নির্মাণ দেখে আমাদের প্রতি উপহাস করছো ঠিক তেমনি যখন তোমরা প্রলয়ংকরী প্লাবনে ধ্বংস হবে এবং দোযখে জ্বলবে তখন আমরা তোমাদের প্রতি উপহাস করবো। অথবা

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ

এর অর্থ হলো যেভাবে তোমরা আমাদেরকে পাগল, জাহেল বলে গাল-মন্দ দিচ্ছ, অদূর ভবিষ্যতে আমরাও তোমাদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করবো।

অথবা এর অর্থ হলো যেভাবে তোমরা আজ আমাদেরকে উপহাস এবং পরিহাসের বিষয় মনে করছো সেদিন দূরে নয়, যখন আমরাও তোমাদেরকে পরিহাসের বিষয় বানাবো।

অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কার উপর অপমানজনক আযাব আসে? আর কারা চিরস্থায়ী আযাবে পতিত হয় কেননা, কয়েক দিন পরই হযরত নূহ (আঃ)-এর এ পথভ্রষ্ট জাতি আল্লাহ পাকের আযাবে ধ্বংস হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি আযাব হতে থাকবে। এরপর কেয়ামতের দিন তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এসহাক এবনে বাশার এবং এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক যখন হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা তৈরীর আদেশ দিলেন, তখন নূহ (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার মালিক! আমি নৌকার জন্যে কাঠ কোথায় পাবো? আল্লাহ

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬

পাক আদেশ দিলেন, তুমি বৃক্ষ রোপন কর। হযরত নূহ (আঃ) বৃক্ষ রোপন করলেন। বিশ বছর যাবত বৃক্ষগুলো বড় হতে থাকে, এ সময় হযরত নূহ (আঃ) দ্বীনের তবলিগ করেননি এবং তাঁর জাতির লোকেরাও তাঁকে উপহাস করেনি। যখন বৃক্ষগুলো পূর্ণ হল, তখন হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক বৃক্ষগুলোকে কেটে ফেললেন এবং কাঠগুলোকে শুকিয়ে নিলেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! নৌকাটির রূপ কি হবে? হুকুম হল নৌকাটির প্রথমাংশ মুরগীর মাথার ন্যায় কর। আর পেছনের অংশ মুরগীর পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় কর এবং মধ্যবর্তী অংশ পাখির বক্ষের ন্যায় কর। এরপর পেরেক দিয়ে নৌকাটিকে মজবুত করা হয়। আল্লাহ্ পাক হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা তৈরী করার কৌশল শিক্ষা দেন।[১]

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ

"অবশেষে যখন আমার আদেশ এসে পড়ে এবং উনান উথলে ওঠে, তখন আমি বলি, প্রত্যেক জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই আদেশ হয়েছে তাদের ব্যতীত তোমার পরিবারবর্গ এবং মোমেনদেরকে নৌকায় তুলে নাও"।

আলোচ্য আয়াতে التَّنُّوْرُ শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর অর্থ হল রুটি তৈরী করার তন্দুর। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, বংশ পরম্পরায় একটি উনান হযরত নূহ (আঃ)-এর হস্তগত হয়েছিল। ঐ উনান থেকে পানি নির্গত হওয়াকে আযাবের নিদর্শন বলে জানানো হয়েছিল।

কারো কারো মতে, 'তন্নুর' হল একটি বিশেষ নির্ঝরের নাম। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তন্নুর শব্দটির অর্থ হল ভোরের আলো। আর আবু হাইয়ান বলেছেন, ভয়ংকর বিপদের কথা প্রকাশার্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তন্নুর শব্দ দ্বারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আবুশ শেখ, একরামা এবং জুহরী (রঃ)-ও এ মতই গ্রহণ করেছেন। আল্লামা বগভী (রঃ)-ও একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-কে বলা হয়েছে, যখন ভূ-গর্ভ থেকে পানি উথলে উঠতে দেখবে, তখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "যখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল"। হাসান (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং শা'বী (রঃ) বলেন, এই তন্নুর হল রুটি তৈরীর উনান। এতদ্ব্যতীত, আরো অনেক তফসীরকার এ মতই পোষণ করেছেন।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন তোমরা তোমাদের বাড়ীর উনান থেকে পানি বের হতে দেখ, তখন মনে করবে যে, তোমাদের জাতির ধ্বংস শুরু হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫

হাসান (রঃ) বলেছেন, পাথর নির্মিত একটি উনান ছিল, এর দ্বারা হযরত হাওয়া (আঃ) রুটি তৈরী করতেন। ওয়ারিশ সূত্রে হযরত নূহ (আঃ) এ তন্নুরটি পেয়েছিলেন। আর হযরত নূহ (আঃ)-কে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল, যখন ঐ তন্নুরে পানি উঠতে দেখ, তখন তোমরা নৌকায় আরোহন করবে।

তন্নুরটি কোথায় ছিল

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), শাবী (রঃ) বলেছেনঃ তন্নুরটি কুফা শহরে স্থাপিত ছিল। শা'বী (রঃ) আল্লাহ পাকের শপথ করে বলেছেন, কুফায় অবস্থিত এ তন্নুরটি থেকেই পানি উথলে উঠেছিল।[১] কুফার মসজিদ এলাকাতেই হযরত নূহ (আঃ) এ ঐতিহাসিক নৌকাটি তৈরী করেছিলেন। তন্নুর থেকে পানি নির্গত হওয়াই ছিল প্রলয়ংকরী তুফানের নিদর্শন।

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

আমি আদেশ দিলাম, প্রত্যেক প্রকার জীব-জন্তু থেকে এক এক জোড়া করে (একটি নর এবং একটি মাদী) নৌকায় তুলে লও।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) আরজ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! প্রত্যেক প্রকার জন্তু থেকে কিভাবে এক এক জোড়া করে বের করব? তখন আল্লাহ পাক সর্ব প্রকার জীব-জন্তুকে একত্রিত করে দিলেন, নূহ (আঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় তাদের উপর স্থাপন করলেন, তাঁর দক্ষিণ হস্ত নরের উপর এবং বাম হস্ত মাদীর উপর পড়লো, এভাবে নর ও মাদী তাঁর হাতে আসলো–

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ

এবং তোমার পরিবারবর্গকে নৌকায় তুলে নাও, তবে তন্মধ্যে যাদের ব্যাপারে আযাবের সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে এবং সকল মোমেনকে। যাদেরকে বাদ দেয়ার নির্দেশ হয়েছে তারা হলো হযরত নূহ (আঃ)-এর "ওয়াহেলা" নামক স্ত্রী আর তাঁর পুত্র "কেনান", তারা উভয়ে কাফের ছিল।

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

"আর অতি অল্প সংখ্যক লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছিল"।

নূহ (আঃ)-এর যুগের মোমেনদের সংখ্যা

এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছেঃ কাতাদা, এবনে যোরায়েজ এবং মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর মতে, নৌকায় মাত্র ৮ জন আরোহন করেছিলেন। হযরত নূহ (আঃ), তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর তিন পুত্র "সাম", "হাম", "ইয়াফেস" এবং তাঁদের স্ত্রীগণ।

---

[১]। এই লেখক কুফা শহরের ঐ তন্নুরটি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, এখনও তা থেকে সামান্য পানি নির্গত হতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে তা সংরক্ষিত রয়েছে।

আ'মাশ বলেছেনঃ নৌকায় মাত্র ৭ জন আরোহন করেছিলেন, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর তিন পুত্র এবং তাঁদের স্ত্রীগণ। এবনে এসহাক (রঃ) বলেছেনঃ নৌকায় আরোহনকারীদের সংখ্যা ছিল দশ জন। নূহ (আঃ), তাঁর তিন পুত্র এবং এতদ্ব্যতীত আরও ৬ জন মোমেন এবং তাঁদের স্ত্রীগণ, অর্থাৎ ১০ জন পুরুষ ১০ জন স্ত্রীলোক।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, নৌকায় আরোহীদের সংখ্যা ছিল ৭৮ জন। তন্মধ্যে অর্ধেক ছিল পুরুষ আর অর্ধেক ছিল নারী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নৌকায় আরোহীদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। হযরত নূহ (আঃ)-এর ভাষা ছিল আরবী।

হযরত নূহ (আঃ) সর্বপ্রথম একটা পিপীলিকাকে এবং সর্বশেষে একটি গাধাকে নৌকায় তুলে নিয়েছেন। যখন গাধাটি আরোহন করছিল তখন ইবলিস শয়তান তার লেজ ধরে রাখে, এজন্য সে পা তুলতে পারছিলনা, হযরত নূহ (আঃ) তখন বলেছিলেনঃ তুমি উঠে আস, তোমার সঙ্গে শয়তান থাকলেও, বাক্যটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু একথা শ্রবণ করা মাত্র গাধার লেজ ছেড়ে দিয়েছে, তখন গাধা এবং ইবলিস শয়তান উভয়েই নৌকায় প্রবেশ করেছে। হযরত নূহ (আঃ) শয়তানকে দেখে বললেনঃ হে আল্লাহর দুশমন! তোকে প্রবেশ করতে দিল কে?

শয়তান বললোঃ আপনিইতো গাধাকে বলেছিলেনঃ ভেতরে আয়, যদি তোর সঙ্গে শয়তান থাকে তবুও।

বর্ণিত আছে সাপ এবং বিচ্ছু এসে হযরত নূহ (আঃ)-এর খেদমতে আরজ করলো, আমাদেরকেও নৌকায় তুলে নিন। তিনি বললেনঃ তোমরা কষ্টদায়ক, তোমরা অন্যের বিপদের কারণ হও, অতএব তোমাদেরকে নেয়া যাবেনা। তারা বললোঃ আপনি আমাদেরকে নৌকায় আরোহনের সুযোগ দিন, যে আপনার নাম উল্লেখ করবে, আমরা তার ক্ষতি করবো না, তাই যে সাপ বিচ্ছুর ভয়ে পাঠ করে এ আয়াত–

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

সাপ-বিচ্ছু তাকে কষ্ট দেয় না।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا

হযরত নূহ (আঃ) বললেনঃ তোমরা নৌকায় আরোহন কর এবং এই দোয়া পাঠ করতে থাকঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا

"আল্লাহ পাকের নামেই তা চলবে এবং থামবে"।

اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয়, অতীব দয়াময়"।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন কাজ শুরু করার সময় মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নাম নিয়ে শুরু করা। আল্লাহর জিকর করা, আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামের বরকতে যেন ঐ কাজ সুসম্পন্ন হয় এবং যে কাজ করে তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বর্ণিত আছে যে, নৌকায় আরোহনের পর হযরত নূহ (আঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন যে, নৌকা এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কারণ বা উপকরণ নয়; বরং শুধু আল্লাহ্ পাকের দানে ধন্য হয়েই আমরা এই মহা বিপদ থেকে নাজাত লাভ করতে পারি। কেননা নৌকা আল্লাহ্ পাকের হুকুমেই চলে এবং তাঁর হুকুমেই থামে। অতএব, তোমরা নৌকার দিকে নয়; বরং আল্লাহ্ পাকের দানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং আল্লাহ্ পাকের জিকরে মনোনিবেশ কর। আল্লাহ্ পাকের দয়া ব্যতীত এ ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। বর্ণিত আছে যে, নৌকায় আরোহনের সময় হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্ পাকের জিকরে মশগুল ছিলেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) যখন ইচ্ছা করলেন নৌকা চলুক, তিনি বললেনঃ "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহ্ পাকের নামে) তখন নৌকা চলতে লাগলো, যখন তিনি ইচ্ছা করলেন যে নৌকা এখন তীরে ভীড়বে, তখন তিনি বললেন "বিসমিল্লাহ", আল্লাহর নামে নৌকা তীরে ভিড়বে। তখন সঙ্গে সঙ্গে নৌকা থেমে গেল।[১]

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাকের আদেশ ছিল যখন নৌকা থেমে যায় তখন এই দোয়া পাঠ করবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের জন্যে, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায় থেকে নাজাত দিয়েছেন"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, এজন্যেই মুস্তাহাব হল সব কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।

اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয় এবং অতীব দয়াময়) একথাটি এজন্যে সংযোজিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এর পাশাপাশি মোমেনদের প্রতি রহমত এবং দয়ার ঘোষণা রয়েছে যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

"(হে রসূল!) আমার বন্দাদের এই খবর দিন নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয় এবং আমার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন"। এমনিভাবে আরো বহু আয়াতে রহমত এবং শাস্তির কথা একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৮-৪৯

وَهِيَ تَجْرِيْ
بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قف وَنَادٰى نُوْحُ ۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ
مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِيْۤ
اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ط قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ
اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ج وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾
وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ
اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৪২) নৌকাটি পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গমালায় তাদেরকে নিয়ে এগিয়ে চলল। নূহ তাঁর পুত্রকে ডাকলেন, সে তাদের থেকে পৃথক ছিল। তিনি তাকে বললেনঃ হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহন কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হয়োনা।

(৪৩) সে বললো, আমি এমন কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। নূহ বললেনঃ আজকের দিনে আল্লাহর আদেশ থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহ পাক যাকে দয়া করবেন সে-ই রক্ষা পাবে। এরপর তরঙ্গ এসে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

(৪৪) এরপর আদেশ হলো, হে পৃথিবী! তোমার পানি তুমি গ্রাস করে লও এবং হে আকাশ! তুমি থেমে যাও। এরপর বন্যা প্রশমিত হলো, কাজ শেষ হয়ে গেল, নৌকা জুদী পর্বতে এসে থেমে গেল। আর হুকুম হলো অত্যাচারী জাতি ধ্বংস হোক।

(৪৫) এবং নূহ তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিয়ে আরজ করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা সত্য, আর আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাকের নামের বরকতে ঐতিহাসিক নৌকাটি চলতে লাগলো। পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গমালা কেটে শুরু হলো তার অভিযান। তখন হযরত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্র কেনানকে ডাকলেন, সে কাফের ছিল, তাকে হযরত নূহ (আঃ) এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান

আনয়নের এবং তাঁর সাথে নৌকায় আরোহনের আহ্বান করলেন, যাতে করে এ প্রলয়ংকরী প্লাবনের ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু হতভাগা কেনান বললো, নৌকায় আরোহনের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় উঠে আত্মরক্ষা করবো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ

আর নূহ তাঁর পুত্রকে ডাকলেন, সে ছিল তাঁর নিকট থেকে পৃথক। অথবা তাঁর দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন।

يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ

নূহ (আঃ) বলেছিলেনঃ হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহন কর। কাফেরদের সঙ্গী হয়োনা। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন এবং আমাদের সঙ্গী হও। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তার নাম ছিল কেনান। অথবা ওবায়েদ এবনে ওমায়ের (রঃ)-এর মতে, তার নাম ছিল ইয়াম। কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর আহ্বানে সে সাড়া দিল না।

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ

সে বললো, আমি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। তার জবাবে-

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ

হযরত নূহ (আঃ) বললেনঃ বৎস! তুমি ভুল করছো, আজ আল্লাহর আযাব থেকে পৃথিবীর কোন শক্তিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। পাহাড়-পর্বত কোনভাবেই তোমার জন্যে উপকারী হবে না। এটি সাধারণ বন্যা নয়, এটি হলো আল্লাহর আযাবের প্লাবন। শুধু আল্লাহ পাক দয়া করে যাকে রক্ষা করেন সে-ই আজ রক্ষা পাবে। আর দয়া পাওয়ার পন্থা হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং ঈমানদারদের সংসর্গ গ্রহণ। আর যখন অবাধ্য কাফেরদের উপর আযাব শুরু হয়ে যায়, এমন ভয়াবহ মুহূর্তে দয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। পিতা পুত্রের মধ্যে এসব কথা-বার্তা চলছিল, ঠিক এমন সময় পুত্রের জন্যে ধ্বংস নেমে আসলো।

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ

তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গের প্রাচীর দাড়িয়ে গেল। ফলে পুত্র নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং ধ্বংস হলো, ক্ষণিকের মধ্যেই হতভাগা পুত্র পিতার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর গজবের এই পানি পাহাড়ের উঁচু চূড়ারও ৪০ হাত বা ১৫ হাত উপরে উঠেছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর সবই ডুবে গেল তখন এক মাতা তার শিশুকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলো। পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌঁছে দেখলো পানিও সেখানে পৌঁছে গেছে। এরপর ঐ মাতা শিশুটিকে নিয়ে উঁচু পাহাড়ের দু' তৃতীয়াংশ অতিক্রম করলো। কিন্তু পানি সেখানেও পৌঁছে গেল। এরপর স্ত্রীলোকটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন করলো। কিন্তু পানি সেখানেও পৌঁছে গেল। এরপর ঐ মাতা শিশুটিকে দু' হাত তুলে উপরে তুলে রাখলো। কিন্তু আর কতক্ষণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তরঙ্গ এসে মা এবং শিশুকে চির দিনের জন্য ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যদি আল্লাহ পাক সেদিন কারো প্রতি দয়া করতেন তবে ঐ মায়ের উপর অবশ্যই দয়া করতেন।[১]

বর্ণিত আছে, দিনের পর দিন একাধারে মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকে। মনে হয় আল্লাহ পাক যেন আকাশের মুখ খুলে দিয়েছেন। এভাবে অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকে শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবীর বুকও যেন ফেটে গেছে। জমিনের অভ্যন্তর থেকে পানি নির্গত হচ্ছে অহরহ। বৃক্ষ, তরু-লতা, পাহাড়-পর্বত, বাড়ী-ঘর সবই পানিতে তলিয়ে গিয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা ব্যতীত আত্মরক্ষার কোন স্থানই ছিলনা। হযরত নূহ (আঃ)-এর বদদোয়া এভাবে কবুল হয়েছিল। তিনি এ বদদোয়া করেছিলেন–

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে পরওয়ারদেগার! পৃথিবীতে একজন কাফেরও বাকী রেখোনা"। এমনিভাবে নূহ (আঃ)-এর যুগে আযাব সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। এরপর আল্লাহ পাক এভাবে আদেশ দান করেন,

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ

আর হুকুম হয় হে পৃথিবী! তোমার পানি গ্রাস করে ফেল এবং হে আকাশ! তুমি থেমে যাও। পানি শুকিয়ে দেয়া হয়। নৌকা জুদী পর্বতে এসে থেমে যায়।

وَقُضِيَ الْأَمْرُ

আর কাজ শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে ধ্বংস করার এবং মোমেনদেরকে রক্ষা করার যে ওয়াদা করেছিলেন তা এভাবে পুরো হয়।[২]

এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের এ প্লাবন তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বত্র হয়েছিলো? অথবা বিশেষ কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ মত পোষণ করেন যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী এসেছিল এ প্লাবন। এমন অবস্থায় সমগ্র মানব জাতি হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র শাম, হাম এবং ইয়াফিস এর বংশধর বলে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-১৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০-৫১

দায়েরাতুল মাআরেফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানীও এ মতই পোষণ করেন।

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ

"নৌকাটি জুদী পাহাড়ের পাদদেশে এসে থেমে যায়"।[১]

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, মহা প্লাবনে সমস্ত পাহাড়ই ডুবে যায়। কিন্তু এ পাহাড়টি তার বিনয়ের কারণে রক্ষা পায়। এখানে এসেই নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি নোঙ্গর ফেলে। প্রায় এক মাস যাবত নৌকাটি সেখানেই ছিল। আরোহীদের মধ্যে একে একে সকলেই তীরে অবতরণ করে। পৃথিবীর বহু জাতি এ ঐতিহাসিক নৌকাটি দেখে কেননা, এর মধ্যে ছিল বিশ্ববাসীর জন্যে বিরাট শিক্ষণীয় বিষয়।

জুদী পাহাড়টি কোথায়?

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন, জুদী পাহাড়টি মোসেল এলাকায় রয়েছে। মোসেল আধুনিক ইরাকের অর্ন্তগত একটি প্রদেশ।

উল্লেখ্য, এই প্রদেশের নাইনুয়া শহরেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাজার রয়েছে। যেখানে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে মাছ তাঁকে ফেলে দিয়েছিল। আর এই বিশেষ এলাকাতেই হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি আল্লাহ পাকের হুকুমে থেমে যায়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তুর পাহাড়কে জুদী বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ নৌকাতে ৮০ জন লোক ছিলেন। একশ' পঞ্চাশ দিন তারা নৌকায় ছিলেন। আল্লাহ পাক নৌকাটির মুখ মক্কা শরীফের দিকে করে দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক বন্যার সময় কা'বা শরীফকে পানির উপরে তুলে রেখেছিলেন। নৌকাটি চল্লিশ দিন যাবত বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে রত ছিল। এরপর আল্লাহ পাক জুদী পাহাড়ের দিকে তাকে প্রেরণ করেন।

হযরত নূহ (আঃ) জুদী পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেন, এই ৮০ জন মানুষকে নিয়ে সেখানে একটি বসতি গড়ে ওঠে যাকে "সামানিন" (৮০) বলা হয়।

একদিন সকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেকের ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। ৮০ জন লোক ৮০টি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ভাষা ছিল আরবী। বাস্তব অবস্থা ছিল এই, কেউ একে অন্যের কথা বুঝতে সক্ষম হচ্ছিলো না। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে সকলের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন তখন সকলের অনুবাদক। তিনি পরস্পরকে তাদের কথা বুঝিয়ে দিতেন।

কা'বে আহবার বর্ণনা করেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে চলাফেরা করে, এরপর জুদী পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে থেমে যায়।

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৯৩

নৌকায় অবস্থান কাল

হযরত কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেন, রজব মাসের দশ তারিখ মুসলমানগণ এই ঐতিহাসিক নৌকায় আরোহন করেন। তারা পাঁচ মাস যাবত তাতে অবস্থান করেন। এরপর জুদী পাহাড়ের নিকট নৌকাটি তাদের নিয়ে একমাস যাবত থেমে থাকে। মহররমের দশ তারিখ তথা আশুরার দিন তারা সকলে তীরে অবতরণ করেন। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, তারা সেদিন সকলেই রোজা রেখেছিলেন।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কয়েকজন ইহুদীকে আশুরার দিন রোজা পালনরত অবস্থায় দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, এই দিনই হযরত মূসা (আঃ) এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ পাক (লোহিত সাগর) পার করে দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছিলেন। আর এই দিনই নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি জুদী পাহাড়ের পাদদেশে এসে থেমে ছিল। এজন্যে উভয় পয়গম্বর আল্লাহ পাকের শোকর আদায়ের নিমিত্তে আশুরার দিন রোজা রেখেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ মূসা (আঃ)-এর এই নেক আমল করার আমরা অধিকতর হকদার, আর এ দিন রোজা রাখার আমরা অধিকতর যোগ্য। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোজা রাখলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে আজ যে রোজা রেখেছ, সে যেন রোজা পুরা করে। আর যে নাস্তা করে ফেলেছে সে যেন অবশিষ্ট দিন কিছু না খায়।

وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

"আর হুকুম হয় দূরাত্মা জালেম সম্প্রদায় নিপাত যাক"।

আল্লাহ পাকের এ হুকুমের কারণেই হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। যারা ঈমান এনেছিল শুধু তারাই বেঁচে গেল।[১]

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ

নূহ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের দরবারে আরজী পেশ করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্রতো আমার পরিবারভুক্ত। আর আপনার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য, যার বরখেলাফ হওয়া সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। এজন্যে আমার পুত্রকে রক্ষা করুন।

এখানে প্রশ্ন হল, হযরত নূহ (আঃ) এ আরজী কখন পেশ করেছিলেন? যদি তাঁর পুত্রের নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই দোয়া করে থাকেন তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান নিমজ্জিত হওয়ার পর এ দোয়া করে থাকেন তবে এর ব্যাখ্যা করা হবে এভাবে, হে পরওয়ারদেগার! আপনার কোন কাজই অকারণে হয়না তবে আমার পুত্র কেনানের নিমজ্জিত হওয়ার কারণ এবং রহস্য জানতে পারলে আমার মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-১৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫২

প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত নূহ (আঃ) যখন জানেন যে তাঁর পুত্র কাফের এমন অবস্থায় তিনি কিভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে তার সম্পর্কে আরজী পেশ করলেন? ইমাম রাজী (রহঃ) এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেনঃ

১. হযরত নূহ (আঃ) মনে করতেন যে, কেনান মোমেন কেননা, সে তাঁর নিকট ঈমানের কথা প্রকাশ করতো, যদিও সে তার পিতার সাথে মুনাফেকী করতো।

২. হযরত নূহ (আঃ) জানতেন যে, সে কাফের। কিন্তু তিনি ধারণা করেছেন ভয়ংকর প্লাবন দেখে সে হয়তো ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং ঈমান আনবে। এজন্যে তিনি তাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়ে বলেছেন–

وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ

(তুমি কাফেরদের সঙ্গী হয়োনা; বরং কুফরী ও নাফরমানী বর্জন করে ঈমান আন এবং আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ কর) আপতিত আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার এটিই একমাত্র পন্থা।

৩. পুত্রের প্রতি পিতার যে মমত্ববোধ থাকে তারই কারণে হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার বিপদগ্রস্ত পুত্রের জন্যে বিনীত আরজী পেশ করেছেন কেননা, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাকে নাজাত দিতে পারেন।[১]

وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ

হে পরওয়ারদেগার! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হাকেম, তোমার চেয়ে বড় কোন হাকেম নেই। কেননা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, তোমার হুকুমের বরখেলাফ কিছুই হতে পারেনা, তুমি আমার অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করেছ, তুমি আমার পরিবার-পরিজনকে নাজাত দেয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছো, তাই তুমি তাদেরকে নাজাত দিয়েছো। হে সর্বশ্রেষ্ঠ হাকেম! তোমার হুকুমই যে সর্বত্র কার্যকর। তোমার কুদরত অনন্ত অসীম। তোমার ক্ষমতা অদ্বিতীয়, তুমি ইচ্ছা করলে তাকে এখনও ঈমানের তৌফিক দিয়ে রক্ষা করতে পার। তোমার শান বিস্ময়কর, তোমার ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর। তফসীরকারগণ বলেছেন যে হযরত নূহ (আঃ)-এই দোয়া তখন করেছেন, যখন তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, কেনান অবিলম্বে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-২৩১

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا
تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ
الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ
بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾
قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ
مِّمَّنْ مَّعَكَ ۭ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾
تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۭ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৪৬) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, নিশ্চয় তার কাজ অত্যন্ত মন্দ, অতএব যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে আমাকে অনুরোধ করোনা। আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করি তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

(৪৭) নূহ বলেন, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যেন আপনাকে আমি অনুরোধ না করি এজন্যে আমি আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করি, যদি আমাকে আপনি ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।

(৪৮) হুকুম হলো, হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা এবং তোমার ও তোমার সঙ্গীদের উপর বরকত সহ অবতরণ কর। আর অন্যান্য সম্প্রদায় যারা রয়েছে তাদেরকেও আমি উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেব। এরপর তাদের উপর আমার মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে।

(৪৯) (হে রসূল!) এসব হলো অদৃশ্য লোকের খবর যা ওহী দ্বারা আমি আপনাকে অবহিত করছি, যা ইতিপূর্বে আপনি জানতেন না এবং আপনার জাতিও ইতিপূর্বে এর খবর রাখতো না। অতএব, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় যারা পরহেযগার, শুভ পরিণতি শুধু তাদেরই জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়ার উল্লেখ ছিল। তিনি তাঁর পুত্র কেনানকে মহা প্লাবন থেকে রক্ষা করার আরজী পেশ করেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর আরজীর জবাব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ পাক পরিস্কার ভাষায় নূহ (আঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছেনঃ

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

কেনান তোমার পরিবারভুক্ত নয়, যাদের রক্ষার ওয়াদা আমি করেছি সে তাদের মধ্যে নয়, তার কাজ মন্দ, তার চরিত্র অসৎ, তার কুফরী ও নাফরমানী সম্পর্কে তুমি অবগত নও।

অতএব, যে বিষয় সম্পর্কে তুমি জাননা সে বিষয়ে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কথা বলোনা।

উল্লেখ্য, হযরত নূহ (আঃ) যদি কেনানকে মোমেন মনে করে আবেদন করে থাকেন তবে আয়াতের এ ব্যাখ্যা হবে। পক্ষান্তরে যদি হযরত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্র কেনানকে কাফের মনে করা সত্ত্বেও এই আরজী পেশ করে থাকেন তবে এর অর্থ হবে এমন-যেহেতু যারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে সে মোমেনদের থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর পরিবারবর্গের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই তিনি ধারণা করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের রক্ষার ব্যাপারে ঈমান পূর্ব শর্ত নয়। ঈমান না থাকলেও নবীর পরিবার-পরিজন হিসেবেই আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে। পুত্রের স্নেহে কাতর পিতা হিসেবেই হযরত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রের জন্যে এ আরজী পেশ করেছিলেন। তাঁর আরজীর জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নূহ! তোমার এ ধারণাই ভুল যে, কেনান তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লোক। কেননা বংশীয় সম্পর্ক নয়, বরং ঈমানের সম্পর্কই হলো এখানে মূল কথা, কিন্তু কেনানের কুফরী ও নাফরমানী সে সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেলেছে। যদি কেনানের ঈমান থাকতো, তবে বংশীয় সম্পর্ক সম্পূর্ণ তার জন্যে বিশেষভাবে উপকারী হতো। কিন্তু ভাগ্যাহত কেনান তার কুফরী ও নাফরমানীর কারণে ঐ সম্পর্ক বিনষ্ট করে দিয়েছে, এ বিষয়ে তুমি যখন জাননা, তাই এমন বিষয়ে কোন প্রকার আরজী পেশ করা তোমার পক্ষে শোভনীয় নয়।

يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

"হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়"। অথচ হযরত নূহ (আঃ) তাকে তাঁর পুত্র বলে এ আরজী পেশ করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির দু'টি ব্যাখ্যা করেছেনঃ

(১) সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়–একথার তাৎপর্য হলঃ

ليس من اهل دينك

সে তোমার দ্বীনের অনুসারী নয়।

(২) انه ليس من اهلك الذين وعدتك ان انجيهم معك

অর্থাৎ সে তোমার পরিবারের সে সব লোকদের মধ্যে নয়, যাদেরকে নাজাত দেয়ার ওয়াদা আমি করেছি। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বংশের ভিত্তিতে নয়; বরং ঈমানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

নিশ্চয় তোমার ছেলে মন্দ কাজ করেছে, সে শেরক করেছে, আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

আর তুমি নিজেই ইতিপূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছ এবং তাদের শাস্তি বিধানের আরজী পেশ করেছ, অতএব কেনানের জন্যে দোয়া করা তোমার পক্ষে শোভনীয় নয়। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

"তুমি এমন বিষয়ে আরজী পেশ করোনা যে বিষয়ের সঠিক জ্ঞান তোমার নেই"। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ

"নিশ্চয় আমি তোমাকে নছিহত করি যেন তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হও"।[১]

শেখ আবু মনসুর (রঃ) বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর কেনান নামের এ পুত্রটি মুনাফেক ছিল। প্রকাশ্যে মোমেন অন্তরে কাফের ছিল। আর হযরত নূহ (আঃ) তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে তাকে রক্ষা করার জন্যে আরজী পেশ করেছেন।[২]

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, নবীর পরিবারভুক্ত তারাই, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর অনুসারী হয়। এ পর্যায়ে বংশীয় সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই; গুরুত্ব হল ঈমানী সম্পর্কের।

ইমাম আবু মনসুর মাতুরেদী বলেছেন, কেনান যে প্রকৃত অবস্থায় কাফের একথা হযরত নূহ (আঃ) জানতেন না। আর না জানার কারণেই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছেন।[৩]

ইমাম কুরতবী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

لانه كان عنده مؤمنا فى ولم يك نوح يقول رب ان ابنى من اهلى

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২-৩

[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৩

[৩]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫৫

হযরত নূহ (আঃ)-এর ধারণা ছিল তাঁর পুত্র মোমেন, যদি তা না হত তাহলে তিনি একথা বলতেন না, যে "হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার ছেলে আমারই পরিবারভুক্ত"।

وكان ابنه يسر الكفر ويظهر الايمان

আর তাঁর এই পুত্র কুফরীকে গোপন রাখত, ঈমানকে প্রকাশ করত। তাই আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর পুত্রের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম কুরতবী (রঃ) একথাও লিখেছেন, কাফেরদের ধ্বংসের জন্যে যিনি বদদোয়া করেছেন, পুনরায় তিনি কোন কাফেরকে নাজাত দেয়ার জন্যে দোয়া করবেন কোন নবীর পক্ষে এমন কাজ সম্ভব নয়।[১]

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦ عِلْمٌ

আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে আরজী পেশ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি যা জানিনা, এমন বিষয় সম্পর্কে (ভবিষ্যতে) আরজী পেশ করা থেকে আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি। যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এটি আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা সর্বদা এবং সর্ববিষয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করতেন এবং সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্যেও আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর দোয়ায় এ দাবী করেননি যে, ভবিষ্যতে এমন কাজ আমি করবনা; বরং তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করেছেন যেন ভবিষ্যতে এমন কাজ তাঁর দ্বারা না হয়। এরই নাম আদব। কেননা, ভবিষ্যতে এমন কাজ করব না বলে সংকল্প প্রকাশের মধ্যেও প্রকারান্তরে নিজের কিছু ক্ষমতার দাবী নিহিত থাকে যা আল্লাহ পাকের মহান দরবারের শানের খেলাফ।

বস্তুতঃ আল্লাহর প্রিয়জনদের দোয়ার মধ্যেও মানব জাতির জন্যে রয়েছে মহান শিক্ষা। এতে একথাও বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের সতর্কবাণী শ্রবণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আরজী পেশ করেছেন যে, ভবিষ্যতে যেন এমন ভুল আমার দ্বারা না হয় তার জন্যে আমাকে তৌফিক দিও। হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত ইউনুস (আঃ)-ও আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করেছেন। পবিত্র কোরআনে তাঁদের তওবার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতেও এমনি আদব রক্ষা করার প্রমাণ বিদ্যমান।[২]

قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا

[১]। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৫
[২]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৯৪

হুকুম হলো হে নূহ! আমার তরফ থেকে নিরাপত্তা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের জন্যে, তোমরা বরকত সহকারে অবতরণ কর।

যখন নৌকা জুদী পাহাড়ের পাদদেশে থেমে গেল এবং পানিও সরে গেলো তখন আদেশ হল–

يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا

হে নূহ! এখন নৌকা থেকে অবতরণ কর, আমার তরফ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বরকত রয়েছে তোমাদের জন্যে।

মূলতঃ এক প্রলয়ংকরী প্লাবনের পর পৃথিবীর যে অবস্থা হয়েছে তা সত্যিই অকল্পনীয়। পূর্বের পৃথিবীটি যেন বদলে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এত বড় মহা ধ্বংসের পর কিভাবে হবে পৃথিবীতে মানুষের পুনর্বাসন। এ প্রশ্নটিই ছিল হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের দুশ্চিন্তার কারণ। তাই আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর দুশ্চিন্তা দুরীভূত করে এরশাদ করেছেনঃ হে নূহ! নৌকা থেকে নিরাপদে অবতরণ কর, পৃথিবীকে পুনরায় আবাদ করা হবে। তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা লাভ করবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বরকত এবং দয়ামায়া। হে নূহ! তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের বংশধরদের জন্যেও শান্তি, নিরাপত্তা এবং বরকতের সুসংবাদ লাভ কর। অর্থাৎ যারা ঈমানদার হবে তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সার্বিক কল্যাণ লাভ করবে।

وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ

ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে এমন লোকও আসবে যারা ঈমান আনবেনা। তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, আমি তাদেরকে এই পার্থিব জীবনে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করবো, এই সুযোগ তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আখেরাতে তারা দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। কেননা আখেরাতে কেবল ঈমান এবং নেক আমলের শুভ পরিণতিই লাভ হবে। সেখানে বংশীয় সম্পর্ক কোন কাজে আসবেনা। কেনান ঈমান এবং নেক আমলের অভাবে নবীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও নিমজ্জিত হয়েছে। অতএব, মক্কার কোরায়শদের মধ্যে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধী ছিল, যারা ইসলামের অগ্র যাত্রাকে সর্ব প্রকার বাধা দিচ্ছিল, তাদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ সতর্কবাণী।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে দু'টি ওয়াদা করেছিলেনঃ

(১) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা।

(২) বরকত প্রদানের এবং যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজনের সুসংবাদ।

শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কারণ হলো এই, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রের ব্যাপারে যে আরজী পেশ করেছিলেন সেজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। যখন তাঁকে বলা হলো–

يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا

"হে নূহ! শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অবতরণ কর", তখন তাঁর মন শান্ত হলো। দ্বিতীয়তঃ মহা প্লাবনের পর পৃথিবীর যে দুরবস্থা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এমন অবস্থায় মানব জাতির পুনর্বাসন কিভাবে সম্ভব হবে তাও ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট দুশ্চিন্তার এক বিরাট কারণ। আল্লাহ পাকের মহান বাণীতে সে বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেয়া হয়েছে এবং প্রথমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা হয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, বরকত শব্দটির তাৎপর্য হলো এমন বস্তু যা আপনা আপনি বৃদ্ধি পায়, যাতে থাকে কল্যাণ, আর আলোচ্য আয়াতে "বরকত" শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্যের বিভিন্ন মর্তবা। তাঁর রহমত ও দান, বংশ বৃদ্ধি এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই বংশের স্থায়িত্ব, এই বংশ থেকে নবী ও ওলীগণের সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ

"আর আমি নূহ এর বংশধরদেরকে বাকী রেখেছি"। এ ঘোষণা দ্বারাও এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধররাই মহা প্লাবনের পর পৃথিবীতে আবাদ হয়। আর আজকের পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষ হযরত নূহ (আঃ)-এরই বংশধর।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে "বরকত" শব্দটির তাৎপর্য, যার ওয়াদা আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে করেছেন।[২]

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ

নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ

(হে রসূল!) এসব গায়বী খবর যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করছি, আপনি এ সম্পর্কে জানতেন না এবং আপনার জাতিও এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না অতএব, সবর অবলম্বন করুন। যারা মোত্তাকী পরহেযগার, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে নিশ্চয় শুভ পরিণতি তাদেরই জন্যে।

এ পর্যন্ত হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনায় দু'টি উপকার রয়েছে।

প্রথমতঃ যিনি উম্মী নবী, যিনি জীবনে কারো নিকট লেখাপড়া শেখেননি এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্বকালের ঘটনাবলীর প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহ পাকের সত্য নবী। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪৫
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৪
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৭

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ

(হে রসূল!) এসব গায়বী খবর আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করছি কেননা, আপনি আমার নবী। এসব খবর ইতিপূর্বে আপনিও জানতেন না এবং আপনার জাতিও এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর।

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, যেভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করার পর অবশেষে হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারাই সফলকাম হয়েছে, বিজয় মালা তাদেরই কণ্ঠে শোভা পেয়েছে, ঠিক এমনিভাবে অবশেষে হযরত নূহ (আঃ)-এর ন্যায় সাফল্য আপনার ও আপনার সঙ্গীদের পদচুম্বন করবে। (হে রসূল!) বর্তমান অবস্থা যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন আপনি সবর অবলম্বন করুন। আপনার এবং আপনার সাহাবাদের তথা সকল মোমেনের ভবিষ্যত নিঃসন্দেহে অতি উজ্জ্বল। যেভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর দুশমনদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, ঠিক তেমনি আপনার দুশমনদেরও ধ্বংস অনিবার্য। তাই বর্তমানে আপনাকে এবং আপনার সাহাবাদেরকে যে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার উপর সবর করুন কেননা, মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করে এবং আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে তাদের ভাগ্যই হয় সুপ্রসন্ন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর সঙ্গীদের সবরের সুফল তারা পেয়েছে, ঠিক তেমনি আপনার এবং আপনার সাহাবাদের সত্য-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিণাম অবশ্যই শুভ হবে।[১]

يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর তরী যখন জুদী পাহাড়ের পাদদেশে থেমে গেল তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো, "হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর মোমেন সাথীদের উপর এবং পৃথিবীতে যত লোক ঈমান আনবে সকলের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শান্তি বর্ষিত হবে এবং সকলকে বরকত দান করা হবে"। অতএব এ আয়াতের ঘোষণা চিরন্তন। কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলের জন্যে এতে শান্তি নিরাপত্তা এবং বরকতের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, যারা হবে অবাধ্য কাফের তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির ঘোষণা।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫৭

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ
بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

তরজমা

(৫০) আর আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করি, হুদ বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই, তোমরাতো শুধু মিথ্যা রটনাকারী।

(৫১) হে আমার জাতি! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক শুধু তাঁরই নিকট, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তবুও কি তোমরা সত্য অনুধাবন করবে না?

(৫২) হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, এরপর তার দিকে তোমরা মনোনিবেশ কর, তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তিনি তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা কিন্তু অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়োনা।

(৫৩) তারা বলল, তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পার নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই।

তফসীরুল কোরআন

হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে হযরত হুদ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আদ জাতির নিকট তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আদ জাতির পথভ্রষ্টতা এবং তাদের শাস্তির কথা এক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। আদ জাতি নূহ (আঃ)-এর জাতির মত শেরক এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল বলে তারা ছিল অহংকারী, আল্লাহর নবীগণ এবং তাদের অনুসারীগণকে তারা হেয় দৃষ্টিতে দেখতো এবং তাঁদের প্রতি বিদ্রুপ করতো। আদ জাতিকে আল্লাহ পাক দু'টি বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেনঃ

১. তারা ছিল শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী, ২.আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বচ্ছলতাও দান করেছিলেন। তারা ইয়ামনের অধিবাসী ছিল, এ এলাকাটি ছিল শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ, কৃষি ক্ষেত্রে তারা উন্নতি করেছিল। নিজেদের বাসস্থানের জন্যে সুউচ্চ এবং মজবুত ইমারত নির্মাণ করেছিল, যদিও তারা হযরত হুদ (আঃ)-এর নিকটাত্মীয় ছিল এবং হুদ (আঃ) তাদেরই ভাই ছিলেন। কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে আত্মীয়তার সম্পর্ক যেমন ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনানের ব্যাপারে কাজে লাগেনি, ঠিক তেমনি আদ জাতির ব্যাপারেও বংশসূত্র বা আত্মীয়তার বন্ধন তাদের জন্যে উপকারী হয়নি। এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

আর আমি আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করি, হুদ বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের আসনে অন্য কিছুকে আসীন করোনা। এর চেয়ে বড় অন্যায় অবিচার আর কিছুই হতে পারেনা। তোমরা পাথরের প্রতিমাকে দেবতা বানিয়ে যে শেরক করছো তা নির্জলা মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আদ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বর্তমান ইয়ামন এবং জর্দান এলাকায় আদ জাতি বাস করতো, ইয়ামনের হাজরামুত নামক শহরটি ছিল তখন তাদের রাজধানী। তদানীন্তনকালের বিখ্যাত জাতিগুলোর অন্যতম এ জাতির বংশ পরিচয় হলো এই, আদ এবনে উজ এবনে এরাম এবনে সাম এবনে নূহ। বংশীয় সূত্রে হযরত হুদ (আঃ) তাদের ভাই হতেন। তাই আল্লাহ পাক اخاهم هودا (তাদের ভাই হুদ) বলেছেন।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ

হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আমার জাতি! তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর, আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ব্যতীত তোমরা যা কিছু বল সবই তোমাদের মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরীক করোনা। তোমরা মনে কর তোমাদের বানানো মূর্তিগুলো আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছুই হতে পারে না। এটি তোমাদের নিজেদের বানানো কথা, এর মধ্যে সত্যের লেশ মাত্র নেই।

يٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

তোমাদেরকে যে হেদায়েত নসিহত আমি করছি তার জন্যে তোমাদের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক তাঁর নিকটই রয়েছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার প্রাপ্য যা কিছুই হোক না কেন তা আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। তিনিই দান করবেন আমাকে সবকিছু।

বস্তুতঃ প্রত্যেক পয়গম্বরই তাঁর জাতির কল্যাণ সাধনে নিঃস্বার্থভাবে অবদান রেখে গেছেন। অতএব, যারা পয়গম্বরের প্রকৃত অনুসারী তাদের কর্তব্য হলো এই মহান আদর্শের অনুসরণ করা, এতেই নিহিত রয়েছে সমগ্র জাতির কল্যাণ।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি এ সত্য উপলব্ধি করনা? যে এমন ব্যক্তি যার অর্থ-সম্পদের প্রতি কোন লোভ-লালসা নেই, তাঁর কথা অসত্য হতে পারেনা, তাঁর কথা মেনে নেয়া তোমাদের কর্তব্য। অথবা এর অর্থ হলো এই যে, তোমাদের এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি নেই যার দ্বারা তোমরা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পার। তোমরা কি এতই নির্বোধ যে, তোমাদের নিকট যার কোন স্বার্থ নেই, যিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তোমাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন, যিনি তোমাদের কল্যাণকামী, যিনি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমাদের উপকার করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট, তোমরা তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসকে অস্বীকার করছো, একান্ত আপনজনকে পর ভাবছ। এমনকি তাঁকে শত্রু মনে করছ। এর চেয়ে বড় পরিতাপ এবং বিস্ময়কর বিষয় আর কি হতে পারে! অতএব, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা কুফরী ও নাফরমানী পরিহার কর, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি অনুগত্য প্রকাশ কর।

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

হে আমার জাতি! এখনও সময় আছে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। পূর্বেকৃত অন্যায় অনাচারের জন্যে তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার কর, শেরক বর্জন কর, তৌহিদের উপর খাঁটি ঈমান আন, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর।

বর্ণিত আছে, যখন আদ জাতি হযরত হুদ (আঃ)-এর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের উপর নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। তিন বছরের জন্যে আল্লাহ পাক তাদের জন্যে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং তাদের মহিলাদেরকে বন্ধ্যা করে দেন। এজন্যে কারো বাড়ীতেই কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করতো না। এমনি করুণ পরিস্থিতিতে হযরত হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের এ দুর্গতি কখনও দূর হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে খাঁটি তওবা না করবে। অতএব, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ

যদি তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার কর, আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর, তবে তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা নাযিল করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন, খবরদার! তোমরা কিন্তু অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থেকো না। আমি যে সত্যের প্রতি

তোমাদেরকে আহ্বান করেছি, সে সত্য গ্রহণে বিমুখ হয়োনা। যদি তোমরা আমার উপদেশ মেনে চল তবে তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে। আল্লাহ্ পাকের দানে তোমরা ধন্য হবে, অর্থ-সম্পদে তোমরা হবে সমৃদ্ধ, তোমাদের ধনবলে জনবলে বরকত হবে। তোমরা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবে। তবে শর্ত হলো তোমাদেরকে অবশ্যই কৃত অন্যায় থেকে তওবা এস্তেগফার করে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা পূর্বে কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তওবা এস্তেগফার কর এবং ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি কারো মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যায় তবে আল্লাহ্ পাক তার জন্যে তার জীবিকা উপার্জন সহজ করে দেন এবং তার হেফাজত করেন। যদি তোমরা তা কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি বৃষ্টি নাযিল করবেন, তোমাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের শক্তিও বৃদ্ধি করে দেবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আল্লাহ্ পাক তার সকল কঠিন কাজ সহজ করে তাকে অভাব মুক্ত করেন, আর অকল্পনীয় স্থান থেকে তার রিয্ক পৌঁছান।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের قُوَّةً শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন শারীরিক শক্তি। আদ জাতি শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই এরশাদ হয়েছেঃ যদি তোমরা অতীতের কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা কর এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী বর্জন করলে এবং যত্ন সহকারে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করলে স্বাস্থ্য-সুখও লাভ করা যায়। এটি নেক আমলের অবশ্যম্ভাবী শুভ পরিণতি। যদিও নেক আমলের প্রকৃত প্রতিদান পাওয়া যাবে আখেরাতে, কিন্তু তবুও নেক আমলকারীর প্রতিদান দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং আরামের মাধ্যমেও আংশিকভাবে প্রদান করা হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আন এবং অতীতের পাপাচারের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, আর ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক হও তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের ধন-বল এবং জন-বল বৃদ্ধি করে দেবেন এবং দৈহিক শক্তিও বৃদ্ধি করে দেবেন কেননা, এসবই মানুষের শক্তি লাভের উপকরণ।[২]

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-২০
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১১

হযরত হুদ (আঃ)-এর জাতি ছিল সত্যিই হতভাগা কেননা, তাদের চরম বিপদের মুহূর্তেও তারা হযরত হুদ (আঃ)-এর দরদভরা আহ্বানে সাড়া দিতে রাজি হয়নি। তারা হযরত হুদ (আঃ)-কে বলেঃ হে হুদ! তুমি যে নবুওয়্যতের দাবী করেছ তার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ হাযির করোনি। যখন তুমি তোমার দাবীর স্বপক্ষে কোন দলিল-প্রমাণ পেশ করতে পারোনি তখন আমরাও তোমার কথা মানতে পারিনা। আর তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস করিনা, তোমার কথা মানিনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত হুদ (আঃ) তাঁর মোজেযা অবশ্যই পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের কথা ছিল তারা যে মোজেযার ফরমায়েশ করেছিল তা তারা দেখতে পায়নি।

মূলতঃ তাদের এ কথাটিও মিথ্যা, কেননা আল্লাহ্ পাক যখনই যে জাতির নিকট কোন নবীকে প্রেরণ করেছেন তখনই তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত দলিল প্রমাণও দিয়েছেন। কিন্তু কাউকে মোমেন হওয়ার জন্যে বাধ্য করা আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় নয়। এমন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাকের নীতি বিরোধী কাজ।[১]

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ
وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا
ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ
إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن
تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَ
لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
نَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭০
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৯৪

তরজমা

(৫৪) আমরা তো একথাই বলি যে, আমাদের কোন উপাস্য তোমার উপরে ভূত চাপিয়ে দিয়েছে শোচনীয়ভাবে। হুদ বলেনঃ আমি আল্লাহ পাককে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যে শেরক করছ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(৫৫) আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে কোন অবকাশই দিও না।

(৫৬) আমি এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করছি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক, পৃথিবীতে যা কিছু চরে বেড়ায় তাতে এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন।

(৫৭) তবুও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও তবে আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমার প্রতিপালক অন্য কোন লোকদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

(৫৮) এবং যখন আমার নির্দেশ আসল, তখন আমি আমার রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারদেরকে রক্ষা করলাম, আর আমি তাদেরকে এক ভীষণ আযাব থেকে রক্ষা করি।

তফসীরুল কোরআন

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং পাপাচার থেকে তওবা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হতভাগা আদ জাতি শুধু যে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি তা নয়; বরং তাঁর সম্পর্কে তারা অত্যন্ত আপত্তিকর উক্তি করে অমার্জনীয় অপরাধ করে। তারা বলেছে, হে হুদ! তুমি যে সব আজগুবী কথা বল তা আমরা কোন দিন শুনিনি। তুমি এসব কথা বলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করছো। তোমার এসব বাজে কথার কারণে একদিকে সমগ্র জাতি তোমার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে তুমি যেভাবে আমাদের ঠাকুর-দেবতার বিরুদ্ধে কথা বল হয়ত তারা অসন্তুষ্ট হয়ে তোমার উপর কোন অপদেবতাকে চাপিয়ে দিয়েছে, আর পরিণতিতে তোমার এ অবস্থা হয়েছে যে, তুমি অপ্রকৃতস্থ হয়েছ কেননা, কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এমন সব কথা বলতে পারেনা।

قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

হুদ (আঃ) তাদের এসব অন্যায় কথার উত্তরে বললেনঃ আমি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাককে সাক্ষী করে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, তোমরা যে সব মূর্তি বা ঠাকুর-দেবতার পূজা কর আমি তার উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট, আর মনে রেখো তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা নিজেরাই অসহায়, অক্ষম। কারো উপকার বা ক্ষতি করার কোন শক্তিই তাদের নেই। তাই আমাকে তাদের ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। তোমরাতো তাদের পূজারী, তাদের সেনাবাহিনী, তোমরা অনেক শক্তিশালীও অতএব,

فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ

আমি তোমাদেরকে এ আহ্বান জানাই তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, সম্মিলিতভাবে আমার ক্ষতি সাধনে সর্বাত্মক চেষ্টা কর, আমাকে কোন প্রকার অবকাশ দিওনা, তোমরা যৌথভাবে আমার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হও। দেখ আমার কোন ক্ষতি করতে পার কি-না। আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আমার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না কেননা, আমি ভরসা করি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি, ভূ-মন্ডল নভোমন্ডল এক কথায় সব কিছু যাঁর কতৃত্বাধীন, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কোন উপকার বা ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তাই এরশাদ হয়েছে–

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ

"নিশ্চয় আমি ভরসা করেছি এক আল্লাহ পাকের প্রতি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-এর এ চ্যালেঞ্জ ছিল একটি মোজেযা, যা পূর্ণ হয়েছে। আদ জাতি ছিল দুর্ধর্ষ, অত্যন্ত শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, জালেম এবং হযরত হুদ (আঃ)-এর রক্ত পিয়াসী। কিন্তু তারা তাঁর কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারেনি। হযরত হুদ (আঃ) ছিলেন ঈমানের বলে বলীয়ান। অত্যাচারী আদ জাতির শক্তি-সামর্থের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল না, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শক্তিতে ছিলেন শক্তিমান। আর এটিই হলো ঈমানী শক্তি–যার মোকাবেলা করা পৃথিবীর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়না। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ঈমানী শক্তির মোকাবেলা করা শক্তিধর ফেরাউনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অত্যাচারী রাজা নমরূদও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঈমানী শক্তির মোকাবেলা করতে পারেনি। এমনিভাবে মক্কার কাফেররা এবং মদীনা মোনাওয়্যারার মুনাফেক ও ইহুদীরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি।

مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই, যা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, সবই আল্লাহ পাকের হাতের মুঠোয়, পলায়নের সাধ্য কারোই নেই। একথা বলার কারণে হয়ত কারো মনে সন্দেহ হতে পারে যে, আল্লাহ পাক যখন সর্বশক্তিমান, হয়ত ইচ্ছা করলে তিনি কারো প্রতি জুলুমও করতে পারেন, কিন্তু এ অবস্থা আল্লাহ পাকের শানের খেলাফ। কারো মনে যেন এমন সন্দেহের সৃষ্টি না হয় তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল সঠিক পথে রয়েছেন। তাই তিনি কারো প্রতি অবিচার করেন না। মোমেনগণ তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাই তিনি তাদেরকে অপমানিত করেন না। যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা রাখে তাকে তিনি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সফলকাম করেন।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

এত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ধ্রুব সত্য শ্রবণ করার পরও যদি তোমরা তা অমান্য কর তবে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরা নিজেরা, আমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো তা আমি সঠিকভাবে পালন করেছি অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি। অতএব, আমি দায়মুক্ত। আল্লাহ পাক যে পয়গাম নিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু যদি তোমরা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর, আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য কর তবে তোমাদের ভয়াবহ পরিণামের জন্যে তোমরাই দায়ী থাকবে। তোমরা মনে রেখ, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

আল্লাহ পাক তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন। তোমাদেরকে বিদায় করার কারণে আল্লাহর দুনিয়া বিরাণ হবেনা। যাদেরকে তোমাদের স্থলে আনা হবে তারা তোমাদের মত অবাধ্য নাফরমান হবেনা, বরং আল্লাহ পাকের অনুগত এবং এবাদত গুজার হবে।

وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا

"আর তোমরা আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না"।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল, তোমাদের থাকা না থাকা আল্লাহ পাকের নিকট একই সমান। তাই তোমাদেরকে ধ্বংস করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি নেই।

إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সবকিছুর নেগাহবান। তোমরা যা কিছু করছো তার কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই। আর তোমাদের শাস্তি বিধানের ব্যাপারে তিনি গাফেল নন। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, সব কিছুই তাঁর নখ দর্পণে রয়েছে এবং সব কিছুই তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। অতএব, কোন কিছুই তাঁর ক্ষতি করতে পারেনা।

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا

অবাধ্য আদ জাতি ধ্বংস হলো

"আর যখন আমার আযাব এসে পড়লো তখন আমি হুদকে এবং তার সঙ্গী মোমেনদেরকে আমার রহমতে আযাব থেকে রক্ষা করি, আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করি"।

বর্ণিত আছে যে, দুর্ধর্ষ আদ জাতির উপর লাগাতার সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত প্রলয়ংকরী ঝড়-তুফান প্রবাহিত হতে থাকে।[১]

এই ঝড়-তুফানের কারণে আদ জাতির বাড়ী-ঘরগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, এমনকি বাড়ীর ছাদগুলো উড়ে যায়, বৃক্ষগুলো উপড় ফেলা হয়, শুধু তাই নয় এই কোপগ্রস্ত জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটি বিষাক্ত বাতাস প্রবাহিত হয় যা তাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতো এবং তলদেশ দিয়ে নির্গত হত। পরিণামে তাদের দেহগুলো কয়েক খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এভাবে অবাধ্য অহংকারী নাফরমান আদ জাতিকে তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করা হয়।[২]

نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

"আমার বিশেষ রহমতে হুদ এবং তার সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করেছি"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا শব্দটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে রক্ষা করেছেন। তাদের আমলের কারণে নয়, বরং তাঁর বিশেষ রহমতে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলাচ্য আয়াতে "রহমত" শব্দ দ্বারা ঈমান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আমি তাদেরকে ঈমান আনার তৌফিক দান করেছি। আর ঈমানের বরকতে মহা বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছি। বর্ণিত আছে হযরত হুদ (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার।[৩]

ইমাম রাজী (রহঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا শব্দটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা আছে।

১. আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে তাঁর বিশেষ রহমতে আদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। যদি কেউ ঈমান আনে ও সৎ কাজে সাধনা করে তবুও আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত নাজাত লাভ করা সম্ভব নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতেই মোমেনগণ প্রলয়ংকরী ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা পেয়েছে।

২. আলোচ্য আয়াতে রহমত শব্দটির ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমান ও আমলের জন্যে যে হেদায়েত দান করেছেন তার বরকতেই তিনি তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৪
[২]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৯৫
[৩]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৮

৩. যখন আদ জাতির প্রতি মহা আযাব আপতিত হয় তখন আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি দয়া করেছেন, কাফেরদের প্রতি যে আযাব আপতিত হয়েছে তা থেকে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে রক্ষা করেছেন। আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান (রঃ) এ মত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতেই মোমেনদেরকে সেই কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আর আবু হাইয়ান (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যে তাদেরকে ঈমানের তৌফিক দিয়েছেন তার বরকতেই রক্ষা করেছেন।[১]

وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ

"আমি তাদেরকে এক ভীষণ আযাব থেকে রক্ষা করি"।

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে নাজাতের যে কথা হয়েছে তার অর্থ হল দুনিয়ার আযাব থেকে রক্ষা করা। আর আলোচ্য আয়াতে নাজাতের যে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল মোমেনদেরকে কেয়ামতের দিনের আযাব থেকেও আল্লাহ পাক রক্ষা করবেন। অতএব, نَجَّيْنٰهُمْ এর অর্থ হল অর্থাৎ حَكَمْنَا لَهُمْ আমি আদেশ দিয়েছি যেন আখেরাতেও মোমেনদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করা হয়।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, عَذَابٍ غَلِيْظٍ এর দু' অর্থই হতে পারে অর্থাৎ যে বিষাক্ত বাতাস আদ জাতির কাফেরদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে দেহের নিম্নদেশ দিয়ে বের হয়েছে এবং তাদের শক্তিশালী দেহকে মুহূর্তের মধ্যে খন্ড বিখন্ড করেছে, সেই আযাব থেকে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে রক্ষা করেছেন। অথবা আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন যেন মোমেনদেরকে আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়।[২]

তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার আযাব হোক অথবা আখেরাতের কঠিন কঠোর শাস্তি হোক, ঈমান ব্যতীত কোনটি থেকেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত লাভের জন্যে ঈমান হল পূর্বশর্ত।[৩]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮৬
[২]। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬
[৩]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৬২

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ
أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن
نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৫৯) এইতো ছিল আদ জাতি, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছিলো এবং তাঁর রসূলগণকে অমান্য করেছিলো এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর হুকুম মেনে চলতো।

(৬০) এই পৃথিবীতে তাদেরকে করা হয়েছিল লা'নতগ্রস্ত আর কেয়ামতের দিনও তারা হবে অভিশপ্ত। জেনে রাখ! নিশ্চয় আদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! হুদের জাতি আদের প্রতি আল্লাহর লা'নত রয়েছে।

(৬১) আর সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সালেহ বলে হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক নেই, তিনিই তোমাদেরকে ধরাধামে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তিনিই তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। অতএব, তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি নিকটে আছেন, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেন।

(৬২) তারা বললো, হে সালেহ! এর পূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল, আমাদের পিতৃ পুরুষরা যার পূজা করতো তুমি কি আমাদেরকে তার পূজায় নিষেধ করছো? যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে আহ্বান কর, আমরা অবশ্যই সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতকে সম্বোধন করে এরশাদ করা হয়েছে যে, এ ছিল আদ জাতির শোচনীয় পরিণতি, আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করা, আল্লাহর দ্বীনকে অবিশ্বাস করা এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকা– এসবই ছিল আদ জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অতএব, হে উম্মতে মোহাম্মদীয়া! তাদের ধ্বংসলীলার ইতিহাস এবং তাদের নিদর্শনগুলোর প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর এবং তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর। সাবধান হও, নিজেদের অবস্থার মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের চিন্তা কর।

আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

(১) جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

আদ জাতি আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে।

(২) وَعَصَوْا رُسُلَهٗ

তারা আল্লাহর রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। যদিও আদ জাতি শুধু হযরত হুদ (আঃ)-কে অস্বীকার করেছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে رُسُلَهٗ বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন একজন রসূলকে অস্বীকার করার অর্থ সকল রসূলকে অস্বীকার করা। কেননা সকল রসূলের শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং আদর্শ একই, অতএব, যারা একজন রসূলকে অস্বীকার করলো তারা যেন সকল রসূলকে অস্বীকার করলো। এ আয়াতে পবিত্র কোরআন ইসলামের এ মূল নীতি পুনরায় ঘোষণা করেছে যা সূরায়ে বাকারার একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

"আমরা আল্লাহ পাকের কোন রসূলের মধ্যে পার্থক্য করি না"।

(৩) وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

আর তারা এমন লোকদের কথা মেনে চলে যারা ছিল জালেম, যারা ছিল সত্যের দুশমন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা আদ জাতির পথভ্রষ্ট, অহংকারী তথাকথিত নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নের স্থলে তাঁদের বিরোধিতা

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৫

করেছে। আর যে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তারা চিরশান্তি, চিরমুক্তি লাভ করতো সে শিক্ষাকে তারা বর্জন করেছে। আর এমন জালেম, সত্য-বিরোধী লোকদের অনুসরণ করেছে যারা কুফরী ও নাফরমানীকে তাদের জন্যে বেছে নিয়েছে, যা তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়েছে।[১]

তফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, আদ জাতি আল্লাহর নেয়ামতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সমৃদ্ধির কারণে তাদের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের নিদর্শন সমূহকে তারা অস্বীকার করেছিল। আর তা করেছিল শুধু জেদ এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

আদ জাতি তখন কঠোর শাস্তি ভোগ করে ধ্বংস হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের প্রতি রয়েছে লা'নত। এ লা'নত তাদের প্রতি অব্যাহত থাকবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। এরপর শুরু হবে চির শাস্তি।

আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর পরিণাম ভয়াবহ

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, দুনিয়ার জিন্দেগীতে তাদের উপর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এসেছে লা'নত বা অভিশাপ অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এটি হলো আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর পরিণাম।

এ অর্থও হতে পারে যে, পার্থিব জীবনেও তারা নানা প্রকার বালা-মুসিবতে গ্রেফতার হবে, অশান্তি অকল্যাণ হবে তাদের চির সাথী। বর্তমান যুগেও পবিত্র কোরআনে ঘোষিত এ সত্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় যেমন পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সুখ-সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শান্তির অভাব চরম। তার পাশাপাশি রয়েছে এইড্স্ এর মত রোগের প্রাদুর্ভাব।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে, মানুষকে গৃহপালিত পশুর মত জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং খাদ্যের অভাব জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কারণে তারা পারমানবিক অস্ত্র তৈরী করে চলেছে, কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের দেশের মানুষের মুখে এক মুঠো খাদ্য তুলে দিতে পারছেনা। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করার এটিই হলো অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবেনা তাদের প্রতি লা'নত দুনিয়াতেও হবে এবং আখেরাতেও হবে, এর কারণ পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯

"সাবধান! আদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাই ধ্বংসই তাদের পরিণতি। আর জেনে রাখ হুদের জাতি আদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অভিশাপ রয়েছে"। আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের এ ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের بُعْدًا শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

(১) এর অর্থ হলো দূরত্ব অর্থাৎ আদ জাতি আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে।

(২) এর অর্থ হলো ধ্বংস অর্থাৎ আদ জাতি উল্লেখিত অপরাধ সমূহের কারণে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আদ জাতির পরিণতিকে পৃথিবীর অন্য জাতি সমূহের জন্যে শিক্ষণীয় হিসেবে পেশ করার লক্ষ্যে أَلَا শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, قَوْمِ هُوْدٍ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ এই যে, দু'টি জাতির নামই আদ ছিল। প্রথম আদ এবং দ্বিতীয় আদ নামে তারা ছিল পরিচিত। দ্বিতীয় আদ হলো সামুদ জাতি। আর প্রথম আদ হলো হুদ (আঃ)-এর জাতি। "কওমে হুদ" শব্দটি ব্যবহার করে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে সামুদ জাতি উদ্দেশ্য নয়।[১]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

আদ জাতির ঘটনার পর এ পর্যায়ে তৃতীয় ঘটনা হিসেবে 'সামুদ' জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আদম সন্তানদের জন্যে অফুরন্ত রিয্ক জমিনে রেখে দিয়েছেন, পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের যোগ্য করে তৈরী করেছেন, মানুষের আরাম-আয়েশের জন্যে আল্লাহ্ পাক যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"তিনিই আল্লাহ্ পাক, যিনি তোমাদের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু"। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো মহান দাতা দয়ালু, পালনকর্তা, রিয্কদাতা আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু মানুষ অহরহ আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত উপভোগ করা সত্বেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। তাই আল্লাহর নবীগণ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে এজন্যে প্রেরিত হয়েছেন যেন তাঁরা পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, এ উদ্দেশ্যেই সামুদ জাতির

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৬

নিকট তাদেরই বংশীয় ভাই হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

"সালেহ বলেছেনঃ হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই"।

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন"।

এ কথাটির ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে আল্লাহ পাক জমিনে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ জমিনকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন এবং মানুষকে তাতে আবাদ করেছেন এবং তিনি মানুষের জন্যে রকমারী খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا

"আর জমিনে তোমাদেরকে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন"।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, মানুষের জন্যে আল্লাহ পাক যে খাদ্য দ্রব্য দান করেছেন তা উৎপন্ন হয় মাটি থেকে। আর ঐ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে মানব দেহে রক্ত সৃষ্টি হয়। আর রক্ত থেকে শুক্র সৃষ্টি হয়। আর শুক্র থেকেই মানুষ সৃষ্টি হয়। অতএব, মানব সৃষ্টির মূল উপকরণ মাটি থেকেই আসে। মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো তার সৃষ্টির জন্যে এবং তাকে প্রদত্ত অগণিত নেয়ামত সমূহের জন্যে মহান দাতা আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এতে একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষকে আল্লাহ পাক জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছেন এবং পৃথিবীতে তার বসবাসের সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন।

অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া।[১]

فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ

তোমাদের কর্তব্য হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর।

اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-২২
খোলাসাতুত তাফসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭২

"নিশ্চয় আমার প্রতিপালক বন্দাদের অতি নিকটে এবং তিনি তাদের দোয়া কবুল করে থাকেন"।

"আল্লাহ্ পাক বন্দাদের অতি নিকটে" এ কথাটি অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

"(হে রসূল!) আপনাকে যখন আমার কোন বন্দা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আপনি তাদেরকে বলুন, নিশ্চয় আমি নিকটে, যখন কোন বন্দা আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই"। এমনিভাবে সূরা কাফে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর আরও একটি অর্থ হলো আল্লাহ পাকই মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন, মানুষের জীবন আল্লাহ পাকের দান, মানুষ আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়েই লালিত-পালিত হয়।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা।

হযরত সালেহ (আঃ) সামুদ জাতিকে এভাবে আল্লাহ পাকের তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ

কিন্তু সামুদ জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার স্থলে বললো, হে সালেহ! তোমার অসাধারণ প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার কারণে এবং তোমার চরিত্র-মাধুর্য লক্ষ্য করে আমরা তোমার প্রতি অনেক কিছু আশা করেছিলাম যে, তুমি অবশ্যই বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, কিন্তু তুমি আমাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছ।

اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا

আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে দেব-দেবতার পূজা করতো তুমি কি আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চাও? তুমি এমন কাজ করবে তা আমরা কোন দিনও ভাবিনি।

وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ

তুমি আমাদেরকে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছ, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছ। কিন্তু আমরা তোমার এ কথায় সন্দিহান রয়েছি, আমাদের মনে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মত ও পথ পরিত্যাগ করে তোমার মত গ্রহণ করতে পারিনা, আমাদের মন তোমার কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ
تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ
فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾
فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬৩) সালেহ বললেন, হে আমার জাতি! তোমরাই ভেবে দেখ যদি আমি আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি আর তিনি আমাকে রহমত দান করে থাকেন, যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? অতএব, তোমরাতো আমার অনিষ্ট বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করছ না।

(৬৪) আর হে আমার জাতি! আল্লাহ পাকের এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহ পাকের জমিতে চরে খেতে দাও এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করো না (কোন প্রকার কষ্ট দিওনা যদি তা কর) তবে অতি সত্ত্বর তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হবে।

(৬৫) কিন্তু তারা তাকে বধ করলো, তখন সালেহ বললেন, তোমরা তোমাদের ঘরে মাত্র তিন দিন জীবন উপভোগ করে লও। এটি এমন কথা যা মিথ্যা হবার নয়।

(৬৬) এরপর যখন আমার আযাব আসলো তখন আমি সালেহ ও তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে আমার রহমতে রক্ষা করলাম। আর রক্ষা করলাম সেদিনের অপমান থেকে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান, তিনি পরাক্রমশালী।

তফসীরুল কোরআন

হযরত সালেহ (আঃ) সামুদ জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। নবীর কাজ হলো মানুষকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান অনয়নের জন্যে আহ্বান করা। তাই হযরত সালেহ (আঃ) সামুদ জাতিকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানালেন কিন্তু সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো

এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের মত পৌত্তলিকতায় সুদৃঢ় থাকার সংকল্প প্রকাশ করলো, হযরত সালেহ (আঃ)-এর সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কথাবার্তা বললো। তারই জবাবে সালেহ (আঃ) যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ

হযরত সালেহ (আঃ) বললেনঃ হে আমার জাতি! আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সরল সঠিক পূণ্য পন্থা প্রদর্শন করেছেন, আমাকে তাঁর বিশেষ দানে ধন্য করেছেন। তোমাদেরকে হেদায়েত করার মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। এমনি অবস্থায় তোমরাই বল আমি কিভাবে তোমাদের কারণে তাঁর নাফরমানী করবো। যদি তোমাদের দিকে চেয়ে আমি তাঁর অবাধ্য হই এবং আল্লাহ পাকের মহান বাণী তোমাদের নিকট না পৌঁছাই, তৌহিদের প্রতি তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান না জানাই, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে?

আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা নিজের চরম ক্ষতি সাধন ব্যতীত আর কিছু নয়। তোমরা আমাকে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করার পরামর্শ দিয়ে শুধু আমার ক্ষতিই করছ এবং আমার অনিষ্ট বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছ। এসব কথাবার্তার পর সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট তাঁর নবুওয়্যতের পক্ষে মোজেযা দাবী করলো। আর মোজেযাও হতে হবে তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক। তারা বললো, পাথর থেকে আমাদের জন্যে আল্লাহর হুকুমে একটি উষ্ট্রী বের করে আন।

হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ পাথর থেকে একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসলো।

ইমাম রাজী (রঃ) হযরত সালেহ (আঃ)-এর এই মোজেযার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেনঃ

১. আল্লাহ পাক উষ্ট্রীটিকে পাথর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

২. ইতিপূর্বে কোন উষ্ট্রীর মাধ্যমে তার জন্ম হয়নি; বরং আল্লাহ পাকের হুকুমে এই উষ্ট্রীটি পাহাড়ের পাথর থেকে বের হয়ে আসে।

৩. কোন উষ্ট্রের সঙ্গে তার মেলামেশা ব্যতীতই কিছুক্ষণের মধ্যে তার একটি বাচ্চাও হলো।

৪. সে একদিন কূপের পানি পান করতো এবং সমস্ত পানি শেষ করে দিত। আর অন্যদিন সামুদ জাতির উষ্ট্রের পানি পানের ব্যবস্থা করা হতো।

৫. উষ্ট্রীটি এভাবে দন্ডায়মান হতো যে, লোকেরা যার ইচ্ছা যত ইচ্ছা তার দুধ দিয়ে তাদের পাত্রগুলো পরিপূর্ণ করে নিত।[১]

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৯

এ বিস্ময়কর উষ্ট্রীটি সম্পর্কে হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেনঃ

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً

হে আমার সম্প্রদায়! এটি আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত উষ্ট্রী, এটি আমার নবুওয়্যতের নিদর্শন, তোমাদেরকে তার সম্পর্কে আমি সাবধান করছি। তাকে আল্লাহর জমিনে ঘুরে ফিরে চরে খেতে দাও। তাকে কোন প্রকার কষ্ট দিওনা। যদি তোমরা তাকে কষ্ট দাও তবে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তোমাদের উপর নেমে আসবে আযাব। আর সে আযাবের কারণে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا

এ সতর্কবাণী সত্ত্বেও হতভাগা সামুদ জাতি আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত এ বিস্ময়কর উষ্ট্রীটিকে বধ করলো। হযরত সালেহ (আঃ) তখন তাদেরকে বললেনঃ তোমরা আর মাত্র তিন দিন এ জীবন ভোগ করবে, এরপর আল্লাহর আযাবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশেষে তাই হলো। সামুদ জাতি রাত্রিকালে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ফেরেশতাদের গুরু গর্জন শুরু হলো। এ গর্জন ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। এর সঙ্গে ভূমিকম্পও দেখা দিল, ফেরেশতাদের গর্জনের কারণেই অভিশপ্ত সামুদ জাতির বুক ফেটে গেল। রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।[১]

যুগে যুগে বিশ্ববাসী এ সত্য বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জগতে যে বা যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দিয়েছেন, এরপর তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর হুকুম পালন করেছে তাদেরকে তিনি রক্ষা করেছেন।

আলোচ্য ঘটনায় তাই হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا

"যখন আমার আযাবের আদেশ আসল তখন আমি সালেহকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করেছি সেদিনের কঠিন আযাব থেকে এবং অপমানজনক শাস্তি থেকে, আর তা করেছি আমার রহমতে"।

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি কথা বলা হয়েছেঃ

১. আল্লাহর অবাধ্য নাফরমানদের উপর যখন কঠোর আযাব হয় তখনও তিনি তাঁর মোমেন বন্দাদেরকে রক্ষা করেন, যেমন হযরত সালেহ (আঃ) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

২. আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে শুধু তাঁর রহমতে রক্ষা করেছেন, যদি তিনি রহমত নাযিল না করতেন তবে এ ভয়ংকর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পন্থা ছিল না।

---

[১]। সামুদ জাতির ইতিকথা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৩-০৮

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ

৩. (সেদিনের অপমান থেকে) অর্থাৎ একটি আযাব ছিল ধ্বংসের, আর দ্বিতীয় আযাব ছিল অপমানের। আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে উভয় আযাব থেকেই হযরত সালেহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করেছেন।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ধ্বংসও করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষাও করতে পারেন। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একই সময় ধ্বংস করা ও রক্ষা করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি পরাক্রমশালী।[১]

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا
لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ
قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ
لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ
اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ؕ ﴿٧٠﴾ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ
وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

তরজমা

(৬৭) এবং এক ভয়ংকর গর্জন জালেমদেরকে পাকড়াও করলো। পরিণামে তারা ভোর হতে না হতে তাদের নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

(৬৮) যেন তারা কখনও সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, সামুদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল আর জেনে রাখ, সামুদ জাতির উপর রয়েছে অভিসম্পাত।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯২
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৩

(৬৯) আর নিশ্চয় আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসল। তারা বললো সালাম, তিনিও বললেন সালাম। এরপর অবিলম্বে তিনি একটি ভাজা করা গো-বৎস নিয়ে আসেন।

(৭০) তিনি যখন দেখলেন আহার্যের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত হয়না তখন খটকা বোধ করেন, মনে মনে তাদেরকে ভয় পান। তারা বললো ভয় করোনা, আমরা লুতের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

(৭১) তখন তাঁর স্ত্রী দাড়িয়ে ছিল। সে হাঁসলো, আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেই এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবেরও।

(৭২) সে বললো, কি আশ্চর্য! আমি হবো সন্তানের জননী? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং আমার এ স্বামীও বৃদ্ধ। নিশ্চয় এটি হলো অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে সামুদ জাতির শোচনীয় পরিণতির কথা ঘোষিত হয়েছেঃ

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ

আর এক ভয়ংকর গর্জন এ পাপীষ্ঠদেরকে পাকড়াও করে এবং ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, এভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার মাত্র তিন দিন পরই হযরত জীব্রাইল (আঃ) ভয়ংকর গর্জন করেন অথবা আসমান থেকে ভয়ংকর হঙ্কার ধ্বনিত হয়। আর নীচে ভূমিকম্প শুরু হয়। ঐ ভয়ংকর গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী সামুদ জাতির লোকদের বুক ফেটে যায়। তারা নিজ নিজ গৃহে রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বে সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের অসার দেহগুলো উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا

আর তারা এভাবে নিশ্চিহ্ন হয় যেন কোন দিন তারা সেখানে ছিল না। তাদের এ ধ্বংসের কারণ বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে–

اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ

সাবধান! জেনে রাখ সামুদ জাতি তাদের প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছিল, জেনে রাখ, সামুদ জাতির প্রতি লা'নত, তাদেরকে তাদের কুফরী, নাফরমানী এবং অবাধ্যতার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের অন্যায়-অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই ভোগ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে কোপগ্রস্ত ও অভিশপ্ত। তাদেরকে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্যে এক বিরাট শিক্ষা। এ পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ পাক অস্তিত্ব দান

করেছেন এবং অনন্ত অসীম নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন যেন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মানুষ কোন কোন সময় এ সম্পর্কীয় দায়িত্ব ভুলে যায়। তাই আত্মবিস্মৃত মানুষকে বিস্মৃত সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে নবী রসূলগণ।

হযরত সালেহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সামুদ জাতির নিকট, তিনি তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ হতভাগ্য সামুদ জাতি সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছে। তাই কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবীতে রয়নি।

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ

আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর নিকট ফেরেশতাদের আগমন এবং তাঁর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদের উল্লেখ রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র সন্তান হবে, তার নাম হবে ইসহাক। আর তাঁরও পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তাঁর নাম হবে ইয়াকুব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন এ সুসংবাদ প্রদান করা হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। আর তাঁর স্ত্রী হযরত সারার বয়স হয়েছিল ৯০ অথবা ৯২ বছর। হযরত হাজেরা থেকে ইতিপূর্বে হযরত ইসমাইল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সারারও আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি পুত্রের, কিন্তু বার্ধক্যের কারণে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এ সুসংবাদ প্রেরণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সুসংবাদ দেয়ার জন্যে তিন জন ফেরেশতা এসেছিলেন। জীব্রাইল (আঃ), মিকাইল (আঃ) এবং ইস্রাফিল (আঃ)। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আটজন অথবা নয়জন ফেরেশতা এসেছিলেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, জীব্রাইল (আঃ) এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আরো ১২জন ফেরেশতা ছিলেন যারা সুন্দর সুদর্শন, নওজওয়ান বেশে প্রেরিত হয়েছিলেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, ঐ ফেরেশতাদের সংখ্যা ছিল ৯জন। ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সূরা যারিয়াতে আল্লাহ পাক এ ফেরেশতাদের কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

"(হে রসূল!) আপনার নিকট কি ইব্রাহীমের মেহমানদের খবর এসেছে"?

---

[১]। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৬৮

এবং সূরায়ে হিযরে

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ

"আর তাদেরকে ইব্রাহীমের মেহমানদের খবর দিন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আতা (রঃ) বলেছেন, ফেরেশতাদের সংখ্যা ৩ জনই ছিল।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব বলেছেন, জীব্রাইল (আঃ) এবং ৭ জন ফেরেশতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন ৯ জন ফেরেশতা ছিল। আর মোকাতেল (রঃ)-এর মতে ফেরেশতাদের সংখ্যা ছিল ১২ জন।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সুসংবাদ

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى

"আর আমার ফেরেশতাগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, ফেরেশতাগণ দু'টি সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, একটি হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসহাক এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকুবের জন্ম গ্রহণের। দ্বিতীয় সুসংবাদ হলো লুত (আঃ)-কে রক্ষা করার এবং তাঁর অবাধ্য নাফরমান সম্প্রদায়ের ধ্বংসের।

قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ

ফেরেশতারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন সালাম, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাদের জবাবে বললেন, সালাম।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন এর অর্থ হলো, আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাদেরকে অনুরূপ জবাব দিয়েছিলেন এবং অবিলম্বে তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

"এরপর অবিলম্বেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের সম্মুখে ভাজা করা গো-বৎস নিয়ে আসেন"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সালাম দেয়া ফেরেশতাদের তরীকা। আর মুসলমানদের মধ্যে সব যুগেই শুভেচ্ছা বিনিময়ের পন্থা হিসাবে সালাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৩

এতদ্ব্যতীত আরো একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, মেহমান ঘরে আসলে সর্বপ্রথম কাজ হলো তার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অতিথি পরায়ণতা ইতিহাস-বিখ্যাত। তাই মেহমান দেখা মাত্র সালাম বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর নবীর জন্যে গায়বী এলম থাকা জরুরী নয়। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর মেহমানদেরকে দেখা মাত্র বুঝতে পারেননি যে, তারা আল্লাহর ফেরেশতা। তাই তিনি অনতিবিলম্বে তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছেন।

فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

"যখন ইব্রাহীম (আঃ) লক্ষ্য করলেন যে, তারা আহার্যের প্রতি হাত প্রসারিত করে না, তখন তিনি একটু খটকা বোধ করলেন এবং মনে মনে তাদেরকে ভয়ও করলেন"।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সে যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি মেহমান মেজবানের খাবার গ্রহণ করতো তবে মেজবান আগন্তুক মেহমানদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতো। পক্ষান্তরে, যদি মেহমান খাবার গ্রহণ না করতো তবে সাধারণত এ ধারণা করা হতো যে, আগন্তুকদের নিয়ত ভাল নয়, হয়ত ডাকাতি-রাহজানির জন্যেই এসেছে।

বিশেষতঃ রাত্রে যখন কোন লোক আসতো তখন তাকে খাবার পরিবেশন করা হতো, কিন্তু যদি সে খাবার গ্রহণ না করতো তখনই তার সম্পর্কে ভয় করা হতো যে, হয়ত সে লুটতরাজ করার অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মেহমানরা যখন খাবার গ্রহণ করলো না, তখন তাঁর মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়া অতি স্বাভাবিক। কেননা ভয়-ভীতি একটি স্বভাবগত ব্যাপার। যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আর এটি রেসালতের উচ্চ মর্তবা বিরোধী নয়। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে, এরা ফেরেশতা, এজন্যে খাবারের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর ভয় হলো এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক তাঁর কোন কাজ অপছন্দ করে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেছেন। অথবা তাঁর জাতির প্রতি আযাব নাযিল করার উদ্দেশ্যে ফেরেশতা প্রেরিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ যেহেতু ফেরেশতাদের আগমন হয়েছিল লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবের জন্য, তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে।

قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ

(ফেরেশতারা বললো, আপনি ভয় করবেন না। আমরা লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি)

হযরত লুত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্পর্কে ভাই। ইরাক থেকে তাঁর সঙ্গে হিজরত করেছিলেন। হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় অত্যন্ত অশ্লীল কাজে

লিপ্ত ছিল। তাই তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন। ফেরেশতাগণ যাত্রা পথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ

আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা বিনতে হারান এবনে নাখুর দাঁড়িয়ে ছিল, পর্দার আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনছিল। সন্তান লাভের সুসংবাদে সে হেসে দেয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত সারার হাসির একাধিক কারণ ছিলঃ

১. ফেরেশতারা যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললোঃ

(তুমি ভয় করোনা) তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মন থেকে ভয় দূরীভূত হলো এবং তাঁর স্ত্রীর মনেও ভয় রইল না। এই খুশিতে তিনি হাঁসলেন।

২. সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত সারার হাসির কারণ ছিল বিস্ময়। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেহমানদের সম্মুখে খাবার পেশ করলেন। কিন্তু তারা খাবার গ্রহণ করলেন না। ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হলো এই ধারণায় যে, হয়তো এরা চোর ডাকাত হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আহার্য গ্রহণ কর-না কেন?

মেহমানরা বললো, আমরা মূল্য পরিশোধ না করে খাবার গ্রহণ করিনা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তাহলে মূল্য পরিশোধ কর। মেহমানগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই খাবারের মূল্য কি?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, এর মূল্য হলো, খাবার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা, আর খাবার শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

এ জবাব শ্রবণ করে জীব্রাইল (আঃ) মিকাইল (আঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ এই ব্যক্তির হক্ব রয়েছে আল্লাহ পাকের বন্ধু হবার। এরপরও যখন মেহমানরা খাবার গ্রহণে আকৃষ্ট হলেন না তখন হযরত সারা বিস্মিত হয়ে হাসলেন। তাঁর এ হাসি ছিল বিস্ময় প্রকাশার্থে। তিনি বলেছিলেন, আমরা মেহমানের সম্মানে খাবার পেশ করছি, অথচ কি আশ্চর্য, তারা খায়না।

৩. কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সারার হাসির কারণ ছিল এই, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর আযাব আপতিত হতে যাচ্ছে অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত রয়েছে।

৪. হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী একথার উপর হেসেছিলেন যে, তিনি বলেন, আমি ইতিপূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে কথা বলেছিলাম তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলেছিলেন, লুতকে নিজের কাছে ডেকে নিন, আমার মনে হচ্ছে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসবে।

৫. মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীর হাসি এজন্যে এসেছিল যে, তিনি দেখলেন মেহমান মাত্র তিনজন অথচ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর খাদেম-খেদমতগার অনেক রয়েছে, এতদসত্ত্বেও তাঁর ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? এ কারণে তাঁর হাসি এসেছে।

৬. তাঁর নিজের পুত্র এবং পৌত্র লাভের সুসংবাদে এবং হযরত লুত (আঃ)-এর অপরাধী সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার খবরে খুশি হয়ে তিনি হেসেছিলেন।

৭. হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী আশ্চর্যন্বিত হয়েছেন এ কথার উপর যে, তাঁর স্বামী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আর তিনি নিজেও বৃদ্ধা, এমন অবস্থায় সন্তান হওয়া সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। আর এ আশ্চর্যজনক খবর শুনেই তিনি হেসে দিয়েছেন।[১]

একটা আনন্দঘন মুহূর্তে হাসি আসা অতি স্বাভাবিক। আর এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কি হবে, যে মেহমানদেরকে দুশমন ভাবা হয়েছিল তারা দুশমন নয়, বরং তারা ছিল বন্ধু, আর বন্ধুও কেমন আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা। এ বিস্ময়কর অবস্থায় হযরত সারা হেসে দিয়েছিলেন।[২]

কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, ফেরেশতাদের আচরণে স্বামীর ভয় পাওয়া এবং ক্ষণিকের মধ্যে ভয় কেটে যাওয়ার দৃশ্য তাঁর হাসির কারণ হয়েছে। যাহোক, ফেরেশতাগণ তাঁর আনন্দের উপর আরো অধিকতর আনন্দদায়ক সুসংবাদ দিলেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

আর আমি স্ত্রীলোকটিকে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবেরও। এ সুসংবাদ পেয়েই খুশিতে হেসে দিয়েছিলেন হযরত সারা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ সুসংবাদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীকে দেয়ার কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। সুসংবাদের ব্যাপারে স্ত্রীর উল্লেখ করার একাধিক কারণ রয়েছে।

১. হযরত সারাকে একথা জানানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইসহাক এবং ইয়াকুব তোমার বংশ থেকেই হবে, অন্য কোন স্ত্রীর পক্ষ থেকে নয়।

২. সন্তান-সন্ততির জন্ম গ্রহণে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশী খুশি হয়।

৩. হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা ছিলেন বন্ধ্যা। সন্তান জন্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরাশ। এজন্যে তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তোমার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয় সে পুত্রের ঘরে তোমার পৌত্রও জন্ম নেবে, আর তা তুমি নিজে দেখবে। তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হলেন এবং বললেনঃ

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৬
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৩

কি আশ্চর্য! আমার সন্তান হবে, অথচ আমি বৃদ্ধা। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। নিশ্চয় এটি হলো অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

এবনে এসহাক বর্ণনা করেনঃ তখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীর বয়স ছিল ৯০ বছর। আর মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, তাঁর বয়স ছিল তখন ৯৯ বছর।

আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল এবনে এসহাকের মতে ১২০ বছর। মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে ১০০ বছর। বর্ণিত আছে যে, এ সুসংবাদ প্রদানের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরই তাঁর সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।[১]

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ
الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ
وَجَاۗءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ۝ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ
لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ
جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝ وَلَمَّا
جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۗءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا
يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝

তরজমা

(৭৩) তারা বললো, তোমরা কি আল্লাহ্ পাকের আদেশের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছো? অথচ হে গৃহবাসী! তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত এবং অনেক বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক প্রশংসিত, মহিমময়।

(৭৪) এরপর যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভয় কেটে গেল এবং তার নিকট সুসংবাদ আসলো, সে তখন লুতের জাতির ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলো।

(৭৫) নিশ্চয় ইব্রাহীম সহনশীল, কোমল হৃদয় এবাং আল্লাহ পাকের প্রতি সতত রুজু করে থাকে।

(৭৬) হে ইব্রাহীম! একথা থেকে বিরত হও তোমার প্রতিপালকের আদেশ যে এসে পড়েছে। তাদের শাস্তি অনিবার্য, যা কখনও ফিরবার নয়।

(৭৭) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লুতের নিকট উপস্থিত হয় তখন তাদের আগমনে সে দুঃখ পায় এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং বলে, আজকের দিন অত্যন্ত কঠিন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৬

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে বৃদ্ধ বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তান লাভের ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী যে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। হযরত সারার কথার জবাবে ফেরেশতাগণ যা বলেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। ফেরেশতাগণ বলেছিলেন, আপনারা আল্লাহর নবীর পরিবারবর্গ, আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের অনেক বিস্ময়কর লীলা খেলা সর্বদা আপনারা দেখে থাকেন। আর আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং বরকত অহরহ আপনাদের প্রতি বর্ষিত হয়ে থাকে, এতদসত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করাই বিস্ময়কর ব্যাপার। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

"ফেরেশতারা বললো, আল্লাহ পাকের হুকুমের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছো"?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর আদেশ اَمْرِ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরত এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নয়, কেননা তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তাঁর দরবারে কোন কিছুই অসম্ভব নেই, এমনকি কঠিনও নেই।

رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ

আলোচ্য আয়াতে "রহমত" শব্দটির অর্থ হলো নেয়ামত অথবা মহব্বত। আর বরকত শব্দ দ্বারা সকল কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "রহমত" শব্দ দ্বারা নবুওয়্যতকে বোঝানো হয়েছে আর "বরকাত" শব্দ দ্বারা বনী ইসরাঈলের বারটি বংশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবীগণ হযরত সারার বংশধর। আয়াতের অর্থ হলো এই, হে গৃহবাসী! তোমাদেরকে সন্তান লাভের যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাতে তোমাদের আশ্চর্যন্বিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা আল্লাহ পাকের এমন বহু রহমত এবং বরকত তোমরা লাভ করছো। নিশ্চয় আল্লাহ পাক স্বয়ং প্রশংসিত, তিনি মহিমময়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, مجد শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো উচ্চ মর্তবা। ইমাম বয়যাবী (রঃ) 'মাজিদ' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন "যার এহসান অনেক বেশী"। আর বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসে এর ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ "যিনি মহিমময়"।[১]

যেহেতু আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারার সঙ্গে ফেরেশতাদের কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে, তাই কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এর দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, নবী ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে ফেরেশতাদের কথা অসম্ভব নয়।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৭
[২]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৪

হযরত সারার ফজিলত

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা হযরত সারার ফজিলত প্রমাণিত হয়। কেননা ফেরেশতাগণ তাঁকে আল্লাহ পাকের রহমত এবং বরকতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর ফজিলত প্রমাণিত হয়।

قال اتى جبرائيل النبى صلى الله عليه واله وسلم فقال يارسول الله هذه

হযরত খাদিজাতুল কোবরার ফজিলত

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, জীব্রাইল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! এই খাদিজা আপনার নিকট খাদ্য-দ্রব্য এবং পানীয় নিয়ে আসেন। আপনি তাকে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সালাম পৌঁছে দিন এবং আমার সালামও।

আর তাঁকে এই সুসংবাদ দিন যে, জান্নাতে তাঁর জন্যে একটি মুক্তা নির্মিত ইমারত রয়েছে অথবা স্বর্ণ নির্মিত ইমারত, যা হীরা জহরত দ্বারা সুসজ্জিত রয়েছে, যেখানে কোন রকম হট্টগোল এবং দুঃখ বা দুশ্চিন্তা নেই। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরও একখানি হাদীসে রয়েছেঃ হে আয়েশা! ইনি জীব্রাইল, তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাবে বললেনঃ তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত, তিনি আমাকে দেখেন, আমরা তাঁকে দেখিনা।[১]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে মেহমানদের খাবার গ্রহণ না করার কারণে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল তা যখন কেটে গেল এবং বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুসংবাদও পাওয়া গেল আর একথাও জানা গেল যে, ফেরেশতাগণ হযরত লুত (আঃ)-এর অপরাধী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, তখন তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে يُجَادِلُنَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হলো তর্কে লিপ্ত হওয়া, বাদানুবাদ করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হবেন এটা অসম্ভব, অকল্পনীয়। তবে এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের জন্যে তিনি ফরিয়াদ করলেন। সাধারণতঃ তফসীরকারগণ এর অর্থ লিখেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) লুত (আঃ)-এর জাতির ব্যাপারে ফেরেশতাদের সঙ্গে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেছেন। ঐ কথাবার্তার বিবরণ এই, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

[১]। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৬

ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ যদি বস্তিতে ৩০০ মোমেন থাকে তবুও কি তাদেরকে ধ্বংস করা হবে? হযরত জীব্রাইল (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা বললেন, না।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ যদি ৪০ জন থাকে? তখন ফেরেশতারা বললেন না, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন যদি ৩০ জন মোমেন থাকে তবুও কি ধ্বংস করা হবে? ফেরেশতারা বললেন, না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সংখ্যা কমাতে কমাতে অবশেষে বললেন, যদি পাঁচ জন মোমেন থাকে তবুও কি ধ্বংস করা হবে?

ফেরেশতারা বললেন, না। অবশেষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ যদি একজন থাকে তবুও কি ঐ বস্তি ধ্বংস করা হবে? তারা একই জবাব দিলেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ঐ বস্তিতে হযরত লুত (আঃ) রয়েছেন, তোমরা তাঁকে সহ কিভাবে ধ্বংস করবে?

ফেরেশতারা বললেনঃ লুত (আঃ)-এর অবস্থানের কথা আমাদের জানা আছে, আমরা তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে রক্ষা করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাদের কোন ক্ষতিই হবেনা।

মূলতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ কথাগুলোকেই পবিত্র কোরআনে يُجَادِلُنَا (বিতর্ক করা, বাদানুবাদ করা) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে ছিল দয়ামায়া, তাঁর চিত্ত ছিল দয়াদ্র। এ কারণেই তিনি লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এত কথাবার্তা বলেছেন, তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

"নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহর দিকে রুজুকারী"।

মূলতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর চিত্ত যেহেতু দয়াদ্র ছিল এবং তাঁর অন্তর দয়া মায়ায় ছিল পরিপূর্ণ এবং তিনি অপরাধী থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা পছন্দ করতেন না, তাই তিনি হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের বাপারে ফেরেশতাদের সঙ্গে এত সব কথা বলেছেন। তাঁর কথার জবাবে ফেরেশতারা বলেছেনঃ

يَـٰٓإِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

হে ইব্রাহীম! এসব কথা ছেড়ে দিন। কেননা তাদের শাস্তির ব্যাপারে আপনার প্রতিপালকের ফরমান জারি হয়েছে। তাদের প্রতি আযাব অবশ্যই আপতিত হবে। এ আযাব কখনও টলবে না।[১]

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-১২৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৯

"যখন আমার ফেরেশতারা লুতের নিকট পৌঁছল তখন সে দুঃখবোধ করলো এবং তাদেরকে দেখে তার মন সংকীর্ণ হল। সে বললো, এটি অত্যন্ত কঠিন দিন"।

বর্ণিত আছে ফেরেশতাগণ প্রিয়দর্শন, আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানরূপে হাযির হয়েছিলেন। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তিনি তাদেরকে মানুষ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। মেহমানের সম্মান কিভাবে রক্ষা হবে এবং তাঁর জাতির অপরাধীদের হাত থেকে তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবেন এটিই ছিল তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ।

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

(মেহমানদেরকে দেখে লুত (আঃ)-এর মন সংকীর্ণ হল) একথার তাৎপর্য হল, মেহমানদেরকে দেখার পর তাঁর জাতির অপকর্মের কথা মনে করে তিনি বিচলিত হলেন এ মর্মে যে, দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে কিভাবে তাদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লামা বগভী লিখেছেন, এর মর্ম হল এই মেহমানদেরকে দেখে হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে রক্ষার ব্যাপারে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে নিজেকে অসহায় মনে করলেন এবং বললেন, এই দিনটি বড় কঠিন।

وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে ফেরেশতারা বের হয়ে হযরত লুত (আঃ)-এর এলাকায় আসলেন। তখন সময় ছিল দ্বিপ্রহর। হযরত লুত (আঃ) কৃষি কাজে ব্যস্ত ছিলেন অথবা জঙ্গলে কাষ্ঠ খন্ড সংগ্রহের জন্যে গিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, যে পর্যন্ত লুত তার জাতির অন্যায় অনাচারের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য না দেয় সে পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করোনা। ফেরেশতাগণ লুত (আঃ)-এর নিকট অবস্থান করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে নিয়ে চলতে লাগলেন, কিছু দূর চলার পরই তিনি মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বস্তির অবস্থা কি তোমাদের জানা আছে? ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের কি অবস্থা? তিনি বললেন, পৃথিবীর বুকে এটি সবচেয়ে বেশী অপরাধের স্থান। হযরত লুত (আঃ) কথাটি চারবার বললেন। এরপর ফেরেশতাগণ হযরত লুত (আঃ)-এর বাড়ীতে আসেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত লূত (আঃ) কাষ্ঠখন্ড বহন করছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর পেছনে আসছিলেন। পথে কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে তাঁরা অতিক্রম করলেন। লোকেরা পরস্পর একে অন্যের প্রতি চোখে ইশারা করলো। হযরত লুত (আঃ) বললেন, পৃথিবীতে আমার জাতি সবচেয়ে বেশী অপরাধী। এভাবে আর এক দল লোকের সাথে তাঁদের দেখা হল। তারাও অনুরূপ ভাবে একে অন্যের দিকে ইঙ্গিত করলো। হযরত লুত (আঃ) অনুরূপ মন্তব্য করলেন। এরপর তাদের দেখা হল তৃতীয় দলের সঙ্গে। তারাও তাই করলো। হযরত লুত (আঃ) পুনরায় একই বাক্য উচ্চারণ করলেন। হযরত জীব্রাইল (আঃ) ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। হযরত লুত (আঃ) অবশেষে বাড়ী পৌঁছে গেলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ফেরেশতাগণ গোপনে হযরত লুত (আঃ)-এর বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁর পরিবারের লোক ব্যতীত আর কেউ তাদেরকে দেখেনি। হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী তাদের আগমন সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদেরকে খবর দিয়েছিলো।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ পর্যায়ে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে বের হয়ে "সদুম" নামক নদীর তীরে পৌঁছেন। সেখানে তাঁদের সাথে দেখা হয় হযরত লুত (আঃ)-এর কন্যার সাথে। তিনি সেখানে পানি নিতে গিয়েছিলেন। মানবরূপী ফেরেশতাগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা এখানে কোথাও অবস্থান করতে পারি? হযরত লুত (আঃ)-এর কন্যা বললেন, আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এসে আপনাদেরকে জবাব দেব। তিনি ভয় করলেন, যদি তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের সাক্ষাত পায় তবে তাদেরকে অপমান করবে। হযরত লুত (আঃ)-এর কন্যা পিতার নিকট এসে বললেন, আমি শহরের বাইরে কিছু বিদেশী লোক দেখেছি, এমন লোক ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। হযরত লুত (আঃ) তাঁর কন্যাকে বললেন, মেহমানদেরকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আস কেননা, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা দেখলে তাদেরকে কষ্ট দেবে। হযরত লুত (আঃ) এরপর মেহমানদেরকে বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। কেউ তা জানতেও পারেনি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী লোকদেরকে এ সম্পর্কে খবর দিয়েছিলো।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে হযরত লুত (আঃ)-এর নিকট গমন করলেন। উভয় বস্তির মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র চার ফার্লং। ফেরেশতাগণ অতি সুন্দর, আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট যুবকদের আকৃতি ধারণ করেছিলেন। হযরত লুত (আঃ) প্রথম দেখায় চিনতে পারেননি যে, তারা আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে দেখে দুঃখবোধ করলেন (سِيٓءَ بِهِمْ) ইমাম রাজী (রহঃ) এর কয়েকটি কারণ লিখেছেনঃ

১. হযরত লুত (আঃ) মনে করেছেন মেহমানগণ মানুষ, তাই তিনি ভয় করেছেন তাঁর সম্প্রদায়ের অপরাধী লোকেরা মেহমানদের সাথে মন্দ ব্যবহার করার ইচ্ছা করলে, আমি কিভাবে তাদেরকে ঠেকাবো।

২. তাদের আগমনে তিনি এজন্যে ব্যথিত হয়েছেন যে, তাদের মেহমানদারীর হক্ব আদায় করার সামর্থ তখন তাঁর ছিলনা।

৩. সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলে রেখেছিলো, যদি কোন বিদেশী মেহমান আসে আপনার বাড়ীতে তাদেরকে স্থান দেবেন না, আমরাই তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবো।

৪. তিনি মেহমানদেরকে দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন এজন্যে যে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেনঃ তারা আল্লাহর ফেরেশতা এবং তারা তাঁর অপরাধী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্যেই এসেছেন।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৯
তফসীরে তাবারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০

[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-২৬
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৭

[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৩১

وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ

"তিনি বললেন, "এই দিনটি অত্যন্ত কঠিন"। অর্থাৎ-এ দিনে রয়েছে মহাবিপদ। মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল এটি চরম বিপদের দিন। এবনে এসহাক (রহঃ), কাতাদা (রহঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য বাক্যের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ
لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ
وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ
اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ
اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

তরজমা

(৭৮) তাঁর জাতি তাঁর নিকট ছুটে আসলো উদভ্রান্ত হয়ে, আর তারা পূর্ব থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিল। লুত বলেন, হে আমার জাতি! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্যে তারা পবিত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে লজ্জিত করোনা, তোমাদের মধ্যে কি কোন সৎ লোক নেই?

(৭৯) তারা বললো, তুমিতো জান তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন গরজ নেই। আমরা কি চাই তুমি তা জান।

[১]। তফসীরে তাবারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০

(৮০) লুত বলেনঃ হায়! তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা আমি যদি কোন শক্তিশালী আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম।

(৮১) মেহমানগণ বললেন, হে লুত! আমরা আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা, তারা কখনই আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা। অতএব, রাতের কোন এক সময় আপনার পরিবারবর্গ সহ বের হয়ে পড়ুন। আর কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী, তার ব্যাপারে তাই ঘটবে যা ঘটবে তাদের ব্যাপারে। প্রভাত তাদের জন্যে প্রতিশ্রুতির সময়, প্রভাত কি খুব নিকটবর্তী নয়?

তফসীরুল কোরআন

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ

হযরত লুত (আঃ) তাঁর জাতির ব্যাপারে যে আশঙ্কা করেছিলেন অবশেষে তা সত্য প্রমাণিত হলো। সুদর্শন যুবকদের আগমনের খবর পেয়ে পাষন্ডরা আত্মহারা হয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসলো। হযরত লুত (আঃ)-এর নিকট আগত মেহমানদেরকে তাদের হস্তে সমর্পণের জন্যে দাবী জানালো। তারা তাঁর মেহমানদেরকে তাদের কুকর্মের যোগ্য শিকার মনে করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলো। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিয়ে এ ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের يُهْرَعُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রাঃ) উভয়ে বাক্যটির তরজমা করেছেনঃ "তারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে এসেছে"।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা লম্ফ দিয়ে এসেছে।

আর হাসান (রঃ) বলেছেন, দ্রুতবেগে এবং লম্ফ দেয়ার মধ্যম গতিতে তারা এসেছে।

যাহোক, এর অর্থ হলো–তারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অতি দ্রুত হযরত লুত (আঃ)-এর বাড়ীতে ছুটে আসে।

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ

এর পূর্বেও তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। মেয়েদের স্থলে এ দূরাত্মা, পাষন্ড হতভাগারা ছেলেদের সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হতো। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তারা এত নির্লজ্জ হয়ে পড়েছিল যে, প্রকাশ্যে তারা এমন ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো। হযরত লুত (আঃ) যখন তাদেরকে সৎ পথে আনতে ব্যর্থ হলেন তখন বললেন, তোমরা যদি একেবারেই নাছোড়বান্দা হও তবে-

قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ

হে আমার জাতি! আমার এ কন্যারা রয়েছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর এবং তোমাদের যৌন সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। এটিই পবিত্রতম পন্থা।

তফসীরকারগণ আলোচ্য বাক্যটির দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন–

১. যেহেতু, নবীগণ সমগ্র জাতির জন্যে পিতৃতুল্য হন আর জাতির মেয়েরা নবীর মেয়েদের তুল্য তাই

هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي

"আমার মেয়েরা" বলে তিনি তাঁর জাতির মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

২. আমার মেয়েরা বলে তিনি তাঁর নিজের মেয়েদের কথা বলেছেন অর্থাৎ–তিনি ঐ বিপজ্জনক মুহূর্তে তাদের নিকট তাঁর মেয়েদের বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, যাতে করে এভাবে মেহমানদের উপর হামলায় উদ্যত পাষন্ডদেরকে নিবৃত্ত করা যায়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, তাঁর মেয়েদের কথা বলে তিনি মূলতঃ তাঁর মেহমানদের সম্মান রক্ষা করার লক্ষ্যে তাঁর জাতির নিকট চরম কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, সেকালে মোমেন এবং কাফেরদের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। তাই হযরত লুত (আঃ) এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

তফসীরকারদের মধ্যে যারা বলেন যে, "আমার মেয়ে" বলে তিনি তাঁর জাতির মেয়েদেরকে বুঝিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য হলো হযরত লুত (আঃ)-এর মাত্র দু'টি মেয়ে ছিল। আর মেহমানদেরকে দেখে যারা হামলায় উদ্যত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। অতএব, এত লোকের নিকট দু'টি মেয়ে বিয়ে দেয়ার কথা অকল্পনীয়। আর যারা বলেন যে, আমার মেয়ে বলতে হযরত লুত (আঃ) শুধু তাঁর মেয়েদেরকে বুঝিয়েছেন তারা বলেন, লুত (আঃ)-এর জাতির দু'জন নেতা ছিল। সকলেই এ দুজনকে মেনে চলতো, তাই হযরত লুত (আঃ) তাঁর দু'টি কন্যাকে ঐ দু' নেতার নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পেশ করেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত লুত (আঃ) তাদের নিকট তাঁর মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব দেননি; বরং এর দ্বারা তিনি তাদের নির্লজ্জ কুকর্মের প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের লজ্জা-শরম এমনকি, মানবতা বলতে কিছুই ছিলনা। তারা ছিল মানুষরূপী পশু।

فَاتَّقُوا اللَّهَ

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অশ্লীল কাজ এবং যাবতীয় অন্যায়-অনাচার পরিহার কর। তোমাদের প্রত্যেকটি কর্মের জন্যে অবশেষে তোমাদেরকে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদেহী করতে হবে। ভাল কাজ হলে পুরস্কার এবং মন্দ কাজ হলে শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي

আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অপমানিত করোনা। কেননা, মেহমানকে অপমানিত করার মাধ্যমে মূলতঃ মেজবানকে অপমানিত করা হয়। অতএব, তোমরা এ অন্যায় পথ বর্জন কর।

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

(তোমাদের মধ্যে কি একজনও সৎ লোক নেই?) যে অন্যায় থেকে বিরত থাকবে, ন্যায় পথে চলবে।

এবনে এসহাক (রহঃ) رَّشِيدٌ শব্দটির তরজমা করেছেন, ভাল কাজের নির্দেশদানকারী এবং মন্দ কাজে বাধাদানকারী। এমন অবস্থায় এর অর্থ হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন একজন লোকও নেই যে তোমাদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

হযরত লুত (আঃ)-এর এসব কথায় দূরাত্মা জালেমরা সঠিক পথে আসেনি। তাই হযরত লুত (আঃ)-এর কাকুতি-মিনতি তাদের মনে দাগ কাটেনি; বরং তাদের দৌরাত্ম, দুঃসাহস এবং নির্লজ্জতা আরো বেড়ে যায়।

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ

তারা বলে, হে লুত! আমাদের উদ্দেশ্য কি তা তোমার অজানা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

অতএব, তোমার এসব হেদায়েত-নসিহত রাখ। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, অথবা এর অর্থ হলা তোমার কন্যাদের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

এতদ্ব্যতীত, তোমার কন্যাদের উপর আমাদের কোন হক্ব নেই, কেননা তারা আমাদের বিবাহিতা স্ত্রী নয়।

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

"আর হে লুত! তুমি ভাল করেই জানো আমরা কি চাই"।

হযরত লুত (আঃ) যখন উপলব্ধি করলেন, এ জালেমরা কোন অবস্থাতেই সত্য পথে আসবেনা তখন তিনি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় বলেন,

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً

যদি আমি তোমাদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হতাম, তথা যদি আমার দেহে তোমাদের থেকে বেশী শক্তি থাকতো তবে আমি শক্তি দ্বারা তোমাদের প্রতিরোধ করতাম।

أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় লাভ করতে পারতাম তথা যদি আমার আত্মীয়-স্বজন এখানে থাকতো এবং তাদের সাহায্য আমি লাভ করতে পারতাম তবে আমি তাদের সহযোগিতায় তোমাদের থেকে নিজের হেফাজত করতে পারতাম।

বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসে رُكْنٍ শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে শক্তির যাবতীয় উপকরণ। যেমন ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতি।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত লুত (আঃ)-এর সেই কঠিন বিপজ্জনক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন,

يرحم الله لوطا لقد كان يأوى الى ركن شديد

"লুতের প্রতি আল্লাহ পাক রহমত নাযিল করুন, তিনি সুশক্ত আশ্রয় চেয়েছিলেন"। হযরত লুত (আঃ)-এর এ উক্তিতে তখনকার ভয়াবহ পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এবনে আসাকের এবং এবনে এসহাক যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আল্লামা বগভী (রঃ)-ও একথা লিখেছেন যে, হযরত লুত (আঃ) তাঁর গৃহের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি ঘরে থেকেই তাঁর জাতির লোকদের সাথে কথা বলছিলেন এবং তাদেরকে শপথ দিচ্ছিলেন। তারা সকলেই ঘরের বাইরে ছিল এবং দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করতে উদ্যত ছিল, ফেরেশতাগণ হযরত লুত (আঃ)-এর এ অবস্থা দেখে যা বলেছিলেন তা কোরআনে করীমে এভাবে এশাদ হয়েছেঃ

قَالُوا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

ফেরেশতারা বলল, হে লুত! আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আপনার নিকট পৌঁছতে সক্ষম হবেনা, আপনি দরজা খুলে দিন। দূরাত্মা কাফেররা ঘরে প্রবেশ করল। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবার থেকে আযাব নাযিল করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর প্রকৃত রূপ ধারণ করলেন যা সাধারণতঃ থাকে। তাঁর পাখাগুলো তিনি ছড়িয়ে দিলেন, মুক্তার হার পরিহিত অবস্থায় চমকদার দাঁত বিশিষ্ট কোকড়ানো চুল এবং বরফের ন্যায় সাদা ধবধবে বর্ণ, দু'পা হালকা সবুজ (এ ছিল হযরত জীব্রাইল (আঃ)-এর আকৃতি)। হযরত জীব্রাইল (আঃ) তাঁর একটি পাখা দ্বারা হামলাকারীদের মুখের উপর আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং চিৎকার দিয়ে পলায়ন করতে লাগল। লুত (আঃ)-কে বলল, অপেক্ষা কর, সকালে আমরা দেখিয়ে দেব। হযরত লুত (আঃ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদেরকে কখন ধ্বংস করা হবে? ফেরেশতাগণ বললেন, ভোরে বা অতি প্রত্যুষে। হযরত লুত (আঃ) বললেন, আমি চাই তাদের ধ্বংস আরো ত্বরান্বিত হোক। ফেরেশতারা বললেন, ভোর কি খুব নিকটে নয়?[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭২

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে হযরত লুত (আঃ)-এর এ কথার বর্ণনা রয়েছে।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ

লুত (আঃ) অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় বলেছিলেন, "হায়! যদি আমি তোমাদের তুলনায় অধিকতর শক্তির অধিকারী হতাম এবং যদি আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় পেতাম"। হযরত লুত (আঃ) দুশমনের মোকাবেলায় যখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখনই একথা বলেছিলেন, এদিকে ফেরেশতাগণও দেখলেন যে, জালেমদের দৌরাত্ম সীমালঙ্ঘন করতে যাচ্ছে–এমন অবস্থায় ফেরেশতাগণ যে সুসংবাদ দিলেন, তা-ই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ

হযরত লুত (আঃ)-এর জন্য সুসংবাদ

আলোচ্য আয়াতে হযরত লুত (আঃ)-এর জন্যে কয়েকটি সুসংবাদ রয়েছেঃ

১. তাঁর মেহমানগণ বলেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফেরেশতা।

২. ফেরেশতাগণ এ সুসংবাদও দিলেন যে, দূরাত্মা জালেমদের আমাদের কাছে পৌঁছাতো দূরের কথা, আপনার নিকটও আসতে পারবেনা।

৩. আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করবেন, এ উদ্দেশ্যেই আমরা প্রেরিত হয়েছি।

৪. আল্লাহ পাক লুত (আঃ)-কে তাঁর পরিবার-পরিজন সহ আসন্ন আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

৫. লুত (আঃ) শক্তিশালী আশ্রয় কামনা করেছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ আপনার আশ্রয় স্বয়ং আল্লাহ পাক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই আপনার সাহায্যকারী।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ

ফেরেশতারা লুত (আঃ)-কে বললেন, অতি প্রত্যুষেই তারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে। অতএব, হে লুত! আপনি আপনার পরিবার-পরিজন এবং মোমেনদেরকে নিয়ে ভোর হওয়ার পূর্বেই এ এলাকার বাইরে কোথাও চলে যান।

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ

আপনার সঙ্গীদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেবেন, কেউ যেন কোন অবস্থাতেই পেছনের দিকে না তাকায় কেননা, যদি কেউ পেছন ফিরে তাকায় তবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, পেছনের দিকে তাকানোর অর্থ হবে, যে জালেম সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্যে তার মনের আকর্ষণ রয়েছে। এজন্যেই সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে আর তাই হবে তার ধ্বংসের কারণ।

إِلَّا امْرَأَتَكَ

"তবে হ্যাঁ হে লুত! তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়োনা"। কেননা সে কাফের, সে কোপগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে আছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী সম্পর্কে তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে দু'টি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

(এক) হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিল, কিন্ত পূর্বাহ্নে সতকর্তা অবলম্বনের তাগিদ করা সত্ত্বেও সে কোপগ্রস্ত সম্প্রদায়ের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল, ফলে ধ্বংস হয়।

(দুই) হযরত লুত (আঃ)-এর উপর এ আদেশ হয়েছিল যেন তাঁর স্ত্রীকে কাফেরদের নিকটই ছেড়ে যান কেননা, তার মন তাদের দিকে আকৃষ্ট ছিল, তাই তার সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ

যে আযাব লুত (আঃ)-এর জাতির প্রতি আপতিত হবে তা হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রীর উপরও নির্ধারিত হয়ে আছে। যেভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান কাফের হওয়ার কারণে তাকে নূহ (আঃ)-এর পরিবারভুক্ত মনে করা হয়নি, ঠিক এমনিভাবে লুত (আঃ)-এর স্ত্রী মোমেন না হওয়ার কারণে তাকে কোপগ্রস্ত হতে হয়েছে। লুত (আঃ) তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শ্রবণের পর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আযাব কখন আসবে? ফেরেশতারা বললেন–

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ

তাদের আযাবের জন্যে সময় নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে তা হল ভোর বেলা। তখন হযরত লুত (আঃ) বললেন, এখনো ভোর হতে অনেক বিলম্ব। তখন তারা বললেনঃ

أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

"ভোর কি নিকটবর্তী নয়"?

বর্ণিত আছে, লুত সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে এক রাতের বিলম্ব করার কারণ হলো, লুত (আঃ)-কে আপনজনদের নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া। আর ধ্বংসের জন্যে ভোরের সময়টি এজন্যে নির্ধারিত হয়েছে যে, ঐ সময় সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে থাকে।[১]

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৭৪

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۙ﴿۸۲﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَ
مَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۳﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا
تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْۤ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿۸۴﴾ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۸۵﴾ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿۸۶﴾

তরজমা

(৮২) অবশেষে যখন আমার আযাব আসলো, আমি সেই ভূখন্ডের উপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত প্রস্তর, কংকর বর্ষণ করলাম।

(৮৩) যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই জনপদগুলো এই জালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়।

(৮৪) আর আমি মাদীয়নাবাসীদের নিকট তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করি, তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। আর তোমরা মাপে ওজনে কম দিওনা। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি। কিন্তু আমি তোমাদের জন্যে আশঙ্কা করছি এক সর্বগ্রাসী শাস্তি।

(৮৫) হে আমার জাতি! পরিমাপ ওজন ন্যায্য ভাবে পূর্ণ করে দিও। মানুষের প্রাপ্য বস্তু কম দিওনা। আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।

(৮৬) যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও তবে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্যে উত্তম। মনে রেখো, আমি কিন্তু তোমাদের রক্ষক নই।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে হযরত লুত (আঃ)-এর নাফরমান জাতির ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যেভাবে তারা আল্লাহ পাকের বিধানকে ওলট-পালট করেছিল, জীবন-যাপনের

স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিকে বর্জন করেছিল, ঠিক তেমনি তাদের উপর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আযাব আসল, প্রবল শিলা বৃষ্টিতে তারা যে যেখানে ছিল ধ্বংস হল। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) তাদের বস্তিটিকে প্রথমে উপরে তুলে নিলেন, আকাশের কাছাকাছি নিয়ে উল্টিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। এভাবে হযরত লুত (আঃ)-এর অপরাধী জাতির মূলোৎপাটন করা হল।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

যখন আমার আযাবের আদেশ আসল, আমি সেই জনপদের উপরিভাগকে নীচে করে দেই অর্থাৎ উল্টিয়ে নিক্ষেপ করার কারণে ঐ জনপদের সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের এ কাজ করেছেন আল্লাহর ফেরেশতাগণ, কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর হুকুমে করেছেন, তাই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, এ ধ্বংসের কাজটি আমিই করেছি। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তাদের পাঁচটি বস্তি ছিল। তাতে প্রায় চার লক্ষ মানুষ বাস করত। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) চার লাখ মানুষের এ জনপদের নীচে তাঁর একটি ডানা রাখলেন এবং জনপদটিকে এতটুকু উপরে তুলে নিলেন যে, আসমানের ফেরেশতাগণ তাদের মোরগের ডাক পর্যন্ত শ্রবণ করলেন, এরপর তাকে উল্টিয়ে ছুঁড়ে মারলেন, ফলে তাদের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়েরের (রঃ) সূত্রে আলোচ্য ঘটনার এ বিবরণই দিয়েছেন।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ

আর আমি তাদের উপর অনবরত পাথর বর্ষণ করি, বৃষ্টির ন্যায় কংকর বর্ষণের কারণে এ অপরাধী জাতির আর কেউ বেঁচে রয়নি।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, প্রথমে পাথর এবং পরে কাঁদা মাটি বর্ষণ করা হয়। কাতাদা (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের سِجِّيْلٍ শব্দটির অর্থ হল কাঁদা। আর হাসান (রঃ) বলেছেন, পাথরগুলো মূলতঃ কাঁদা মাটি দ্বারা তৈরী ছিল। অর্থাৎ কাদামাটি শুষ্ক হওয়ার পর তা পাথরে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল পাকা ইট।

مَّنْضُوْدٍ

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, অবিরাম বর্ষণ অর্থাৎ দূরাত্মা কাফেরদের উপর আসমান থেকে বিরামহীনভাবে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ

পাথরগুলোতে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে চিহ্ন ছিল অর্থাৎ এ পাথরগুলো আযাবের পাথর হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এবনে জোরায়েয (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ পাথরগুলোতে বিশেষ আলামত ছিল যা দ্বারা বোঝা যেত যে, এগুলো দুনিয়ার পাথর নয়।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, এ পাথরগুলোতে একটি লাল বর্ণের রেখা অঙ্কিত ছিল। হাসান (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি পাথরের উপর তার লক্ষ্য ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল অর্থাৎ যে পাথর দ্বারা যে কাফেরের মৃত্যু হবে সে কাফেরের নাম পাথরে লিপিবদ্ধ ছিল। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ পাথরগুলো ছিল অনেক বড় এবং ওজনে ছিল ভারী। আর তাদের উপর একের পর এক বর্ষিত হচ্ছিল এবং যার উপর যে পাথর নিক্ষিপ্ত হবে তার নাম ঐ পাথরে লিখিত ছিল। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, আল্লাহ পাক তাকে সেখানেই ধ্বংস করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, সেখানে চারটি বস্তি ছিল, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় বস্তির নাম ছিল সদুম।[১]

وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ

পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

"পাপীষ্ঠদের থেকে ঐ বস্তি খুব দূরেও নয়"। এ কথাটির একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছেঃ

১. হযরত লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ জাতির ধ্বংসের এ ঘটনা খুব দূর অতীতের নয়, বরং হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি এবং আদ ও সামুদ জাতির শাস্তির পরই এ ঘটনা ঘটে।

২. কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াতে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী এ মর্মে যে, লুত (আঃ)-এর জাতির ধ্বংসের এ ঘটনা যে এলাকায় ঘটেছে তা মক্কা থেকে খুব দূরেও নয়, তারা সিরিয়া গমনের সময় এই অপরাধীদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পারে এবং তাদের ধ্বংস দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

৩. যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর বিরোধিতা করেছিলো, তাদের থেকেও এই আযাব দূরে নয়; যে কোন সময় তাদের উপরও এ আযাব আপতিত হতে পারে, অতএব মক্কার দুস্কৃতকারীরাও যেন সাবধান হয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো কোপগ্রস্ত জনপদটি এ জালেমদের থেকে দূরে নয়। আলোচ্য আয়াতে মক্কার মুশরেকদেরকেই জালেম বলা হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৩৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৭৪-৭৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-১৮

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৭৫
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৯৯
* লুত (আঃ)-এর জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১৩-১৪

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা এ উম্মতের সকল জালেমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ (রঃ) লিখেছেন, কাতাদা (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। এমন অবস্থায় আয়াতের তাৎপর্য হবে, এ উম্মতের জালেমরাও পাথর বর্ষণের মাধ্যমে শাস্তির যোগ্য।

কাতাদা (রঃ) ও একরামা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক কোন জালেমকে এই পাথর সমূহ থেকে রক্ষা করেননি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এমন কোন জালেম নেই, যে এই পাথরগুলোর লক্ষ্যবস্তু নয়। প্রত্যেকে জালেমের উপর যে কোন সময় এই পাথর নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে জীব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে জীব্রাইল (আঃ) বলেছিলেন, আলোচ্য আয়াতে জালেম বলা হয়েছে আপনার উম্মতের জালেমদেরকে, কেননা কোন জালেম এমন নেই যে এই পাথরগুলোর লক্ষ্যবস্তু নয়। যে কোন সময় তার উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ রবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমরা যা কিছু শুনেছি তা হলো এই, প্রত্যেক জালেমের জন্যে এই পাথর তৈরী আছে এবং এ কথার অপেক্ষা করছে কখন কোন্ জালেমের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার আদেশ হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে জালেম বলে মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এরপর তিনি হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাইল (আঃ)-কে এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আপনার উম্মতের সকল জালেম।

ইমাম রাজী (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের هِيَ সর্বনামটি দ্বারা লুত (আঃ)-এর জাতির জনপদকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এই আযাবের ঘটনা যেখানে ঘটেছে তা মক্কার কাফেরদের থেকে খুব দূরেও নয়। কেননা এ জনপদটি ছিল সিরিয়াতে। আর তা মক্কার নিকটবর্তী এলাকা, কাফেররা ইচ্ছা করলে সিরিয়া গমনের সময় এ কোপগ্রস্ত জাতির ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখতে পারে এবং আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।[২]

আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ এ তথ্য উদঘাটন করেছেন যে, লুত (আঃ)-এর কোপগ্রস্ত জাতি সদুম এবং উমরা শহরে বাস করতো যা বর্তমানে জর্দানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঐ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩৯

এলাকাটিকে "মৃত সমুদ্র" বলা হয়। মক্কার কোরায়শগণ এ পথ দিয়েই সিরিয়া সফর করতো।

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ নাফরমানদেরকে যেখানে শাস্তি দেয়া হয়েছে সে স্থানটি মক্কা থেকে অতি দূরেও নয়।[১]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

"আর মাদীয়ানবাসীদের নিকট আমি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করি"।

আলোচ্য আয়াত থেকে এ পর্যায়ের ষষ্ঠ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে মাদীয়ানবাসীর হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়। তারা ছিল পূঁজিবাদী সম্প্রদায়। তাদের ধারণা ছিল যে কোনভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে সেজন্যে তারা মানুষের আমানতে খেয়ানত করতো, ওজনে কম দিত, প্রতারণা ও ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়েও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসী হতো। আর মূর্তি পূজা সহ অন্যান্য অনাচারেও তারা ছিল লিপ্ত।[২]

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন এবং শেরক পরিহার করার, ওজনে ফাঁকি দেয়া থেকে তওবা এস্তেগফার করার নির্দেশ দিলেন।

উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদীয়ান আর তাঁর নামানুসারেই হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জনপদের নামকরণ করা হয়।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

শোয়ায়েব বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। আর তোমরা ওজনে কম দিওনা, যেহেতু সকল সৎ কাজের কেন্দ্র বিন্দু হলো তৌহিদ, তাই হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সর্বপ্রথম তাদেরকে তৌহিদের ব্যাপারে তাগিদ করেছেন। এরপর তাদেরকে আমানতদারীর শিক্ষা দিয়েছেন।

إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) আরো বলেছেন, আমি তোমাদেরকে বেশ সমৃদ্ধশালী দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করছো। এমন অবস্থায় তোমরা আল্লাহকে ভুলে যেয়োনা, তাঁর অবাধ্য হয়োনা, যদি তা কর তবে তোমাদের সর্বনাশ অনিবার্য এবং তোমাদের ধ্বংস অবধারিত। এভাবে বর্তমান অবস্থার ন্যায় যদি তোমাদের পাপাচার অব্যাহত থাকে তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা আল্লাহর গজবে নিপতিত হবে।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৬

[২]। মাদীয়ানবাসী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১৫-১৬

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, মাদীয়ান শহরটি লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। তাবুক থেকে ছয় মঞ্জিল দূরে। এই মাদীয়ানেই ইতিপূর্বে আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল, হযরত মূসা (আঃ) যখন মিশর থেকে প্রথম একা বের হয়েছিলেন তখন এই শহরে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন একটি স্থানে অনেক লোকের ভীড়, যারা পানি নেয়ার জন্যে একত্রিত হয়েছিল, ঐ ভীড়ের থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে দু'টি মেয়ে পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু ভীড়ের কারণে কূপের কাছে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিনা।

হযরত মূসা (আঃ) কূপ থেকে তাদের জন্যে পানি তুলে দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যাদ্বয়। তারা স্বীয় পিতার নিকট হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা বললে, হযরত মূসা (আঃ)-কে তিনি তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং হযরত মূসা (আঃ) কেন এবং কিভাবে মিশর থেকে বের হয়েছেন সে ঘটনা জানতে পেরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁকে বললেন, আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন এবং তাঁর একটি কন্যাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট বিবাহ দিলেন। সুদীর্ঘ আট বছর হযরত মূসা (আঃ) এই মাদীয়ানেই অবস্থান করলেন। যখন মূসা (আঃ) মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন পথে কোহে তূরের পাদদেশে আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যত দানে ধন্য করলেন।

وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ

হযরত শোয়াবের (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে পাপাচার পরিহার করার তাগিদ করলেন এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক করে বললেনঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে এমন এক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি যা তোমাদের সকলকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে– যা তোমাদের সকলকে ধ্বংস করবে, তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিনের আযাব আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এতে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের আযাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১]

يَوْمٍ مُّحِيْطٍ

অর্থাৎ সেদিন অপরাধীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে অসহায় করে ফেলা হবে এবং আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে বাঁচার কোন পথই থাকবে না।

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

"হে আমার জাতি! পরিমাপ, ওজন ন্যায্য ভাবে পূর্ণ করে দিও আর মানুষকে তাদের জিনিষপত্র কম দিয়োনা"।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪০-৪১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৬

পূর্ববর্তী আয়াতে পরিমাপ, ওজনে কম দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এর দ্বারা পূর্ণ ওজন করার নির্দেশ ঘোষিত হলেও বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে পরিমাপে, ওজন পূর্ণ করার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পরিমাপে, ওজনে কম দেয়া থেকে আত্মরক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং পরিমাপ, ওজন পূর্ণ করে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা জরুরী, যদিও কিছু বেশী দিতে হয়।

এ পর্যায়ে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যদি কোন জিনিষ কেউ পরিমাপ করে বা ওজন করে ক্রয় করে, বিক্রেতা তাকে পরিমাপ করে বা ওজন করে দিয়ে থাকে, কিন্তু ক্রেতা যে পর্যন্ত নিজে তা পরিমাপ বা ওজন না করে সে পর্যন্ত ঐ বস্তুটি ব্যবহার করা অথবা বিক্রয় করা তার জন্যে বৈধ নয়।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন, যার বিবরণ হাদীস শরীফে রয়েছে।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। যদিও কোন কোন হাদীস বেত্তা এই হাদীসকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এবনে হুমাম লিখেছেন, যেহেতু এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাই ইমামগণ তা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ) সকলেই এ সম্পর্কে একমত। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেন যে, ওজন করে দেয়ার সময় পাল্লা যেন কিঞ্চিত ঝুঁকে থাকে (অর্থাৎ পরিমাপের বস্তু যেন সমান সমান হওয়ার চাইতে একটু বেশী হয়) কেননা, নবীগণ এভাবেই পরিমাপ করেন।[১]

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"আর মানুষকে তাদের মালপত্র কম দিওনা"। ইতিপূর্বে ওজনে বা পরিমাপে কম না দেয়ার নির্দেশ ছিল। আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, মানুষকে কোন জিনিসই কম দিওনা।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা"। যেহেতু মানুষের হক্ব বিনষ্ট হলে, পরস্পরের প্রতি জুলুম হলে, আমানতে খেয়ানত করা হলে সমাজ ও জাতীয় জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়, তাই প্রথমে ওজনে ফাকি না দেয়ার, ছল-চাতুরী না করার নির্দেশ রয়েছে, আর আলোচ্য বাক্যে কোনভাবেই সমাজ ও জাতীয় জীবনে অশান্তি সৃষ্টি না করার তাগিদ করা হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৭

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি শুধু যে ওজনে বা পরিমাপে ফাঁকি দিত তাই নয়; বরং তারা আমানতে খেয়ানত করতো এবং ডাকাতি, রাহজানী করতেও তারা ছিল অভ্যস্ত, তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় তাগিদ করা হয়েছে– "মানুষের হক্ব বিনষ্ট করোনা, সমাজ ও জাতীয় জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করোনা"।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হক্ব এবং বন্দার হক্ব সঠিকভাবে আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই তোমাদের জন্যে উত্তম। পরের হক্ব আত্মসাত করে সম্পদশালী হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। পরের হক্ব নষ্ট না করা হল ঈমানের দাবী। যারা এ দাবী পূরণ করে তারাই সত্যিকার মোমেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল, আল্লাহর বিধান যা কিছু তোমাদের জন্যে বৈধ ঘোষণা করেছে তাই তোমাদের জন্যে উত্তম। ইসলামী শরীয়ত যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তাতে তোমাদের ক্ষতি ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই।

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

যাহোক, আমি তোমাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার দায়িত্ব পালন করলাম, তোমাদের যা করণীয় তা বলে দিলাম। তোমাদেরকে সৎ কাজে বাধ্য করার দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পিত হয়নি। আমি শুধু তোমাদের জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। আমি তোমাদের সংরক্ষণকারী নই, তোমাদের প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের দায়িত্ব তোমাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। ভাল কথা বা কাজ হলে তোমরাই তার ফল ভোগ করবে, আর মন্দ কথা বা মন্দ কাজ হলে তার ভয়াবহ পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। একভাগ হল যাঁদের প্রতি জালেমদের বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ হয়েছে যেমন, হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং সর্বশেষে ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম। আম্বিয়ায়ে কেরামের আর একভাগ হলেন তাঁরা, যাঁদের প্রতি জেহাদ ফরজ হয়নি, মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়াই ছিল তাঁদের দায়িত্ব। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি জেহাদের হুকুম ছিলনা। তিনি সারা দিন মানুষকে নসিহত করতেন এবং সারারাত নামায আদায় করতেন।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৭

[২]। তফসীরে রুহুল বয়ান খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৭৯

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ
فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ
يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ
عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا
تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

তরজমা

(৮৭) তারা বলে হে শোয়ায়েব! তোমার নামায কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের পিতৃ পুরুষরা যাদের উপাসনা করতো আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করি। আর আমাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা কিছু করি তাও বর্জন করি? নিশ্চয় তুমি বড় ভদ্র, সম্ভ্রান্ত।

(৮৮) শোয়ায়েব বললেন, হে আমার জাতি। তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি আমি আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে বিচার বুদ্ধি লাভ করে থাকি, আর তিনি যদি আমাকে তাঁর নিকট থেকে উত্তম জীবিকা দান করে থাকেন (তবে কি আমি তাঁর বিধি-নিষেধ অমান্য করতে পারি?) আমি চাইনা যে, তোমাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করি পরে নিজেই সে কাজ করি।

আমিতো শুধু যথাসাধ্য সংশোধনই করতে চাই। আর শুধু আল্লাহ পাকের সাহায্য দ্বারাই কাজ হয়ে থাকে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই নিকট আমি ফিরে যাব।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি তাঁর কথার জবাব দিয়েছে। তিনি তাদেরকে দু'টি বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ

(১) তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন,

(২) ওজন বা পরিমাপে মানুষকে তাদের সম্পদ ন্যায্য ভাবে প্রদান।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর এ কথার জবাবে তারা তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করলো। যেহেতু তিনি অনেক বেশী নামায আদায় করতেন এজন্যে নামাযের ব্যাপারেই এই

নাফরমান জাতি বিদ্রুপ করে বললো, হে শোয়ায়েব! তুমিতো অনেক সময় নামাযে রত থাক। তোমার নামাযই কি এ আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিহার করি, তারা যে দেব-দেবীর পূজা করতো তা আমরা বর্জন করি? আমরা আমাদের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে যে সব পন্থা অবলম্বন করে থাকি তাও পরিত্যাগ করি?

আমাদের ধন-সম্পদ ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ কি তোমার নামাযই তোমাকে দেয়? আর সমগ্র জাতির মধ্যে তুমিই কি একজন সাধু ব্যক্তি রয়ে গেলে? আর সকলেই কি অসৎ, অসাধু? এভাবে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর পথভ্রষ্ট জাতি তাঁর প্রতি এবং তাঁর নসিহতের প্রতি কটাক্ষ করে।

মূলতঃ এটি হলো তাদের কুফরী ও নাফরমানীর পরিণতি। সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা যখন মানুষ হারিয়ে ফেলে তখন এ অবস্থাই হয়।

এ যুগেও পুঁজিবাদী নীতিতে যারা বিশ্বাস করে তারা শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির মত কথা বলে। তারা বলে আমরা আমাদের পুঁজির মালিক। তার আয় এবং ব্যয়ে আমরা স্বাধীন। হালাল হারাম, বৈধ অবৈধ বলে অর্থ-সম্পদের ব্যবহারে আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করা যাবেনা। আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমাদের মূলধন বৃদ্ধির যে কোন পন্থা অবলম্বনের অধিকার আমাদের রয়েছে। অতএব, এ অধিকার খর্ব করার চেষ্টা তুমি করোনা। অথচ ইসলামী শরীয়ত বলে যে, নিঃসন্দেহে তুমি তোমার সম্পদের মালিক কিন্তু তোমাদের অস্তিত্ব এবং তোমাদের যথাসর্বস্বের মূল মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই তুমি অস্তিত্ব লাভ করেছ। তিনি দান করেছেন বলেই তুমি সম্পদশালী হয়েছ। জন্মকালে তুমি কিছুই সঙ্গে আননি, মৃত্যুকালে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেনা, আল্লাহর দান আল্লাহর দুনিয়াতেই পড়ে থাকবে, মালিক হবে ওয়ারিষগণ। এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান যে, তুমি এবং তোমার যথা সর্বস্ব সারা পৃথিবী এবং তার সবকিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। অতএব, তাঁর বিধান মেনে চলা, তাঁর বিধান মোতাবেক আয় এবং ব্যয় করা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। দূরাত্মা কাফেরদের অন্যায় কথার জবাব পবিত্র কোরআনেই রয়েছেঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

নামায মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে

"নিশ্চয় নামায সকল অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"। আর এজন্যেই হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নামায তাঁকে অনুপ্রাণিত করতো যেন তিনি সত্যের নির্দেশ প্রদান করেন এবং অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্যে চেষ্টা করেন।[১]

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু হযরত শোয়ায়েব (আঃ) অধিক সময় নামাযে রত থাকতেন তাই কাফেররা তাঁর নামাযের প্রতি কটাক্ষ করেছে। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর জাতিকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করেছে এবং বলেছে, হে শোয়ায়েব! তোমার নামাযই কি

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৭৯-৮০

আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার পূজনীয় দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করি এবং আমাদের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে ওজনে কম দেয়ার নীতি বর্জন করি?[১]

হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নামাযই তাঁকে আদেশ দেয় যে, তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর এবাদত করতে নিষেধ করেছেন এবং মানুষ থেকে তার হক্ব ছিনিয়ে নিতে বাঁধা দিয়েছেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির কথার অর্থ হলো আমরা আমাদের সম্পদের ব্যাপারে যা খুশী তাই করবো, তুমি বাঁধা দেবে কেন? আর আমাদের অর্জিত সম্পদের যাকাত কেন আদায় করবো?[২]

إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

"নিশ্চয় তুমিই বড় ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত"।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, কাফেররা তাঁকে কটাক্ষ করেই এ কথাটি বলেছে। এ বাক্যটির যা অর্থ তার ঠিক উল্টোটা তারা উদ্দেশ্য করেছে। যেমন কোন কৃপণ লোককে বিদ্রুপ করে বলা হয় "আপনি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর"। তবে তার অর্থ হলো ঐ কৃপণকে বিদ্রুপ করা এবং তাকে বলা যে, আপনি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপণ। ঠিক এমনিভাবে কাফেররা তাঁকে যা বলেছে তা হলো আপনি নির্বোধ এবং মূর্খ।

অথবা এর অর্থ হলো, আপনার ধারণায় আপনি অত্যন্ত ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত।[৩]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কাফেরদের এ উক্তিটি তারা পরিহাস করে বলেনি এবং যা বাস্তব তাই বলেছে। এমন অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে এই– "আমরা জানি আপনি অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ ব্যক্তি, এমন অবস্থায় আপনি এসব কি বলছেন? এমন কথাতো আমরা আপনার নিকট কোন দিন আশা করিনি"।[৪]

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এ বাক্যটি দ্বারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিদ্রুপ করেছে এবং কাতাদাও (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।[৫]

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের কথার জবাবে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা একটু ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ পাক যদি আমাকে সুস্পষ্ট দলিলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে থাকেন এবং আমাকে বিচার-বুদ্ধি দান করে থাকেন এবং ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা দান করে থাকেন এবং আমাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন এবং আমাকে হালাল ও

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৯
খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮২
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩০
[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪৪
[৪]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩০০
[৫]। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১১৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৯

উত্তম রিয্ক দান করে থাকেন এবং তাঁর নবুওয়্যতের মহান মর্যাদায় আমাকে অভিষিক্ত করে থাকেন, তাই এমন অবস্থায় আমি তোমাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে নিজেকে ধ্বংস করতে পারিনা। তোমরা যেহেতু অন্ধ, তাই আমার এ মর্যাদা তোমরা দেখতে পাওনা। কিন্তু আমি তোমাদের ন্যায় অন্ধ হতে পারি না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "রিয্ক" শব্দ দ্বারা নবুওয়্যত ও হেকমত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো উৎকৃষ্ট, পবিত্র, হালাল রিয্ক। কেননা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বিরাট সম্পদের অধিকারী ছিলেন। অথবা এর অর্থ হলো এলম ও মা'রেফাত।[১]

ইমাম রাজী (রঃ)-এর মতে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, শোয়ায়েব (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে নবুওয়্যত দানে ধন্য করেছেন এবং নবুওয়্যতের দলিল স্বরূপ মোজেযা দান করেছেন এবং উত্তম, হালাল ও অনেক রিয্ক দান করেছেন যার জন্যে আমাকে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করতে হয়নি।

এভাবে আল্লাহ পাক আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন এবং তিনিই আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদের নিকট সত্য বাণী পৌঁছে দেই। এমনি অবস্থায় আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা এবং তাঁর তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা অর্থাৎ আমার পক্ষে তা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এভাবে তাঁর অবাধ্য জাতিকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছেনঃ

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ

আর মনে রেখো, আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলি তা নিজেই করি। আর তোমাদেরকে যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলি তা থেকে আমি নিজেও বিরত থাকি। আমার কথা এবং কাজে তোমরা কোন প্রকার অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাবে না।

আমি তোমাদেরকে বলেছি ওজন পরিমাপ সঠিক দিও, মানুষের হক্ব বিনষ্ট করোনা, মানুষকে প্রতারিত করোনা। আমি নিজে একথার বরখেলাফ করবো তা হয়না, কখনও হবে না।

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

আমি যে শেরক থেকে তোমাদেরকে আত্মরক্ষা করতে বলি এবং ওজনে পরিমাপে কম না দিতে বলি, এতে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তোমাদের এবং সারা বিশ্বের মানুষের সংশোধন করা। তোমরা আত্মসংশোধন করে আত্মোন্নতি লাভ কর, এটিই আমার কাম্য। আর তোমাদের কল্যাণ সাধনই আমার লক্ষ্য। আমি এ লক্ষ্য থেকে কোন

[১]। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৯
খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮২

অবস্থাতেই বিচ্যুত হতে পারবো না। তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব।

وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ

আর এ কাজে আমার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত এ কাজ সম্ভবও নয়, অর্থাৎ কল্যাণকর কাজের জন্যে উপকরণ সরবরাহ করা, শক্তি সামর্থ প্রদান করা আল্লাহ পাকেরই কাজ। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাঁকে এ তৌফিক দান করেন, আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক দান করেছেন বলেই আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব হচ্ছে।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

আমি এক আল্লাহর প্রতিই ভরসা করেছি। আর তাঁর দিকেই আমি মনোনিবেশ করেছি, অবশেষ তাঁর নিকটই আমি ফিরে যাব অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি ব্যতীত সব কিছুই অসহায় নিরূপায়, তাই আমি তাঁর প্রতিই ভরসা করি। আর সকল বালা-মসিবত এবং বিপদাপদে আমি এক আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করি।

وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

এর অর্থ হলো মৃত্যুর পর আমি তাঁর নিকটই ফিরে যাব। আমি আল্লাহ পাকের নিকটই সর্বাবস্থায় সাহায্য কামনা করি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের বর্ণনা-শৈলীতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি তোমাদের বিরোধিতাকে ভয় করিনা। আমি আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে রেখেছি। তাঁর প্রতিই আমার ভরসা। এ আয়াতে কাফেরদের জন্যে সতর্কবাণী রয়েছে এ মর্মে যে, অবশেষে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে, তোমাদের অন্যায় অনাচারের জন্যে তোমাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮০-৮১

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ
قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ
بِبَعِيْدٍ ۝۸۹ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ
وَّدُوْدٌ ۝۹۰ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا
لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۡ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيْزٍ ۝۹۱ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَ
اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝۹۲

তরজমা

(৮৯) হে আমার জাতি! আমার সাথে বিরোধ কিছুতেই যেন তোমাদেরকে এমন অন্যায় না করায় যার কারণে তোমাদের উপর সেই বিপদ আপতিত হবে যা হয়েছিলো নূহের জাতির উপর এবং হুদ ও সালেহের জাতির উপর। আর লুতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়।

(৯০) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর দিকে ফিরে আস, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু, খুবই স্নেহময়।

(৯১) তারা বললো, হে শোয়ায়েব! তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝিনা, আমরা তো তোমাকে আমাদের মাঝে দুর্বলই দেখতে পাই, তোমার ভাই বেরাদার না থাকলে আমরাতো তোমাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরেই ফেলতাম, আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।

(৯২) শোয়ায়েব বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের নিকট কি আমার ভাই বেরাদর আল্লাহ পাকের চেয়েও অধিক শক্তিশালী? তোমরা (তাঁকে বিস্মৃত হয়ে) সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তোমাদের কার্যাবলীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

তফসীরুল কোরআন

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর জাতিকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা আমার প্রতি শত্রুতা করে এমন অন্যায় কাজ করোনা যার পরিণতি হবে ভয়াবহ, তোমাদের পূর্বে যারা আল্লাহর নবীগণের সাথে শত্রুতা করেছে, তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়েছে। হযরত নূহ

(আঃ)-এর জাতি, হযরত হুদ (আঃ) এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির ন্যায় তোমরাও যদি অন্যায়-অনাচার পরিহার না কর, তবে তোমরাও কোপগ্রস্ত হবে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল তাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ

আর লুত (আঃ)-এর জাতির ধ্বংসের কথাতো তোমাদের অজ্ঞাত নয়। কেননা, এ ঘটনা দূর অতীতেরও নয়, বরং সময়ের দিক থেকে তা তোমাদের অতি নিকটবর্তী, অথবা স্থানের দিক থেকেও তাদের স্থান তোমাদের থেকে দূরে নয়। মাদীয়ান লুত (আঃ)-এর জনপদের নিকটবর্তীই ছিল। অতএব, আল্লাহর নাফরমানীর পরিণতি কত ভয়াবহ হয় তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার।[১] প্রলয়ংকরী বন্যা, ঝড়-তুফান-ভূমিকম্প, ফেরেশতাদের গর্জন-এসব আযাবের মাধ্যমেই ইতিপূর্বে বিভিন্ন জাতি নিষ্পেষিত এবং সর্বস্বান্ত হয়েছে। আমার বিরোধিতা যেন তোমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ন্যায় ধ্বংস না করে দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ।

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ

অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শেরকের গুনাহর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এতদ্ব্যতীত অতীতে যা কিছু অন্যায়-অনাচার তোমাদের দ্বারা হয়েছে এমন সমস্ত গুনাহ থেকে তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হও, তাঁর প্রতি ঈমান আন, পূর্বে কৃত যাবতীয় গুনাহর জন্যে অনুতপ্ত হও।

ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ

এরপর আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন কর এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। যদি কোন পাপী অপরাধী ব্যক্তি কৃত অন্যায় থেকে তওবা করে আত্মসংশোধন করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর রহমতের কোলে তাকে স্থান দেন।

اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম করুণাময় ও অত্যন্ত স্নেহময়। তিনি মোমেনদের তওবা কবুল করেন, মোমেনদেরকে তিনি ভালবাসেন।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছেন যেন তারা কুফরী ও নাফরমানী পরিহার করে। পরে যদি তারা তওবা করে তবে মাগফেরাত দানের আশায় আশান্বিত করেছেন। মূলতঃ এটিই হল নবীর কাজ-রহমতের আশায় আশান্বিত করা এবং আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪৭

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কথার জবাব দিতে তারা অক্ষম হল, তাই মূর্খতা এবং শত্রুতার কারণে তারা বললো, হে শোয়ায়েব! আমরা তোমার অনেক কথাই বুঝতে পারিনা, তোমার তৌহিদের কথাও আমরা বুঝতে পারিনা, সঠিক ওজন, পরিমাপের কথাও আমরা বুঝিনা। আর তোমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যে সব দলিল প্রমাণ তুমি উপস্থাপন কর, সেগুলোও আমাদের বোধগম্য হয়না।

وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

এতদ্ব্যতীত, তোমাকে আমরা দুর্বল দেখতে পাই। যদি কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তবে তুমি তার প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তারপরও তোমার দুঃসাহস এত বেশী যে, তুমি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে কথাবার্তা বল। যদি তোমার ভাই-বেরাদর আত্মীয়-স্বজনের ভয় না থাকতো তবে আমরা এত দিনে পাথর মেরেই তোমাকে শেষ করে দিতাম।

শোয়ায়েব (আঃ) অধিক পরিমানে কাঁদতেন

আলোচ্য আয়াতে ضَعِيْفًا শব্দটির অর্থ হলো দুর্বল। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বোঝানো হয়েছে। কেননা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অধিক পরিমাণে কাঁদতেন এবং অধিক কান্নার কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিরহের কারণে অধিক কান্নাকাটি করায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, ঠিক এমনিভাবে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এরও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কেননা তিনি কান্নাকাটি করতেন অত্যন্ত বেশী।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় হে শোয়ায়েব! এত ক্রন্দন কেন কর? বেহেশতের লোভে না দোযখের ভয়ে? হযরত শোয়ায়েব (আঃ) আরজী পেশ করেন, আমার কান্নাকাটি বেহেশত বা দোযখের জন্যে নয়, বরং শুধু তোমার দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষায়, কেয়ামতের দিন যখন অন্যরা তোমার দিদার লাভে ধন্য হবে, আমি জানিনা তোমার দিদার কি আমার নসিব হবে?

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এরশাদ হয়, যে শোয়ায়েব! তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তুমি আমার দিদার লাভে ধন্য হবে। এজন্যেই মূসাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত করেছি।

বর্ণিত আছে যে, পরবর্তীতে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন।[১]

---

[১]। ফাওয়ায়েলে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩০০

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ ضَعِيْفًا শব্দটির আরো একটি অর্থ হলো, সমাজে তোমার তেমন কোন মর্যাদা নেই।

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ

যদি তোমার ভাই বেরাদর আত্মীয়-স্বজন না থাকতো তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরেই শেষ করে দিতাম। তোমার বংশ এবং গোত্রের সম্মানার্থেই তোমাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তিনি তাদেরই হেফাজতে ছিলেন। তারা তাঁকে বললো, তোমার গোত্রের লোকদের সম্মান এবং মর্যাদা আমাদের দৃষ্টিতে রয়েছে। যদি তা না হতো তবে তোমাকে পাথর মেরেই শেষ করে দিতাম।

رَهْطٌ তিন থেকে দশ ব্যক্তির দল সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অথবা যে দলে সাতজন থাকে তাকে "রাহতুন" বলা হয়।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যে দলে দশ জনের কম থাকে তাকে "রাহতুন" বলা হয় আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ৪জন পর্যন্ত হলেও "রাহতুন" বলা হয়।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যে দলে দশ জনের কম লোক থাকে যাতে কোন স্ত্রীলোক থাকে না তাকে "রাহতুন" বলা।

আর আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ "কামুসে" রয়েছে, এ শব্দটি এমন এক দল লোক সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় যাদের সংখ্যা তিন থেকে দশ জন হয়ে থাকে এবং যেখানে কোন স্ত্রীলোক থাকেনা।

وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ

"আর তুমি আমাদের মাঝে কোন সম্মানিত ব্যক্তি নও, যাকে পাথর বর্ষণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যারা মূর্খ এবং নির্বোধ তারা যখন দলিল-প্রমাণের জবাবে দলিল-প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয় তখনই গালি এবং ধমকীর পথ অবলম্বন করে। আর এ কারণেই হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি দলিল-প্রমাণের পথ পরিহার করে শক্তির ভাষা ব্যবহার করেছে এবং বলেছে শক্তি আমাদের হাতে রয়েছে। আমরাতো শুধু তোমার গোত্রের এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনের দিকে লক্ষ্য করে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করিনি, অন্যথায় তোমাকে বহু পূর্বেই শেষ করে দেয়া হতো।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের জবাবে বললেন, অত্যন্ত পরিতাপ এবং বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনের কারণে আমার প্রতি জুলুম অত্যাচার থেকে

বিরত রয়েছ এজন্যে নয় যে, আমি আল্লাহ পাকের নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি এবং নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসেছি।

أَرَهْطِيٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ

আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব কি আল্লাহ পাকের থেকেও অধিকতর মনে হয়? তোমরা আমার গোত্র এবং বংশের গুরুত্ব উপলব্ধি করলে কিন্তু যে আল্লাহ পাক আমাকে রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করলেন এবং আমার নবুওয়্যতের সত্যতার জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দান করলেন তাঁর প্রতি লক্ষ্য করলে না! তোমাদের আচরণে একথা প্রমাণিত হয় যে, তোমরা আল্লাহ পাকের আদেশকে বিস্মৃত করে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ যেন তাঁর সঙ্গে কোন দিনও তোমাদের কোন পরিচয়ই ছিল না। মনে রেখো, এর ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী আমার প্রতিপালকের আয়ত্ত্বে রয়েছে"।

একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো তোমাদের সব কিছুই আল্লাহ পাকের সম্মুখে রয়েছে, তোমরা সকলে, তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। তোমরা যত শক্তিশালীই হওনা কেন, আর যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ পাকের আয়ত্ত্বের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমাদের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের দরবার থেকে গোপন নেই। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি কত ভয়াবহ।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বললো হে শোয়ায়েব! আমরা তোমার অনেক কথাই বুঝিনা। তাছাড়া তুমি নিজেও একজন দুর্বল মানুষ।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে তাঁর লোকেরা এজন্যে দুর্বল বলেছে যে তিনি একা ছিলেন, তাই তারা তাঁকে নিতান্ত অসহায় মনে করতো। এতদ্ব্যতীত তাঁর গোত্রের লোকেরাও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাই দূরাত্মা কাফেররা তাঁকে বললো, তোমার আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে তোমার কোন শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করছিনা, তা না হলে পাথর মেরে অনেক আগেই তোমাকে শেষ করে দিতাম। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ছিলেন ঈমানের বলে বলীয়ান, তাদের এসব হুমকি ধমকী তাঁর অন্তরে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়নি। তাই তিনি ছিলেন সর্বদা নির্ভীক, তিনি তাদেরকে বললেন, অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমরা আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে ছেড়ে দিচ্ছ অথচ আমি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের রসূল, এ কারণে তোমরা ভয় করছো না। তোমাদের জন্যে শত আক্ষেপ যে, তোমরা বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৪

আদেশকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ, তাঁকে ভুলে গেছ, তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্য নেই। যাহোক, আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তোমরা তাঁর কর্তৃত্বাধীন, আল্লাহ পাক যথাসময়ে তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেবেন।[১]

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ
مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۙ﴿٩٤﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا
بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى
بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿٩٦﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾

তরজমা

(৯৩) আর হে আমার জাতি! তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানজনক শাস্তি আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

(৯৪) আর যখন আমার হুকুম আসলো, আমি শোয়ায়েব এবং তার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার রহমতে রক্ষা করলাম। এরপর জালেমদেরকে ভীষণ গর্জন আক্রমণ করে। ফলে তারা ভোর না হতেই নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

(৯৫) যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি। জেনে রাখ ধ্বংসই ছিল মাদীয়ানবাসী লোকদের পরিণাম, যেমন ধ্বংস হয়েছিল সামুদ জাতি।

(৯৬) আর মূসাকে আমার নিদর্শন সমূহ সহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করি।

(৯৭) ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট, কিন্তু তারা ফেরাউনের হুকুমে চলে আর ফেরাউনের মত সঠিক ছিলনা।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩১-৩২

তফসীরুল কোরআন

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে সরল সঠিক পথে পরিচালনা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের জেদ, হটকারিতা এবং শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। এমন অবস্থায় তিনি তাদেরকে শেষ কথা বললেন এভাবেঃ

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ

হে আমার জাতি! তোমরা নিজের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার পন্থায় কাজ করে যাচ্ছি। আল্লাহ পাকের রহমতে আমি সরল সঠিক পথেই অটল রইলাম। অচিরেই তোমরা উপলব্ধি করবে যে, কে সত্যের উপর রয়েছে আর কে মিথ্যাবাদী? আর কার প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত ও দয়া রয়েছে আর কার উপর অপমানজনক শাস্তি আপতিত হয়েছে?

অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং দেখ তোমাদের কার্যকলাপের পরিণতি কি হয়? নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি, অর্থাৎ তোমাদেরকে যে আযাবের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করেছি তা শুধু কথার কথা বা শুধু মৌখিক ধমকি নয়; বরং অত্যন্ত কঠোর বাস্তব। আর এ সত্য তোমরা অচিরেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে, আসমানী সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা কর।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا

আর যখন মাদীয়ানবাসীর উপর আল্লাহর আযাব আসলো–

نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

তখন আমি শোয়ায়েব এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে আমার রহমতে রক্ষা করি এবং ভীষণ গর্জন জালেমদেরকে পাকড়াও করে। পরিণামে তারা ভোর না হতেই শেষ হয়ে যায় এবং ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, কালবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আল্লাহ পাক সাধারণত দু' জাতিকে একই শাস্তি দেননা, কিন্তু এ পর্যায়ে ব্যতিক্রম ঘটেছে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির ব্যাপারে। কেননা উভয় জাতিকেই একই শাস্তি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ভীষণ গর্জনের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে শুধু এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে গর্জন এসেছিল নিচের দিক থেকে আর হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির ধ্বংসের জন্যে গর্জন এসেছিল উপরের দিকে থেকে।[১]

نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

"আমি শোয়ায়েব এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে আমার রহমতে রক্ষা করি"।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫১

আলোচ্য আয়াতে একদিকে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ জাতিকে ধ্বংস করার খবর রয়েছে, অন্যদিকে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করার সুসংবাদও রয়েছে। তবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে ও দয়ায় শোয়ায়েব (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত কারোই কোন গত্যন্তর নেই।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে রহমত অর্থ যেমন সরাসরি আল্লাহর দয়া ও করুণা হতে পারে, ঠিক তেমনি রহমত অর্থ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং যাবতীয় নেক আমলও হতে পারে। কিন্তু ঈমান এবং নেক আমলও আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত সম্ভব নয়।

অতএব, আল্লাহ পাকের দয়ামায়া এবং নেক আমলের জন্যে তাঁর তৌফিক ব্যতীত নাজাত হাসিল করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।[১]

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি মাদীয়ানবাসীর উপর যে আযাব এসেছিল পবিত্র কোরআনে তার একাধিক বিবরণ এসেছে। যেমন আলোচ্য আয়াতে الصيحة (ফেরেশতাদের গুরু গর্জন) বলা হয়েছে আর رجفه যার অর্থ হলো ভূমিকম্প, ব্যবহৃত হয়েছে সূরা আরাফে আর সূরা শোয়ারাতে উল্লেখিত হয়েছে–

عذاب يوم الظلة

অর্থাৎ "মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব" তথা যে মেঘ আযাব হিসেবে তাদের উপর উপস্থিত হয়েছিল। তফসীরকারগণ লিখেছেন, উপরোক্ত বিভিন্ন বর্ণনায় কোন বিরোধ নেই। কেননা, তিন প্রকার আযাবই একই সাথে তাদের উপর নাযিল হযেছিল, বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ঐ আযাব সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ জাতি যে এলাকা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করার হুমকি দিয়েছিল, সেখানেই ভূমিকম্প হয় এবং এ পাপীষ্ঠ প্রসম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়।

দূরাত্মা কাফেররা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে তর্জন গর্জন করে বেয়াদবি করেছিল, তাই হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর গর্জনে তাদের বুক ফেটে যায় এবং ক্ষণিকের মধ্যেই সমগ্র জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর সূরা শোয়ারায় এরশাদ হয়েছে যে, এই অপরাধী জাতি আল্লাহর নবীকে উপহাস করে বলেছিলঃ "আমাদের প্রতি আকাশ খন্ড পতিত করার জন্যে দোয়া কর"। এ ধৃষ্টতার কারণেই তাদের উপর আল্লাহর গজবের মেঘ উপস্থিত হয়েছিল, এভাবে এই অপরাধী জাতি ধ্বংস হয়েছিল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

"যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে মহা গর্জন আক্রমণ করে এবং ভোর না হতেই তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে তথা চিরতরে শেষ হয়ে যায়"।[২]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫২
[২]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩০১

বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হঠাৎ এত ভীষণ গর্জন করেন যার কারণে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির সকল লোক ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। অথবা আসমান থেকে এমনি ভয়ংকর গর্জন শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আর এভাবে তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়–

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا

"যেন তারা কোন দিন এখানে ছিলনা"। আর তাদের বাড়ী-ঘর হয়ে যায় বিরাণ।

أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

"মনে রেখো এবং শিক্ষা গ্রহণ কর যেভাবে সামুদ জাতি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং ধ্বংস হয়েছিল, ঠিক এমনিভাবে মাদীয়ানবাসীও সর্বস্বান্ত হয়েছে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া তথা অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্য যে কোন অভিশপ্ত জাতির সাথে মাদীয়নবাসীর দৃষ্টান্ত দেয়া যেত। কিন্তু এ পর্যায়ে বিশেষভাবে সামুদ জাতির উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ হয়েছে–

সামুদ জাতির ধ্বংসও মাদীয়ানবাসীর ধ্বংসের ন্যায় ফেরেশতাদের গর্জনের মাধ্যমে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ সামুদ জাতিও ইতিপূর্বে এ এলাকাতেই বাস করত। তাদের ধ্বংসের কথা মদীয়ানবাসী অবশ্যই জানতে পেরেছিল। কিন্তু সামুদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মাদীয়ানবাসীও সামুদ জাতির ন্যায় আরব ছিল এবং মাদীয়ানবাসীও সামুদ জাতির অনুরূপ অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত ছিল। এজন্যে সামুদ জাতিকে যে পন্থায় ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক একই পন্থায় মাদীয়ানবাসীকেও ধ্বংস করা হয়েছে। এক কথায় উভয় জাতিকেই ভীষণ গর্জনের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।[১]

তবে একই প্রকার আযাব হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা পার্থক্য ছিল। সামুদ জাতিকে ধ্বংস করার সময় গুরু গর্জন শুরু হয়েছিল জমীন থেকে, আর শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করার সময় গর্জন এসেছিল আসমান থেকে।[২]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

"আর আমি মূসাকে প্রেরণ করি আমার নিদর্শন সমূহ এবং প্রকাশ্য সনদ সহ"।

এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে এটি হল সপ্তম ঘটনা এবং এ সূরায় বর্ণিত সর্বশেষ ঘটনা। এ ঘটনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় কোন রাজশক্তি, ধন-শক্তি, জনশক্তি এক কথায় কোন কিছুই কাজে আসেনা। এ সত্য উপলব্ধি করার জন্যে আলোচ্য ঘটনার অবতারণা।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৭৯
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৫

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে অনেক নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়ে ফেরাউন এবং তার দলবলের নিকট প্রেরণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে নিদর্শন বলতে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিস্ময়কর মোজেযা সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা হল তাঁর লাঠি। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সম্ভবত মূসা (আঃ)-এর লাঠির এ মোজেযাকেই سلطٰن مبين শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা ফেরাউনের সম্মুখে হযরত মূসা (আঃ) তৌহিদের যে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তা উদ্দেশ্য হতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) سلطٰن مبين এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রাধান্য। কেননা হযরত মূসা (আঃ) একা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল ফেরাউন ও তার বিরাট সৈন্য বাহিনী। হযরত মূসা (আঃ)-কে তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করেছেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন। ফেরাউন এবং তার দলবলকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে চিরতরে ধ্বংস করেছেন।

فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখা সত্বেও ফেরাউন ও তার দলবল তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি; বরং তারা ফেরাউনের অনুসরণই করে অথচ ফেরাউনের মত এবং তার বিধি-নিষেধ সঠিক ছিলনা। তার নাফরমানী চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। এ আয়াতে ফেরাউনের দলবলের পথভ্রষ্টতা এবং মূর্খতার কথা বলা হয়েছে। ফেরাউন তাদের মত একজন সাধারণ মানুষই ছিল। অন্যায় অনাচার, কুফর ও শেরকে লিপ্ত ছিল। এমনকি, সে খোদায়ী দাবী করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার মূর্খ সম্প্রদায় তারই অনুসরণ করতো।

পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী, সত্যের আহবায়ক, সত্যেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন সর্বক্ষণ সাধনায় রত, আল্লাহ পাক তাঁকে অনেক বিস্ময়কর মোজেযা দান করেছেন, তাঁর মোকাবেলায় দূরাত্মা ফেরাউনের সকল চক্রান্ত, সকল শক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও দুর্ভাগা ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করেনি।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۭ وَبِئْسَ الْوِرْدُ
الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ بِئْسَ
الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا
قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فَمَآ
أَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۭ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

তরজমা

(৯৮) সে কেয়ামতের দিন তার জাতির অগ্রভাগে থাকবে এবং সকলকে দোযখে পৌঁছে দেবে। যেখানে তারা পৌঁছবে তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

(৯৯) এ দুনিয়াতে তাদের প্রতি রয়েছে লা'নত এবং কেয়ামতের দিনেও, অতীব জঘন্য পুরস্কার যা তারা পেয়েছে।

(১০০) উক্ত জনপদ গুলোর এ হল মাত্র সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি, তাদের এখনো কিছু বর্তমান রয়েছে এবং কিছু নির্মূল হয়েছে।

(১০১) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। ফলে আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা যাদেরকে ডাকত, তাদের সেসব উপাস্য কোন কিছুতেই তাদের উপকারে আসেনি, যখন আপনার প্রতিপালকের আযাব এসে পড়ে। আর তারা শুধু তাদের সর্বনাশই বৃদ্ধি করেছে।

তফসীরুল কোরআন

ফেরাউন এ পৃথিবীতে কুফরী, নাফরমানী, শেরক এবং আল্লাহর নবীর বিরোধিতায় তার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ধের মত যাবতীয় পাপাচারে তার অনুসরণ করেছে। ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিনও সে তার সম্প্রদায়ের নেতা হবে এবং তার নেতৃত্বে সকলে দোযখে পৌঁছে যাবে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আদেশ শুধু ফেরাউনের ব্যাপারেই নয়; বরং দুনিয়াতে যে বা যারা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের নেতৃত্ব দেবে, কুফরী ও নাফরানীর অগ্রনায়ক হবে, কেয়ামতের দিন সে তার অনুসারীদের নিয়ে দোযখে যাবে।[১]

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৯

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস মুসনাদে সংকলিত হয়েছে। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন জাহেলিয়াতের যুগের কবিদের পতাকা থাকবে ইমরুল কায়েসের হাতে। সে তাদের নিয়ে দোযখে যাবে।[১]

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ

(সে তাদেরকে দোযখে পৌঁছে দেবে)

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই, কাফেরদেরকে দোযখে পৌঁছাবার ব্যাপারে যে ঘোষণা রয়েছে তার বর্ণনায় এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা অতীত কাল বোঝায় (অর্থাৎ সে তাদেরকে দোযখে পৌঁছে দিয়েছে)।

তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু দোযখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত এবং নিশ্চিত, তাই তারা যেন দোযখে পৌঁছে গেছে, এজন্যে অতীত অর্থের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

আর দোযখ অত্যন্ত মন্দ এবং নিকৃষ্ট স্থান যেখানে তারা পৌঁছেছে, সেখানে ঠাণ্ডা পানির স্থলে তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

"আর ফেরাউনের মত সঠিক ছিলনা"। একথাটি ছিল একটি দাবী আর আলোচ্য আয়াত হল এ দাবীর দলিল। এ মর্মে যে ফেরাউনের কুফরী, নাফরমানির কারণেই সে অভিশপ্ত এবং ধ্বংস হয়েছে। আর তার এ অন্যায়ের কারণেই সে তার দলবল সহ দোযখে যাবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তার নেতৃত্বই ছিল ধ্বংসাত্মক এবং বিপজ্জনক। এজন্যে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সে কাজই শুভ এবং পছন্দনীয় যার পরিণাম শুভ হয়, সে সম্পর্কে رشيد শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[২]

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, الورد শব্দটি পবিত্র কোরআনের চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

১. بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

২. সূরা মরয়মে وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩৩

২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৬

৩. সূরায়ে আম্বিয়ায় اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

৪. পুনঃ সূরায়ে মরয়মে وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

الورد শব্দটির অর্থ হল প্রবেশ করা।[১]

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

ফেরাউন ও তার দলবলের উপর দুনিয়াতেও লা'নত এবং আখেরাতেও লা'নত, দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং মোমেনগণ এই জালেম ফেরাউন এবং তার দলবলের উপর লা'নত দিয়েছেন, ঠিক এমনিভাবে আখেরাতেও তাদের প্রতি লা'নত দেয়া হবে। তাদের অন্যায় অনাচার, কুফরী এবং নাফরমানির কারণে আল্লাহ্ পাকের লা'নত এবং ফেরেশতাদের লা'নত দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে হতে থাকবে, তারা চির অভিশপ্ত, এ লা'নত থেকে তাদের রেহাই নেই কোনদিনও।

بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ

"অত্যন্ত মন্দ পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে"।

رفد শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) সাহায্য, (দুই) পুরস্কার। বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসে আলোচ্য শব্দটির এ দু'টি অর্থই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অতএব, বাক্যটির অর্থ হল "অত্যন্ত মন্দ পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে"। আর এ কথার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়। ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহিনী নিয়ে যেভাবে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটি বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা, আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে কঠিন কঠোর শাস্তি।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

"(হে রসূল!) এ হল উক্ত জনপদগুলোর কিছু ঘটনা, যা আপনার নিকট বর্ণনা করছি"।

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীগণের সাথে শত্রুতা করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করেছে তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায় বর্ণিত ঘটনাবলীতে। ইতিপূর্বে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে কাফেররা যে আচরণ করেছে তার ভয়ংকর পরিণাম লক্ষ্য করা যায় আলোচ্য আয়াত সমূহে। এতে একদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) মক্কাবাসী কাফেররা আপনার সাথে যে আচরণ করছে তা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বে প্রেরিত অম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গেও এমনি কষ্টদায়ক আচরণ করা হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে তাবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা এ উম্মতের কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাথে তাদের অন্যায় আচরণ পরিহার না করে তবে তাদের পরিণামও হবে ভয়াবহ।

পূর্বকালের ঘটনাবলী উল্লেখ করার উপকারিতা

ইমাম রাজী (রহঃ) তফসীরে কবীরে আলোচ্য ঘটনাবলীর উল্লেখ করার কয়েকটি উপকারিতা লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি ঈমান ও নেক আমলের উপকারিতা এবং কুফরী ও নাফরমানীর অপকারিতা বা ভয়াবহ পরিণতি বোঝাতে একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ পাক এসব ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি আম্বিয়ায়ে কেরাম তৌহিদ ও রেসালতের স্বপক্ষে যে সব দলিল প্রমাণ পেশ করতেন, তারও উল্লেখ করেছেন এবং কাফেররা আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের মোকাবেলায় যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করত এবং যে সন্দেহ পোষণ করত, তারও জবাব এর সঙ্গে সঙ্গে স্থান পেয়েছে। এরপর যখন কাফেররা তাদের ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের কারণে তাদের সত্য-বিরোধিতা বৃদ্ধি করত, তখন তাদেরকে দুনিয়াতেই তার শাস্তি ভোগ করতে হত। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং মোমেনদের লা'নত তাদের উপর পতিত হত, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের শাস্তি তাদেরকে ধ্বংস করত। তাই এ ঘটনা সমূহের উল্লেখ সকল যুগের পথভ্রষ্ট মানুষের হেদায়েতের কারণ হতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এখানে আরো একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বকালের এসব ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করতেন, অথচ তিনি কোন দিনও কোন গ্রন্থ পাঠ করেননি এবং এ পৃথিবীতে কোন মানুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি।

এটি ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর বিরাট মোজেযা এবং তাঁর নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এ পর্যায়ে আরো উল্লেখ্য, যারা এসব শিক্ষণীয় ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়, তারা ঈমানদারদের শুভ পরিণতি এবং কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রেরিত নবীর অনুসরণ করে, তারা দুনিয়াতে তাদের সুনাম রেখে যায় আর আখেরাতে পৌঁছে অশেষ সওয়াব পেয়ে যায়।

পক্ষান্তরে, যারা কাফের, তারা দুনিয়া থেকে বের হয় অভিশপ্ত অবস্থায় এবং আখেরাতে পৌঁছে কঠোর কঠিন আযাব ভোগ করে।

এ-ও লক্ষ্যণীয়, এসব ঘটনা পবিত্র কোরআনে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, বারে বারে একটি কথা শ্রবণ করা হলে মানব মনে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সৃষ্টি হয় আর তা মানুষকে সরল সঠিক পথে নিয়ে আসে।[১]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬

مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ

যে সব জনপদের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছুটা এখনো পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছে, যেমন মিশর। আর কোন কোন জনপদের নাম নিশানা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قائم শব্দটির ব্যাখ্যা হল সেসব জনপদ যার কছু ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে, আর حصيد বলতে সে সব জনপদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেগুলোর কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবীতে বর্তমান রয়নি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, قَآئِمٌ অর্থ হল যে সব জনপদ এখনো আবাদ রয়েছে, আর حصيد অর্থ হল সে সব জনপদ যেগুলো বিরাণ হয়ে গেছে।[১]

এ বাক্যটির একটি তাৎপর্য হল এই, বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবকে এসব ঐতিহাসিক ঘটনা অবগত হয়ে এবং স্থান দেখে শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান জানায়। কুফরী ও নাফরমানী এবং আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করার পরিণতি দুনিয়াতে যেমন মন্দ, তেমনি আখেরাতে ভয়াবহ। যারা এমন গর্হিত কাজ করে ধ্বংস হয়েছে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

"আর আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কুফরী ও নাফরমানির কারণে বিভিন্ন জনপদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারাই কুফরী এবং নাফরমানি, শেরক ও অনাচারের মাধ্যমে পয়গম্বরদের বিরোধিতা করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ

আল্লাহ পাকের বন্দেগী না করে তারা যাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং যাদের কাছে অনেক কিছু আশা করেছে, কিন্তু তারা তাদের পূজারীদের এ দুঃসময়ে কোন উপকারই করতে পারেনি। তাদের কোন কাজেই তারা আসেনি, ফলে তাদের সর্বনাশ হয়েছে এবং এ দুঃসময়ে তাদের ক্ষোভ, ব্যথা এবং অর্ন্তজ্বালা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ

তাদের উপাস্যরা তাদের সর্বনাশই শুধু বৃদ্ধি করেছে কেননা, এ মিথ্যা উপাস্যরা তাদের পূজারীদের উপকার করাতো দূরের কথা, বরং সমূহ ধ্বংসেরই কারণ হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৭

কেননা, যদি তারা স্বহস্তে তৈরী মূর্তিগুলোর পূজা না করত, তবে এ কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো না।[১]

وَكَذٰلِكَ
اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ
شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ
ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا
نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى
النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاۗءَ رَبُّكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاۗءَ رَبُّكَ ۭ عَطَاۗءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾

তরজমা

(১০২) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক যখন কোন পাপীষ্ঠ অঞ্চলকে পাকড়াও করেন তখন এভাবেই তাদেরকে ধরেন, নিশ্চয় তাঁর ধরা অত্যন্ত মারাত্মক, অতীব কঠিন।

(১০৩) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে, সেদিন হবে এমন এক দিন, যাতে সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে, সেদিন যে সকলের হাযির হওয়ার দিন।

(১০৪) আর তা আমি স্থগিত রাখি শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্যে।

(১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না, তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগা আর কেউ হবে ভাগ্যবান।

(১০৬) অতএব, যারা হতভাগা হবে তারা থাকবে দোযখে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।

(১০৭) তারা সেখানে (দোযখে) চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকবে। যদি না আপনার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮০

(১০৮) আর যারা ভাগ্যবান তারা বেহেশতে থাকবে, আসমান জমিন যে পর্যন্ত থাকে তারাও সেখানে চিরদিন থাকবে, যদি না আপনার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। মূলতঃ এটি হলো এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

তফসীরুল কোরআন

যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহকে আল্লাহ্ পাক পাকড়াও করেছেন তাদের অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে, তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণেই তারা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, ঠিক এভাবেই হয় তাঁর ধরা। মনে রেখো, আল্লাহ্ পাকের ধরা অত্যন্ত মারাত্মক এবং অতীব কঠিন। যখন আল্লাহ্ পাক কাউকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেন না।

হযরত আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক জালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে তাকে পাকড়াও করেন। আর এমন অবস্থায় সে কোন দিন রেহাই পায়না। একথা বলার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১] (বোখারী শরীফ, মুসলিম, তিরমিযী, এবনে মাজা)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ

নিশ্চয় এ জনপদ সমূহের ধ্বংসের ঘটনায় অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে, যারা আখেরাতকে ভয় করে অর্থাৎ-যারা আখেরাতের আযাবের ভয় করে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর বন্দেগী করে, যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে তাদের জন্যে এসব ঘটনায় রয়েছে বিশেষ নিদর্শন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দুনিয়াতে তাদের প্রতি যে আযাব এসেছে তা আখেরাতের আযাবের একটি নমুনা মাত্র। মূল আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ। অথবা এর অর্থ হলো যারা কল্যাণকামী তাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর কোপগ্রস্ত জাতিগুলোর ঘটনা শ্রবণ করে তারা আল্লাহর নাফরমানী পরিহার করে। কেননা তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, এ আযাব সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ থেকে, সারা পৃথিবী যাঁর কর্তৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের অবস্থা সেই জন্তুর মত যে কিছুই বোঝেনা, যার বুঝবার কোন ক্ষমতাই নেই।

পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র

মূলতঃ এ পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র, কর্ম পৃথিবীতে, আর ফল আখেরাতে, পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যে। এ নির্দিষ্ট কাল শেষ হলেই তারা পাড়ি জমায় পরপারে। অবশেষে কেয়ামতের দিন তথা শেষ বিচারের দিন প্রতিটি মানুষ লাভ করবে তার কর্মফল, সেদিন শেরক ও কুফর তথা অন্যায়-অনাচারের পরিণাম যে কত

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৩৭

ভয়াবহ হবে তা আঁচ করা যায় সেই শাস্তি দেখে যা আল্লাহ পাকের অবাধ্য জাতিগুলোকে দুনিয়াতে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন সকলকেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে। কেউ সেদিন অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। কেননা কেয়ামতের দিন সকলেরই হাযিরীর দিন।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ

(আমি কেয়ামতের দিনকে এজন্যে স্থগিত রাখি যে মানুষের জীবনের নির্দিষ্ট সময় যেন শেষ হয়ে যায়)

কেননা, প্রত্যেকের জন্যেই আল্লাহ পাকের জ্ঞানে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, ঐ সময় শেষ হওয়া মাত্রই কেয়ামতের দিন আসবে।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

যখন সেদিন আসবে তখন কেউ আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। অর্থাৎ কেউ কারো পক্ষে সুপারিশ করবেনা।

অথবা এর অর্থ হল– কেউ এমন কথা বলতে পারবেনা যা কারো উপকারে আসে। একথাটি অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

"সেদিন কেউ কথা বলতে পারবেনা তবে দয়াময় আল্লাহ পাক যাকে অনুমতি দান করেন"।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ কেয়ামতের ভয়ংকর দিনে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে যে, কারো মুখ খোলার সাহস পর্যন্ত হবে না, আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, সেদিন শুধু আল্লাহর রসূলই কথা বলবেন, আর কেউ নয়। আর তাঁর কথাও হবে শুধু এতটুকু, হে আল্লাহ! শান্তিতে রাখ, হে আল্লাহ! শান্তি দাও।

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ

হাশরের ময়দানে হতভাগ্য এবং ভাগ্যবান উভয় প্রকার লোকই থাকবে, যার জন্যে বদনসিবী লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে বদনসিবই হবে। আর যার জন্যে সৌভাগ্য লেখা হয়েছে, সে ভাগ্যবানই হবে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, আমি একটি জানাযার সঙ্গে বাকীতে (মদীনা শরীফের করবস্থান) পৌঁছি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (একটি ছড়ি হাতে করে) আগমন করেন। তিনি সেখানে উপবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ ছড়ি দ্বারা মাটিতে দাগ দিতে থাকেন, এরপর তিনি এরশাদ করলেন, এমন কোন প্রাণ নেই যার নাম জান্নাত বা দোযখে লিপিবদ্ধ রয়নি, তার ভাগ্যবান বা

হতভাগা হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ রয়নি। একথা শ্রবণ করে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাহলে আমরা তকদীরের উপর ভরসা রাখি না কেন এবং আমল বর্জন করিনা কেন? তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা আমল করে যাও, প্রত্যেককেই তার তকদীর অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেয়া হয়। যে হতভাগা হবে, তাকে সে অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেয়া হবে আর যে ভাগ্যবান হবে তাকে ভাগ্যবানদের আমলের তৌফিক দেয়া হবে। এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের এ আয়াত فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ তেলাওয়াত করেন।[১] (বুখারী, মুসলিম)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

"অতএব, যারা হতভাগা হবে তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা চিৎকার এবং আর্তনাদ করতে থাকবে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, زفير শব্দটির অর্থ হল অত্যন্ত উচ্চস্বরে চিৎকার করা। আর شهيق অর্থ হল নিম্নস্বরে চিৎকার।

তফসীরকার যাহ্যাক এবং মোকাতেল (র বলেছেন, গাধার চিৎকারের প্রাথমিক অবস্থাকে زفير বলা হয়। আর ঐ আওয়াজের শেষ অবস্থাকে شهيق বলা হয়। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসেও আলোচ্য দু'টি শব্দের এ ব্যাখ্যাই লেখা হয়েছে।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

দোযখীরা তাতে চিরদিন থাকবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আসমান জমীন দুনিয়াতে রয়েছে আর কেয়ামতের পূর্বে আসমান জমীন ধ্বংস হয়ে যাবে (তবে যতদিন আসমান জমীন থাকবে) এর তাৎপর্য কি?

তফসীরকারগণ এর দু'টি জবাব দিয়েছেন (এক) যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, জান্নাত এবং দোযখেরও আসমান জমিন থাকবে। মূলতঃ যা মাথার উপরে থাকে তাইতো আসমান। আর যার উপর মানুষ পা রাখে তারই নাম জমিন। আর একথা অনস্বীকার্য যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। তা কোন স্থানে তো অবশ্যই হবে এবং পায়ের নীচেও কোন জিনিষ থাকবে, আর মাথার উপরও কিছু থাকবে।

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

(দুই) অর্থাৎ-যতদিন আসমান জমিন টিকে থাকবে।

আরবের লোকেরা অনন্তকাল বোঝাতে এ বাক্যটি ব্যবহার করে। আলোচ্য আয়াতেও বাক্যটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আর যদি এর দ্বারা আখেরাতের আসমান জমিন উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা আরো জোরদার হয়। কেননা, আখেরাতের আসমান জমিন পৃথিবীর আসমান জমিন থেকে হবে স্বতন্ত্র।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৯

আর পবিত্র কোরআনে একথাও আছে যে, আসমান জমিনকে পরিবর্তন করা হবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

"যেদিন বদল করা হবে জমিন," অতএব, আখেরাতের আসমান জমিনের যেমন শেষ নেই এবং ধ্বংসও নেই ঠিক তেমনি দোযখীদের দোযখের শাস্তি এবং বেহেস্তবাসীর আনন্দ-উল্লাসেরও অবসান নেই। ঐ আসমান জমীন চিরকাল থাকবে। তেমনি বেহেস্ত বাসীরা বেহেস্তে এবং দোযখীরা দোযখে চিরকাল থাকবে।

اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ

তবে আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে তিনি তার ব্যতিক্রম করতে পারেন, সে ক্ষমতা তাঁর আছেই।

বেহেস্তীদের বেহেস্তে এবং দোযখীদের দোযখে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ পাকের মর্জির উপর নির্ভর করে।

অতএব, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি দোযখীদেরকে একথা বলা হয় যে, তোমাদেরকে দোযখে তত বছর থাকতে হবে যতগুলো প্রস্তর খন্ড পৃথিবীতে আছে, তখন তারা একথা শুনে আনন্দিত হবে।

আর যদি জান্নাতবাসীদেরকে একথা বলা হয় যে, তোমাদেরকে জান্নাতে এত বছর থাকতে হবে যত প্রস্তর খন্ড পৃথিবীতে রয়েছে তবে তারা একথা শ্রবণ করে চিন্তিত হবে। (কিন্তু এমন হবে না) কেননা দোযখীদের দোযখে, বেহেস্তবাসীদের বেহেস্তে চিরদিন থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জান্নাত বা দোযখের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী

তেবরানী আল কবীরে এবং হাকেম হযরত মুআয এবনে জবল (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবী মুআজ (রাঃ)-কে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, হযরত মুআজ (রাঃ) সেখানে পৌঁছে একটি ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, হে লোকসকল! আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী বাহক, আমাকে তোমাদের নিকট এ সংবাদ দেয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে যে, সকলকে আল্লাহ্ পাকের নিকট ফিরে যেতে হবে। জান্নাতে অথবা দোযখে অবস্থান করতে হবে। আর সেই অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। সেখানে মৃত্যু হবে না, আর সেখান থেকে বের হয়ে কোথাও ভ্রমণ করা হবে না। (প্রতিটি মানুষ) এমন দেহ বিশিষ্ট হবে যার কোনদিন মৃত্যু হবে না।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতীরা

জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে চলে যাবে এবং একজন ঘোষক দু'দলের মধ্যে এ ঘোষণা করবে, হে দোযখবাসী! আর মৃত্যু নেই, হে জান্নাতবাসী! আর মৃত্যু নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি যে অবস্থায় রয়েছে, চিরদিন তাতেই থাকবে।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ঘোষণা করা হবে হে জান্নাতবাসী! তোমাদের মৃত্যু নেই, অনন্তকাল তোমরা এখানেই থাকবে। আর হে দোযখবাসী! তোমাদের মৃত্যু নেই, চিরদিন তোমরা এখানে থাকবে।[১]

অন্য একখানি হাদীসে মৃত্যুকে জবেহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাদীসে একথাও রয়েছে যে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের মৃত্যু নেই। এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সংকলিত হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তাতে রয়েছে–দোযখ তার প্রতিপালকের নিকট আরজী পেশ করেছে, হে আমার প্রতিপালক! আমার একটি অংশ (অত্যন্ত গরমের কারণে) দ্বিতীয় অংশকে খেয়ে ফেলে। তখন আল্লাহ পাক তাকে বছরে দু'টি নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দান করেন। একটি শীতের মওসুমে আরেকটি গরমের মওসুমে। যারা অত্যন্ত গরম উপলব্ধি করে তা দোযখের সেই নিঃশ্বাসের কারণেই হয়। আর শীতের মওসুমে যে অত্যন্ত শীত উপলব্ধি করা হয় তা-ও ঐ দোযখের নিঃশ্বাসের কারণেই হয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا

গুনাহগার মোমেনগণ অবশেষে নাজাত লাভ করবে

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের অর্থ বলেছেন যে, এতে গুনাহগার মোমেনদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে কেননা, ভাগ্যাহত-গুনাহগার মোমেনদেরকে তাদের পাপাচারের শাস্তির জন্যে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (একটি নিদৃষ্ট সময়ের পর) রেহাই দেয়া হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কিছু লোককে তাদের গুনাহর কারণে শাস্তি স্বরূপ দোযখ স্পর্শ করবে। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে তাদেরকে জান্নাত নসীব করবেন। আর তাদেরকে জান্নাতবাসীগণ দোযখী বলবে। (বোখারী)

হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, কিছু লোককে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতে দোযখ থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দোযখবাসী বলে আখ্যা দেবে। (বোখারী)

তেবরানী হযরত মুগীরা এবনে শোবা (রাঃ) থেকে এই হাদীস সংকলন করেছেন, তাতে আরও একটি বাক্য সংযোজিত হয়েছে যে, ঐ লোকেরা আল্লাহ পাকের দরবারে

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯০-৯১

দোয়া করবে যেন তাদের দোযখী নামটি মুছে ফেলা হয়। আল্লাহ পাক দোয়ার পর এ নাম মুছে দেবেন।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোককে তাদের পাপাচারের কারণে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে আর যতদিন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হবে তারা দোযখে থাকবে। দোযখে মুশরেকরা তাদেরকে একথা বলে লজ্জা দেবে যে, তোমাদের ঈমান তোমাদের কোন উপকারই করেনি। তখন আল্লাহ পাক তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষকে দোযখ থেকে বের করবেন। কোন তৌহিদে বিশ্বাসী আর দোযখে থাকবে না। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করেছেন এ আয়াতখানিঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

"কখনও কখনও কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে যদি তারা মুসলমান হত"।

বস্তুতঃ গুনাহগার মোমেনদের দোযখে প্রবেশ করা এবং দোযখ থেকে বের হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যারা কাফের, যারা মুশরেক তারা চিরদিন দোযখে থাকবে, তাদের আযাব কখনও মূলতবী হবেনা এবং কখনও তারা দোযখ থেকে বের হতে পারবে না। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ

(তারা দোযখ থেকে বের হতে চায় কিন্তু কখনও বের হতে পারবে না)

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

(তাদের আযাব কম করা হবে না, আর কখনও আযাবের বিরামও হবেনা) কেননা অন্য আয়াতে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরকের গুনাহকে কখনও মাফ করবেন না) তাই কাফের মুশরেক এবং মুনাফেকদের দোযখে যাওয়া যেমন অবধারিত, ঠিক তেমনি সেখানে তাদের চিরকাল অবস্থানও অনিবার্য। দোযখ তাদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে আর তারাই দোযখের অধিবাসী।

এখন প্রশ্ন হলো, যারা মোমেন অথচ পাপী তাদের অবস্থা কি হবে?

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ শেরক ব্যতীত অন্য গুনাহ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, গুনাহগার

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯১-৯২

মোমেনরা মূলতঃ দোযখবাসী নয়; বরং দোযখ-প্রবাসী। মোমেন গুনাহগারদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যাদেরকে পূর্বেই মাফ করে দেয়া হবে, ফলে তাদেরকে দোযখে যেতেই হবে না। আর যাদের গুনাহ মাফ হবেনা তারা দোযখে যাবে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। ঐ সময় শেষ হলে তারা নাজাত লাভ করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। যার অন্তরে কণা মাত্র ঈমানও থাকে সেও অবশেষে দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভ করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর বেহেশতীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন আর সেখান থেকে বের হবেনা।

আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। মোমেনদের জন্যে চিরস্থায়ী জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে চিরস্থায়ী দোযখের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আলোচ্য আয়াতে যে আসমান ও জমীনের কথা বলা হয়েছে তা দুনিয়ার আসমান জমীন নয়; বরং জান্নাত ও দোযখের আসমান জমীন। আর যেহেতু আখেরাতের আসমান ও জমীন চিরস্থায়ী, তাই জান্নাত এবং দোযখের অবস্থানও হবে চিরস্থায়ী। একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পর কারো মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, জান্নাতী ও দোযখীদের ব্যাপারে এরপর আল্লাহ পাকের কি কোন এখতিয়ার থাকবে না? এ সন্দেহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ

যার অর্থ হল জান্নাতবাসীদের জন্যে জান্নাত এবং দোযখীদের জন্যে দোযখ চিরস্থায়ী হল, কিন্তু এরপরও আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিই কার্যকর হবে। এরপর তিনি যদি কোন বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন তবে তা একান্ত তাঁর মর্জির ব্যাপার। তবে যেহেতু তিনি পুরস্কার এবং শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেনে তাই শক্তি এবং অধিকার থাকা সত্ত্বেও হয়তো তিনি এ ঘোষণাকে বাতিল করবেন না।

(আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী)।

পরবর্তী বাক্যেও এ বক্তব্যের প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে।

اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

(নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের যা ইচ্ছা তাই তিনি করতে পারেন) অর্থাৎ- আল্লাহ পাকের ক্ষমতা, ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে চিরস্থায়ী জীবন দেয়ার পরও এ সিদ্ধান্ত তিনি ইচ্ছা করলে পরিবর্তনও করতে পারেন, তথা পুরস্কার দান ও শাস্তি বিধান সবই আল্লাহ পাকের মর্জি-নির্ভর। কোন ব্যাপারেই তিনি বাধ্য নন। ইচ্ছা করলে তিনি বেহেশতীকে বেহেশত থেকে বের করতে পারেন, ইচ্ছা করলে তিনি দোযখ থেকে দোযখীকেও বের করতে পারেন।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا

আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা বেহেশতে চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান জমীন থাকবে। অবশ্য আপনার প্রভূ যা ইচ্ছা তাই করেন অর্থাৎ যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যারা খোশ-নসীব তারা বেহেশতবাসী হবে। যতদিন আসমান জমীন থাকবে ততদিন তারা সেখানে থাকবে। অবশ্য আপনার প্রতিপালকের যা ইচ্ছা তাই কার্যকর হবে।

(পূর্ববর্তী আয়াতে "যতদিন আসমান জমীন থাকে" কথাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)

বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কোন কোন সময় জান্নাতবাসীদেরকে এমন মতর্বায় উন্নীত করা হবে যা জান্নাত থেকেও উচ্চতর হবে অর্থাৎ তাদেরকে মহান আল্লাহ্ পাকের দীদার নসীব করা হবে এবং আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য করা হবে, যেমন অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রয়েছে,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে"।

অর্থাৎ-আল্লাহ পাকের দীদারে এত তন্ময় থাকবে যে অন্য কোন কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ থাকবে, হঠাৎ উপর থেকে নূর চমকে উঠবে তখন তারা মাথা তুলে দেখবে যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি এরশাদ করবেন, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর এটি অর্থ হল সূরা ইয়াসীনের এ আয়াতেরঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

যাহোক, আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন আর তারাও আল্লাহ পাকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর আল্লাহ পাকের দিকে তাকাবার সময় অন্য কোনদিকে দেখার অবস্থা তাদের থাকবেনা। এমনিভাবে তারা বিস্ময়-মুগ্ধ থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর মাঝে ও তাদের মাঝে আবরণ ফেলে দেবেন। আর আল্লাহ পাকের দীদারের চমক ও বরকত জান্নাতবাসীর উপর থেকে যাবে। (এবনে মাজা, দারেকুতনী)

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

"আর এ দানের শেষ নেই"।

অর্থাৎ এ দান হল অনন্ত অসীম, আল্লাহ পাকের দীদার এমনি একটি দান, যা কখনও শেষ হবার নয়। যদিও জান্নাতের প্রত্যেকটি নেয়ামতই অনন্ত কাল থাকবে, কিন্তু আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব যেহেতু প্রকৃত এবং তাঁর নিজস্ব আর অন্যান্য সব কিছু তাঁর অস্তিত্বেরই ফলশ্রুতি স্বরূপ। অতএব, প্রকৃত অর্থে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বই সঠিক এবং প্রকৃত। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সব কিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, ইতিপূর্বে তার অস্তিত্ব ছিলনা, আল্লাহ পাকই তার অস্তিত্ব দান করেছেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি কারো নিকট থেকে পোষাক ধার করে নেয় ও পরিধান করে তবে সে পোষাক তার মালিকেরই থাকে, যে পোষাক পরিধান করে তার হয় না। বস্তুতঃ বিশ্বসৃষ্টির অস্তিত্ব আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীগণকে সরাসরি তাঁর দীদার নসীব করবেন, এটিই হল প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী দান, এটিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অন্যান্য অগণিত নেয়ামত বেহেশতবাসীগণ ভোগ করবেন কিন্তু আল্লাহ পাকের দীদারের যে নেয়ামত বেহেশতবাসীগণ লাভ করবেন তা হবে অদ্বিতীয়, অনুপম, অনন্য-সাধারণ, চিরস্থায়ী-যার কোন শেষ নেই।

এবনে যায়েদ বলেছেন, জান্নাতবাসীগণের জন্যে আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম-নেয়ামত দানের কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু দোযখীদের জন্যে একথা বলেননি যে তাদের শাস্তি কখনও বন্ধ করা হবে; বরং দোযখীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

(নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা করেন।)[১]

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

(যদি না আপনার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন।)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যাহ্যাক (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত গুনাহগার মোমেনদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। তারা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দোযখে অতিবাহিত করার পর দোযখ থেকে রেহাই পাবে।

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

আল্লাহ পাকের এ দানের কোন শেষ নেই, এ দান চিরকাল থাকবে। এটি হল এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[২]

ভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের কথা

আলোচ্য আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রতীয়মান হলো যে, পৃথিবীতে সব যুগেই এবং সব দেশেই দু'দল লোক বাস করে। একদলকে পবিত্র কোরআন ভাগ্যবান বলেছে, অন্য দলকে হতভাগা বলে আখ্যা দিয়েছে। উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি ঘোষণা করা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩৪

হয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে, যার সারমর্ম হলো-ভাগ্যবান হচ্ছে সে সব লোক যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং বিশ্বাস করে নবী রসূলগণের প্রতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি অনুরক্তি রাখে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারাই হতভাগা বা বদনসীব। উভয় দলের পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত সমূহে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ এক দল চির সুখী হবে আর একদল হবে চির দুঃখী।

ইমাম বলখী (রঃ) উভয় দলের পাঁচটি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেনঃ

ভাগ্যবানদের বৈশিষ্ট্য

ভাগ্যবানদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যঃ

১. তাদের অন্তর বিনম্র হয়।

২. আল্লাহর ভয়ে তারা কাঁদতে থাকে।

৩. দুনিয়ার জীবনে দীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে না।

৪. দুনিয়ার প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না।

৫. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারা লজ্জিত থাকে।

হতভাগ্যদের পাঁচটি আলামত

১. তাদের অন্তর হয় কঠিন কঠোর।

২. নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয় না।

৩. দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে অধিকতর।

৪. তারা সুদীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

৫. তারা নির্লজ্জ হয়।[১]

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আলামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৯৪

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ
مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَ
لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي
شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ
إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

তরজমা

(১০৯) অতএব, তারা যাদের এবাদত করে, তাদের সম্বন্ধে ধোকায় থেকো না। ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের এবাদত করতো এরাও তাদেরই এবাদত করে আর আমি তাদের আযাবের অংশ (কেয়ামতের দিন) কিছু মাত্র কম করবো না, তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেব।

(১১০) আর নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম। এরপর তাতে মতবিরোধ ঘটে। (হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় তারা এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

(১১১) যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই আপনার প্রতিপালক তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(১১২) (হে রসূল!) অতএব, আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে স্থির থাকুন। আর আপনার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারাও স্থির থাকুক। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন।

তফসীরুল কোরআন

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুশরেক তথা পৌত্তলিকদের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এরপর ভাগ্যবান এবং হতভাগা লোকদের অবস্থার বিবরণ ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে

তাঁর জাতির কাফেরদের অবস্থা জানানো হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) নেককার ও বদকার বা ভাগ্যবান ও হতভাগা লোকদের পরিণামে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক সত্যকে গ্রহণ করেনা। কুফরী, নাফরমানী সহ নানা প্রকার পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে। সত্যের আহ্বান তাদেরকে পৌঁছানো হয়েছে কিন্তু তারা সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি; বরং সত্যের বিরোধিতায় তারা সর্বক্ষণ লিপ্ত রয়েছে। তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করে চলেছে অথচ তাদের শাস্তি বিধানের এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। এমনি অবস্থায় তাদের ব্যাপারে আপনার মনে যেন কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় এবং তাদের অসত্যতা সম্পর্কে আপনার যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে, তাদের শক্তি দেখেও যেন কোন রকম ভুল ধারণা না করা হয়, তাদের পূর্ব পুরুষরা যেভাবে সর্বদা শেরক ও কুফরীতে লিপ্ত ছিল তারাও তাই করছে, তাদের পূর্ব পুরুষরা যেমন বাতিল পন্থী ছিল এরাও তেমনি বাতিল পন্থী, দেব-দেবীরা যেমন ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব-পুরুষদের কোন উপকার করতে পারেনি, তেমনি এদেরও কোন উপকার করতে পারবে না। তারা শেরক ও কুফর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যদিও আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র উম্মতকে, যাতে করে সকলেই সত্যকে উপলব্ধি করে এবং অসত্য থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয়।

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ

"শেরক ও কুফরীর যে শাস্তি তাদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে তা অবশ্যই তারা ভোগ করবে, তাতে এতটুকু কম করা হবে না"। যেভাবে তাদের পূর্ব-পুরুষরা শাস্তি ভোগ করেছে এরাও অনুরূপ শাস্তি ভোগ করবে। তাদের প্রাপ্য শাস্তি থেকে কেউ তাদেরকে রেহাই দিতে পারবে না।

অথবা, এর অর্থ হলো আমি তাদের জন্যে নির্দিষ্ট রিয্ক পুরো করে দেব। অর্থাৎ- তাদের অন্যায় অনাচার সত্ত্বেও তাদের যে শাস্তি এখনও হচ্ছেনা এর কারণ হলো, তাদের জন্যে যে রিয্ক নির্দিষ্ট রয়েছে তা পুরো হওয়ার পরই তাদের শাস্তি শুরু হবে, তখন তাদের শাস্তিতে এতটুকুও কম করা হবে না।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মুশরেকদের শেরকের বাতুলতা সম্পর্কে কোন অবস্থাতেই সন্দেহ পোষণ করোনা। কেননা তারা তো শুধু তাদের পূর্ব পুরুষদেরই অন্ধ অনুকরণ করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

আল্লাহ পাক কাফের মুশরেকদের শাস্তির ব্যাপারে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৬৮

[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩৫

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ

আর নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি, এরপর তারা তাতে মতবিরোধ করে, কেউ মানে কেউ মানে না, পরস্পরের মধ্যে বিভেদ এবং দলাদলি সৃষ্টি হয়, অবশেষে তারা কোপগ্রস্ত হয়। অতএব, মুসলমানদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, কলহ-দ্বন্দ্ব এবং দলাদলি পরিহার করা।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হলো এই, আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে নাজাত, চির শান্তি, চির মুক্তি, চির কল্যাণ। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাকের হুকুমের ব্যাপারে বিরোধিতা এবং মতানৈক্যের পরিণতি হলো ধ্বংস।

এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এ মর্মে যে, ইতিপূর্বে আমি মূসাকে তৌরাত দান করেছিলাম, তাদের মধ্যে এ সম্পর্কে মতবিরোধ হলো, একদল লোক তৌরাতকে মেনে নিল, আর একদল লোক তৌরাতকে অস্বীকার করলো। (হে রসূল!) আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি এবং অনুরূপ ঘটনা পবিত্র কোরআন সম্পর্কেও ঘটেছে। একদল লোক আপনার বিরোধিতা করছে, আপনি তাতে মনক্ষুণ্ন হবেন না। এটি নতুন কোন কথা নয়, যুগে যুগে নবী রসূলগণকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হয়েছে। অতএব, পূর্বকালের নবীগণের ন্যায় আপনিও সবর অবলম্বন করুন।

দূরাত্মা কাফেরদের শাস্তি বিধানে যে বিলম্ব হচ্ছে তারা ন্যায্য কারণও রয়েছে।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

"যদি আপনার প্রভূর তরফ থেকে একটি কথা না থাকতো তবে তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যেত"।

ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে এ কথাটির একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেনঃ

১. আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেনঃ এ উম্মতের শাস্তি দুনিয়াতে নয়, আখেরাতে হবে, যদি এ কথাটি না থাকতো তবে কাফেরদের শাস্তি এখানেই হয়ে যেত।

২. আল্লাহ পাক এ আদেশ দিয়েছেন, যারা দ্বীনি ব্যাপারে মতবিরোধ করে তাদের সম্পর্কে কেয়ামতের দিন সিদ্ধান্ত হবে, যদি ইতিপূর্বে এ আদেশ না দেয়া হতো তবে কাফেরদের শাস্তি দুনিয়াতেই হতো।

৩. আল্লাহ পাক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। যদি এ সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নে গ্রহণ না করা হতো তবে কাফেরদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হতো। কেননা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে ক্ষণিকের মধ্যেই সমস্ত দলাদলি দূরীভূত করতে পারেন এবং সকল দুশমনকে মুহূর্তের মধ্যে নিপাত করতে পারেন। যেমন আদ, সামুদ এবং লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস

করে দিয়েছেন। এ উম্মতের ব্যাপারে এমনি সিদ্ধান্ত হয়না কেননা, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেনঃ

"হে আল্লাহ! অন্য নবীগণের উম্মতদের ন্যায় আমার উম্মতের গুনাহর কারণে তাদের মূলোৎপাটন করোনা"। আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করেছেন। এজন্যে এ উম্মতের ব্যাপারে সার্বিকভাবে ধ্বংসের আদেশ হয়না। তবে হ্যাঁ আংশিকভাবে গজব নাযিল হয়। যেমন ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে।

এই একই বছর রাশিয়ায় ভূমিকম্প হয়, চীনে মারাত্মক বন্যা হয়। ১৯৯০ সালে ভারত এবং নেপালে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প হয়, এর দু' বছর আগে ইরানে যে ভূমিকম্প হয় তাতে কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, এমনিভাবে আরো বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যাতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সামগ্রিকভাবে এ উম্মতের ধ্বংস আসেনা, আংশিকভাবে কখনও কখনও পাপাচারের পরিণতিতে চারিত্রিক দূর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগের আকৃতিতে আল্লাহর গজব নেমে আসে। আর এর কারণ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া এবং আল্লাহর রহমত।

وَإِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

"সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও (হে রসূল!) আপনার জাতি বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে"।

অর্থাৎ মক্কার কাফেররা কোরআনে করীমের ব্যাপারে অথবা আল্লাহর তরফ থেকে আযাবের ব্যাপারে এখনও সন্দেহ পোষণ করে।

মূলতঃ এ পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র। এ জীবন কর্মের জন্যে, মানুষ পৃথিবীতে কাজ করে, আখেরাতে তার ফল ভোগ করবে। এ জগতে কর্ম পর জগতে ফল-এটিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের আমোঘ বিধান। এজন্যেই আল্লাহ পাক মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। ভাল-মন্দ, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দান করেছেন। মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দান করেছেন। কে কি করে না করে তা আল্লাহ পাক স্বচক্ষে দেখছেন। কে পুরস্কারের যোগ্য, আর কে শাস্তির যোগ্য তা এখানেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে হাশরের দিন, এখানে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা মানুষকে দান করা হয়েছে। যেন আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে ভাল কাজ করে আর কে মন্দ কাজ করে। তাই এখানে কাফেরদেরকে তথা আল্লাহর বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করা হয় না। আখেরাতে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ

(নিশ্চয় (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক প্রত্যেকটি মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পুরোপুরি দান করবেন) যে ভাল কাজ করবে তার পুরস্কার সুনিশ্চিত, আর যে মন্দ কাজ করবে তার শাস্তি অবধারিত। মোমেন, কাফের, ভাল-মন্দ, নেককার, বদকার

এক কথায় সকলকে তার কৃতকর্মের প্রাপ্য বিনিময় অবশ্যই দান করা হবে। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে?

إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, সবকিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর নিকট থেকে গোপন নেই। এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

"তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর সবই তিনি জানেন"।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"আর নিশ্চয় আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর আমি জানি মানুষের মনে কি ভাবনার অবতারণা হয় আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও নিকটতর"।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"আল্লাহ পাক জানেন, মানুষের চোখের চুরি আর যা কিছু তার মনের গহনে গোপন থাকে"।

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

"আর প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকে আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্যে বের করব এক কিতাব যা সে পাবে উম্মুক্ত"।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য রাখছেন"।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কোন কাজ বা কোন অবস্থাই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই। সবই তিনি জানেন, সবই তিনি দেখেন তদুপরি "কেরামুন কাতেবীন" নামক দু'জন ফেরেশতা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে মোতায়েন রয়েছে। যারা মানুষের ভাল বা মন্দ কথাবার্তা ও যাবতীয় কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে থাকে। যে বিবরণের সমষ্টি বা আমলনামা কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষের হাতে দেয়া হবে। ঐ আমলনামার বিবরণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হবে তার ভবিষ্যত জীবনের কথা। যদি আমল ভাল হয় তবে সে ভাগ্যবান, সে হবে চির সুখী। পক্ষান্তরে, যদি আমল মন্দ হয় তবে সে হবে ভাগ্যাহত এবং হবে চির-দুঃখী। অতএব, (হে রসূল!) এ জালেমদের শাস্তির ব্যাপার আপনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দিন।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

অর্থাৎ-মানুষ সত্যকে গ্রহণ করুক বা না করুক আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন সেভাবে সুদৃঢ় থাকুন তথা সরল সঠিক পথের উপর অটল অবিচল থাকুন। আর আপনার সাথে যারা তওবা করেছে তারাও যেন সীরাতে মুসতাকীম তথা সরল সঠিক পথের উপর সুদৃঢ় থাকে।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তায় ব্যস্ত না হয়ে আপনার প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে তার উপর অটল অবিচল থাকুন। যারা আপনার অনুসারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তওবা করেছে এবং আপনার সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে তাদের জন্যেও এ নির্দেশ, যেন তারা সরল সঠিক পথের উপর সুদৃঢ় থাকে। একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ

"আমাকে সূরা হুদ এবং তার সঙ্গী অন্যান্য সূরা বৃদ্ধ করে ফেলেছে"।

একজন বুজুর্গ স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করলেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজী পেশ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার এই হাদীস বর্ণিত আছে যে সূরা হুদ এবং অন্যান্য সূরা আপনাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, তখন আমি আরজ করলাম, সূরা হুদের কোন্ আয়াত? তিনি এরশাদ করলেনঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ

"আপনাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার উপর সুদৃঢ় থাকুন"।

এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সমগ্র কোরআনে করীমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এর চেয়ে কঠিন কোন আয়াত নাযিল হয়নি।[১]

বস্তুতঃ কোন বিষয়ের উপর সুদৃঢ় থাকা ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, কাফের মুশরেকরা তাঁকে তাঁর রেসালতের পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাঁধা দেয়। তাঁর প্রতি এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনদের প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করে, সেই কঠিন দিনগুলোতে মক্কার কাফেররা তাঁর পিতৃব্য আবুল তালেবের নিকট হাযির হয়ে বললঃ আপনার ভ্রাতঃষ্পুত্রকে নতুন ধর্ম প্রচার থেকে বিরত রাখুন। তিনি যদি আরবের

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৭১

সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হতে চান তবে আমরা তার ব্যবস্থা করবো। যদি তিনি আরবের সর্বাধিক সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণ করতে চান তাতেও আমরা রাজি, যদি তিনি আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী রাজা হতে চান তাতেও আমরা প্রস্তুত। আবু তালেব যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কাফেরদের তরফ থেকে প্রদত্ত এ প্রস্তাব সমূহ পেশ করলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যদি তারা আমার এক হাতে চাঁদ আর এক হাতে সূর্যও এনে দেয় তবুও আমি দ্বীন ইসলামের প্রচার থেকে বিরত হবোনা। আপনি তাদেরকে আমার একথা জানিয়ে দিন। এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংকল্পের দৃঢ়তার একটি দৃষ্টান্ত।

কোন বিষয়ে মানব মনের এমনি সুদৃঢ় অবস্থাকে ইসলামী পরিভাষায় "এস্তেকামত" বলা হয়।

এ এস্তেকামতের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যেমন অন্য একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

(নিশ্চয় যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, এরপর একথার উপর সুদৃঢ় থাকে) কেননা, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্য এবং সুন্দরের দুশমনদের তরফ থেকে লাগাতার আক্রমণ শুরু হয়। চারিদিক থেকে চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়। ঐ কঠিন সময় সত্যের উপর অটল অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তখন যারা মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন, তারাই সফলকাম হন। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এস্তেকামতের যে মহান ও অনুপম আদর্শ পেশ করেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

ما أوذى نبى ما اوذيت

"কোন নবীকে এত কষ্ট দেয়া হয়নি যত কষ্ট আমাকে দেয়া হয়েছে"।

তিনি যেহেতু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি যেহেতু সাইয়্যেদুল মুরসালীন বা আম্বিয়ায়ে কেরামের দলপতি তাই সত্য-সাধনায় তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষাও হবে সর্বাধিক এবং তাঁর এস্তেকামত বা সত্যের প্রতি মনের দৃঢ়তাও হবে অধিকতর। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর মক্কার সংগ্রামী জীবনের তেরটি কঠিন বছরের প্রতিটি ঘটনায়। এমনিভাবে এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় হিজরতের ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন তিনি রাতের অন্ধকারে তাঁর স্থানে হযরত আলী (রাঃ)-কে রেখে একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন মদীনা শরীফের দিকে। হিজরতের এক বছর পর বদর রণাঙ্গণে যখন তিনি মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র-প্রায় সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে সহস্র অশ্বারোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত হয়েছিলেন, আর বদরের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয়ে দোয়া করে বলেছিলেনঃ

اللهم ان تهلك العصابة لم تعبد

"হে পরওয়ারদেগার! যদি এই দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে আর তোমার বন্দেগী করা হবে না"। সত্য-নিষ্ঠা, সত্যের জন্যে মনের দৃঢ়তা, সত্যের উপর এস্তেকামত তাঁর কত বেশী ছিল তা পরিলক্ষিত হয়েছিলো বদরের রণাঙ্গণে। এমনিভাবে ওহোদের যুদ্ধে যখন তিনি আহত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর চারটি দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিল, মাথা ফেটে রক্ত ঝরছিল তখনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যের প্রতি তাঁর মনের দৃঢ়তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন সারা আরবের কাফের শক্তি যুক্তফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ রক্ষা করার জন্যে ইতিহাসের প্রথম পরিখা খনন করেছিলেন, অন্য সবার মত মাটির বোঝা তিনি নিজেও মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, রসদের অভাব ছিল চরম, তাঁর পেটে তিন তিনটি পাথর বেঁধে রেখেছিলেন, সত্যের জন্যে, ইসলামের জন্যে, মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্যে দুশমনের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদে রত ছিলেন এবং দুশমনের মোকাবেলায় ছিলেন অটল অবিচল, তখনও তাঁর মনের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আলোচ্য আয়াতের প্রতি কীভাবে আমল করেছিলেন তার প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়রিয়ার চুক্তির সময়ও। তিনি আল্লাহর ঘরে হাযিরী দেবেন। এ উদ্দেশ্যেই ১,৪০০ সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে আগমন করেছিলেন সুদূর মদীনা শরীফ থেকে। মক্কা শরীফ থেকে মাত্র ৯ মাইল দূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেররা তাঁকে বাঁধা দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি যুদ্ধ করার জন্যে আসিনি। যদি মক্কার কোয়ায়শরা আমার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে চায় তবে আমি তাতেও রাজি আছি। অনেক ঘটনার পর অবশেষে কোরায়শরা শান্তি চুক্তি করতে রাজি হলো। কিন্তু অনেক অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সফল হলেন।

এ ঘটনায় তাঁর মনের দৃঢ়তা ও সত্য-নিষ্ঠার জ্বলন্ত প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে আদেশ দিয়েছেন তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর পূতঃপবিত্র জীবনের প্রতিটি ঘটনা। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এ পর্যায়ে শুধু আরেকটি ঘটনা পেশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোনায়েনের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে বার হাজার সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাদের মধ্যে দু' হাজার ছিলেন নও মুসলিম, যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করেছিলেন। মুসলমানদের অগ্রভাগে ছিলেন নও মুসলিমগণ। দুশমন যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো, নও মুসলিমগণ তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকতে পারেননি। ফলে তারা পশ্চাদপসরণ করলেন, পরিণামে সমগ্র মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলো।

কিন্তু যিনি একা হাজার হাজার আক্রমণকারী দুশমনের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেনঃ

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মোত্তালিবের পৌত্র"। এটি ছিল তাঁর সত্য-নিষ্ঠা ও সংকল্পের দৃঢ়তা এবং আলোচ্য আয়াতের প্রতি তাঁর আমলের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এস্তেকামত তথা সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَقِمْ

"আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক সত্য দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকুন"।

এ এস্তেকামতের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক।

১. আকিদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এস্তেকামত অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বাকে যাবতীয় গুণাবলীর কেন্দ্রবিন্দু মনে করা। আল্লাহ পাকের যাবতীয় গুণাবলীতে বিশ্বাস করা, আর এ বিশ্বাস রাখা যে, কোন সৃষ্টির গুণ আল্লাহ পাকের কোন গুণের ন্যায় নয়। বান্দাকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে না করা এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতাবানও মনে না করা, বরং এ দু'য়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

২. আমলের ক্ষেত্রে এস্তেকামত অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে বিধান আসে তা পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা, তাতে হেরফের না করা।

৩. এবাদত এবং যাবতীয় লেনদেনে প্রত্যেকের হক্ব আদায় করা, এবাদতের নিয়ম কানুন যথারীতি পালন করা।

হযরত সুফিয়ান এবনে আবদুল্লাহ সকফী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন কোন কথা বলে দিন যা আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তিনি এরশাদ করলেনঃ

امنت بالله

"আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি"-এ কথার উপর সুদৃঢ় থাক (মুসলিম শরীফ)। অর্থাৎ সঠিক পথে থাক। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের পর ঈমান মোতাবেক জীবনের যাবতীয় কাজ করার মাধ্যমেই এস্তেকামতের হক্ব আদায় করা যায়।

এজন্যেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ এস্তেকামতের অর্থ হলো আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করা। এদিক সেদিক না যাওয়া। মূলতঃ আলোচ্য আয়াতের আদেশ এস্তেকামত তথা সত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ অর্থাৎ এর উপর আমল করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেনঃ কারামতের চেয়েও উচ্চতর মর্তবা হলো এস্তেকামতের।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন এস্তেকামতের প্রতীক, সংকল্পের দৃঢ়তার প্রতীক। কিন্তু তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের সকলে এ গুণের অধিকারী হবেন এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। এ এস্তেকামতের ব্যাপারে উম্মতের কি অবস্থা হবে তার চিন্তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।[১]

وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সীমালঙ্ঘন না করার তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন না করা।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দ্বীন সহজ, যে এর মধ্যে কঠিন পথ অবলম্বন করবে সে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তার দৈহিক শক্তি নিঃশেষ হবে এবং সে ব্যর্থ হবে। অতএব, তোমরা সহজ সরল পথ অবলম্বন কর, মানুষকে সাফল্যের সুসংবাদ দান কর, তথা দ্বীনকে কঠিন করে মানুষকে নিরাশ করোনা। (বোখারী, নাসায়ী)

وَلَا تَطْغَوْا

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ বাক্যটির অর্থ লিখেছেনঃ তোমরা সীমালঙ্ঘন করোনা, কোন ব্যাপারেই চরম পন্থা অবলম্বন করোনা, আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ বলেছেনঃ তোমাদের প্রতি যা আদেশ দেয়া হয়েছে তার বরখেলাফ করোনা, যাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে তাকে হারাম মনে করোনা, আর যাকে হারাম বলা হয়েছে তাকে হালাল মনে করোনা।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করোনা। মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা তৌহিদের সাথে শেরককে সংযুক্ত করোনা।

إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন। আর তোমাদের আমল অনুযায়ী তিনি তোমাদেরকে বিনিময় দান করবেন।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯
[২]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৩

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى
لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

তরজমা

(১১৩) আর তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা, নতুবা অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। অতএব, তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

(১১৪) আর তোমরা দিনের দু' প্রান্তেই নামায কায়েম করবে এবং রাতেরও কিছু অংশে। নেক কাজ অবশ্যই গুনাহ দূর করে দেয়, যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্যে এ উপদেশ।

(১১৫) আর সবর অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না।

(১১৬) তোমাদের পূর্বযুগের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম, তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত নেককার ছিলনা, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে বাধা দিত। আর যারা পাপীষ্ঠ ছিল তারা আরাম-আয়েশের পথেই ছিল, তারা ছিল গুনাহগার।

(১১৭) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে কোন জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ সেখানে থাকবে সৎ লোক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্বপ্রথম দ্বীন ইসলাম বা সরল সঠিক পথের উপর সুদৃঢ় থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। (فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ) এরপর সীমালঙ্ঘন না করার নির্দেশ প্রদান

করা হয়েছে। (وَلَا تَطْغَوْا) আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- (وَلَا تَرْكَنُوْا) শুধু নিজেরা সীমালঙ্ঘন না করলেই চলবে না; বরং যারা সীমালঙ্ঘন করে সেই জালেমদের প্রতি আকৃষ্টও হবে না, তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্কে রাখবে না, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-জীবনধারা বা কোন আচার-আচরণকে পছন্দ করবেনা। তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা একান্ত জরুরী মনে করবে। তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক বিষতুল্য মনে করে তাদের থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকবে।

কাফের মুশরেকদের সাথে সম্পর্কের পরিণাম ভয়াবহ

হে মোমেনগণ! যদি তোমরা কাফের মুশরেক বে-দ্বীনদের থেকে দূরে না থাক তবে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ আর তাহলো,

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

তাদের অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, তাদের অগ্নিতে তোমরাও পুড়ে মরবে, এজন্যেই পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে ইহুদী নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ .....الاية

(সূরা মায়েদা, আয়াত-৫১)

"হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"।

এ আয়াতে ইহুদী নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার আদেশ হয়েছে, আর অন্য আয়াতে কোন কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার বিশেষ নির্দেশ এসেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ

"হে মোমেনগণ! কোন কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা"।

বর্তমান যুগে কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে সামগ্রিকভাবে তার ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে সমগ্র মুসলিম জাহানকে। কেননা, পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করার পরিণতি শোচনীয় হবে–এটিই স্বাভাবিক। এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই, কোন সাহায্যকারী নেই (হে মোমেনগণ!) যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব কর তবে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।[১]

---

[১]। ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন-তফসীরে নূরুল কোরআন ৯-৬, পৃষ্ঠা-২৭১-৭৩

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

অর্থাৎ-"জালেমদের প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হয়োনা, যদি তা কর তবে তাদের অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কাফের মুশরেকদের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসা পোষণ না করা, তাদের প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি না হওয়া।

আবুল আলীয়া বলেছেন, এর অর্থ হলো জালেম বা কাফের মুশরেকদের কোন কাজ পছন্দ করোনা। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো জালেমদের ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করোনা। যারা সীমালঙ্ঘনকারী, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্যকারী, যারা আল্লাহর রসূলের বিরোধিতাকারী, যারা দ্বীন ইসলামের প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী তাদের ব্যাপারে কোন মোমেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই তাগিদ করা হয়েছে।

একরামা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো জালেমদের কথা মেনে চলোনা, তাদের আদর্শ গ্রহণ করোনা।

আর বয়যাবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা সীমালঙ্ঘনকারী, যারা সত্যের দুশমন তাদের প্রতি মোমেনদের সামান্যতম আকর্ষণও যেন না থাকে। আর সামান্য আকর্ষণের তাৎপর্য হলো সীমালঙ্ঘনকারী লোকদের জীবন-ধারাকে পছন্দ করা, তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তাদের সম্মান করা, এ হলো সামান্য আকর্ষণ।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, জালেমদের প্রতি সামান্য আকর্ষণের কারণে যখন দোযখের শাস্তি অবধারিত হয় তবে জালেমদের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এক ব্যক্তি কোন ইমামের পেছনে নামায আদায় করছিল, ইমাম সাহেব নামাযে এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, ঐ ব্যক্তি এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর যখন তার চেতনা ফিরে আসে তখন তাকে অজ্ঞান হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, জালেমদের প্রতি সামান্য আকর্ষণের যখন এত বড় কঠিন শাস্তি এমন অবস্থায় যারা জুলুম করে, যারা সীমালঙ্ঘন করে, যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ হবে– এ কথা চিন্তা করা মাত্র আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, দ্বীন ইসলাম দু'টি لَا ("না") এর মধ্যে রয়েছে একটি وَلَا تَطْغَوْا। অর্থাৎ নিজে সীমালঙ্ঘন করোনা অন্যটি لَا تَرْكَنُوْٓا। অর্থাৎ যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের প্রতিও আকৃষ্ট হয়োনা।

ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় সেই আলেম, যে জালেমের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে গমন করে।

হযরত আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন লোককে জালেম জেনে শুনে তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে যায় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি বলেছিল, জালেম নিজেরই ক্ষতি করে, অন্যের নয়। একথা শ্রবণ করে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বলেছিলেনঃ অন্যের ক্ষতি কেন নয়, কারণ জালেমের জুলুমের কারণে পাখি পর্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে মোমেনদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হলো যেন তারা এস্তেকামত তথা ন্যায় বিচারের উপর সুদৃঢ় থাকেন, এদিক সেদিক আকৃষ্ট না হন।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "জালেম" শব্দ দ্বারা কাফের এবং মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন কাফের মুশরেকের সঙ্গে আন্তরিক প্রীতি এবং ভালবাসার সম্পর্ক রাখার অনুমতি নেই, এটি ঈমানের দাবী। তিনি আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে তা শুধু তাদের জন্যে, যারা কাফেরদের প্রতি সামান্য আকর্ষণ অনুভব করে। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কুফরী ও নাফমানী আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে কত অপ্রিয়, কত নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য।

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ লিখেছেনঃ নিঃস্প্রয়োজনে কাফেরদের পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্যায় কাজের ব্যাপারে নীরবতা পালন করা এবং তাদের সম্মান করা এবং শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ব্যতীত তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা- এসবই আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।[২]

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

(যদি তোমরা কাফেরদের প্রতি আকৃষ্ট হও, এমন অবস্থায়) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও থাকবেনা এবং তোমাদের কোন সাহায্যও করা হবেনা। অর্থাৎ- আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমরা কোন সাহায্য লাভ করবেনা। অথবা অন্য কোন পক্ষ থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কেননা, যাকে আল্লাহ পাক আযাব দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন, তাকে কে সাহায্য করতে পারে। অতএব, মোমেনের কর্তব্য হল শুধু এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা, তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা। কোন কাফের মুশরেকের সাহায্য লাভ হবে– এ আশায় তাদের প্রতি যদি মনের আকর্ষণ হয় তবে আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০০
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৫
[২]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮২
[৩]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০১

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ

"(হে মোমেনগণ!) আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমাদের জন্যে কোন সাহায্য নেই"।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের মোকাবেলায় তোমাদেরকে আল্লাহর-আযাব থেকে কে রক্ষা করবে? অর্থাৎ-আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই, এরপর তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবেনা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবেনা। কেননা, কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমাদের প্রতি আযাবের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর এ সিদ্ধান্তে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। অতএব, তোমাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হয়না।

প্রশ্ন হতে পারে, বাক্যের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ) আর শেষাংশেও (ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ) সাহায্য না করার কথাই ঘোষিত হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ প্রশ্নের জবাবে লিখেছেনঃ আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মোমেন যদি কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের কোন সাহায্য নেই। আর আয়াতের শেষাংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এমন অবস্থায় তোমরা কোন সাহায্যই লাভ করবেনা।[১]

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেকদের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার, কোনভাবেই তাদের প্রতি ঝুঁকে না পড়ার নির্দেশ রয়েছে মোমেনদের প্রতি।

আর যারা আল্লাহ্ পাকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাফেরদের সাথে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কাফের মুশরেকদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে এক আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হও। তাঁর নৈকট্য-ধন্য হও, আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করলেই তোমরা তাঁর রহমত পাবে। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা হল নামায তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ

দিনের দু'প্রান্ত অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে তোমরা নামায কায়েম কর। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মিনতি প্রকাশ কর।

---

[১]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৫-৫৬

নামায কায়েম করার তাৎপর্য

আল্লামা আলুসী (রঃ) নামায কায়েম করার তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছেনঃ তা হল সঠিকভাবে নামায আদায় করা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হল সর্বদা নিয়মিত নামায আদায় করা। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এর তাৎপর্য হল ওয়াক্তের শুরুতেই নামায আদায় করা। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আলোচ্য আয়াতের আদেশ কি শুধু আপনার জন্যে না সকলের জন্যে? তিনি এরশাদ করলেন, সকলের জন্যে। দিনের দু'প্রান্ত অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা। রাতের কিছু অংশ অর্থাৎ রাতের সে অংশ যা দিনের সঙ্গে সংযুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সকাল এবং সন্ধ্যা বলে ফজর এবং মাগরিবের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। আর রাতের কিছু অংশ বলে এশার নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, দিনের দু' প্রান্ত বলে ফজর এবং আছরের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর রাতের কিছু অংশ বলে মাগরিব এবং এশার কথা বলা হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ প্রথম প্রান্ত দ্বারা ফজর এবং দ্বিতীয় প্রান্ত দ্বারা জোহর, আছর এবং রাতের অংশ দ্বারা এশার নামায উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, রাতের অংশ বলে মাগরিব এবং এশার নামাযকে বোঝানো হয়েছে।

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

(আর নিশ্চয় নেক আমল সমূহ গুনাহগুলোকে দূরীভূত করে দেয়) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে মুসলমানের দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে যায়, এরপর সে অজু করে দু' রাকাত নামায আদায় করে, তবে আল্লাহ পাক তার গুনাহ (ছগীরা) মাফ করে দেন।

একবার হযরত ওসমান (রাঃ) অজু করলেন, পরে বললেন, আমি এভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অজু করতে দেখেছি এবং তিনি এরপর এরশাদ করেছেনঃ যে আমার অজুর ন্যায় অজু করবে, এরপর দু' রাকাত নামায আদায় করবে, আর নামায অবস্থায় মনে মনে কথা না বলবে, তবে তার পূর্বে কৃত গুনাহ (ছগীরা) মাফ করে দেয়া হবে।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত ওসমান (রাঃ) অজু করলেন, এরপর বললেন, আমার এ অজুর ন্যায়ই অজু করতেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আমার অজুর ন্যায় অজু করে এবং দাঁড়িয়ে জোহরের নামায আদায় করে তবে সকাল থেকে এ পর্যন্ত যা গুনাহ (ছগীরা) হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়। এরপর আছরের নামায আদায় করে, তবে জোহর থেকে আছর পর্যন্ত যা গুনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়। এরপর মাগরিবের নামায আদায়

করে, তবে আছর থেকে মাগরিবের মধ্যে যা গুনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়। এরপর সে এশার নামায আদায় করে, তখন মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত যা গুনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়। পরে সে নিদ্রিত হয়। সকালে উঠে ফজরের নামায আদায় করে। তখন এশা থেকে ফজর পর্যন্ত যা গুনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়। মূলতঃ এ হলো সেই নেক আমল যা গুনাহ (ছগীরা) সমূহকে দূরীভূত করে দেয়।

আর এটিই হলো আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা। অন্য একখানি হাদীসেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সম্মুখে একটি নহর প্রবাহিত হয়, আর সে প্রতিদিন ঐ নহরে পাঁচবার গোসল করে তবে কি তার দেহে সামান্যতম ময়লাও থাকতে পারে? লোকেরা বলল, অবশ্যই নয়। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এটিই হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত, যে নামাযের কারণে গুনাহ (ছগীরা) মাফ করা হয়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমূহ এবং জুমা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত, রমজান পরবর্তী রমজান পর্যন্ত কাফ্ফারা। যদি কোন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এক নামায থেকে আরেক নামায পর্যন্ত যে গুনাহ হয় তা পরবর্তী নামাযের কারণে মাফ হয় আর সে গুনাহ হল সগীরা। কেননা, কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্যে তওবা একান্ত জরুরী। আর তওবা হল কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, ভবিষ্যতে এমন অন্যায় না করার সংকল্প গ্রহণ করা এবং ঐ সংকল্পের উপর সুদৃঢ় থাকা। আর যদি হক্কুল এবাদ পর্যায়ের গুনাহ হয় তবে হক্বদারকে হক্ব আদায় করা। আর যদি কোন ফরজ ওয়াজিব এবাদত না করা হয় তবে তার কাজা একান্ত জরুরী।

মুসনাদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যেভাবে তোমাদের মধ্যে জীবিকা বিতরণ করেছেন ঠিক সেভাবে নৈতিক গুণও বিতরণ করেছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়ার সম্পদ সে ব্যক্তিকেও দান করেন যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, আর সে ব্যক্তিকেও দান করেন যার প্রতি তিনি রাগান্বিত, তবে দ্বীন শুধু সে ব্যক্তিকেই দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন।

অতএব, যার মধ্যে দ্বীন পাওয়া যায়, বুঝতে হবে যে নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন। সেই আল্লাহ পাকের শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, বন্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হয়না যতক্ষণ তার অন্তরে এবং রসনা মুসলমান না হয়। (অর্থাৎ যতক্ষণ অন্তর এবং রসনা ইসলামী বিধি-নিষেধের অনুগত না হয়) আর বন্দা সে পর্যন্ত ঈমানদার হয়না যে পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার উৎপীড়নের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, কেমন উৎপীড়ন? তিনি এরশাদ করলেন, প্রতারণা এবং জুলুম। মনে রেখো, যে হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, এরপর তা থেকে ব্যয় করে, আল্লাহ পাক তাকে বরকত থেকে মাহরুম করেন। আর যদি সে হারাম সম্পদ থেকে সদকা করে তবে তা কবুল হয়না। আর যদি সে উত্তরাধিকার স্বরূপ তা রেখে মারা যায়, তবে তা তার জন্যে দোযখের অগ্নির ইন্ধন হয়। মনে রেখো, আল্লাহ পাক মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না।

হযরত আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত সালমান (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি গাছের শুকনো ডালাকে ধরে নাড়া দিলেন, তখন শুকনো পাতাগুলো ঝরে গেল। তখন তিনি বললেন, আবু ওসমান! তুমি জিজ্ঞাসা করলে না, আমি এমনটি কেন করলাম? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি বলুন, তখন তিনি বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও আমার সঙ্গে এমন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন কোন মুসলমান বন্দা ভালভাবে অজু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তবে তার গুনাহ (ছগীরা) এভাবে ঝরে যায়। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যদি কোন কারণে মন্দ কাজ হয়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নেক কাজ করে নাও যেন তা মন্দ কাজকে দূরীভূত করে। আর মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার কর।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমার দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে কোন নেক কাজ কর যেন গুনাহ দূরীভূত হয়। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করাও কি নেকী? তিনি বললেন, এটি উত্তম নেকী।[১]

ইমাম আহমদ (রহঃ) এই হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত আবুজর (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে একটু নসিহত করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যখন তোমার দ্বারা কোন গুনাহ হয় তখন কোন নেক আমল অবশ্যই কর। কেননা, নেক আমল গুনাহকে দূরীভূত করে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নেক আমলের মধ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করা কি অন্তর্ভুক্ত? তিনি এরশাদ করলেন, সকল নেক আমলের মধ্যে এটি উত্তম।

ذٰلِكَ

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যা আদেশ দেয়া হয়েছে যথা দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা, সীমালঙ্ঘন না করা, কাফেরদের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া-এসব

ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে। অথবা এর অর্থ হল নামাযের নসিহত বা নেক আমল বদ আমলকে মুছে দেয়। এসবই নসিহত তবে সে সব লোকদের জন্যে, যারা নসিহত গ্রহণ করে। যারা কোন শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা তাদের জন্যে তা উপকারী হয়না। অতএব, যারা কল্যাণকামী, যারা বাস্তববাদী, যারা পরিণামদর্শী তারা এ সব নসিহত গ্রহণ করে এ জীবন ও পরজীবনকে সার্থক ও সফলকাম করে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ নেক আমল বদ আমলকে তিন ভাবে দূরীভূত করে।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭

১. নেক আমলের কারণে গুনাহ্ মাফ হয়।

২. নেক আমলের অভ্যাস হলে পাপাচারের প্রভাব লাঘব হয়।

৩. নেক আমলের কারণে আবহাওয়া ও পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর হয়। পাপাচারের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অবশ্য সকল অবস্থাতেই নেক আমলের পাল্লাভারী হওয়া পূর্বশর্ত।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, নেক আমল হল নূর। আর পাপকার্য হল অন্ধকার। তাই অন্ধকারের পরে যখন নূর আসবে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই অন্ধকার দূর হবে। অবশ্য নূরের পরিমাণ যত বেশী হবে বা নূর যত শক্তিশালী হবে সে পরিমাণই অন্ধকার দূর হবে। এটি একটি নীতি কথা ঘোষণা করা হল যে, নেক আমলের বরকতে গুনাহ মাফ হয়। নেকী পাপাচারের অন্ধকারকে দূরীভূত করে, আর একথাও প্রমাণিত হচ্ছে, নেক আমল সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান হল নামাযের। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে যথাযথভাবে নামায কায়েম করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর বন্দা তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়।[১]

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সকল গুনাহর কাফ্ফারা হয় যদি কবীরা গুনাহ থেকে কেউ আত্মরক্ষা করে। অর্থাৎ যদি কেউ কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখে তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বরকতে সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের الحسنٰت। (নেক আমল সমূহ) এর ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, নেক আমল হল কোন বন্দার "সোবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার" বাক্য সমূহ পাঠ করা।[২]

এ আয়াতে নেক আমল তথা সৎ কাজের প্রতি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটি ইসলামী জীবন বিধানেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদে এর দৃষ্টান্ত বিরল। প্রত্যেকটি নেক আমলই কল্যাণকর, শুভ পরিণতির উপকরণ। জীবন-সাধনাকে সার্থক করার মাধ্যম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নেক আমল তথা সৎ কাজের আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হল সৎ কাজ অসৎ কাজের প্রতিক্রিয়াকে দূরীভূত করে, অতএব সৎ কাজে দু'টি উপকার রয়েছেঃ

১. সৎ কাজ মানব জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে।

২. কৃত অসৎ কাজের গুনাহকে দূরীভূত করে। নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করার এর চেয়ে কার্যকর পন্থা আর কি হতে পারে! যদি মানুষ আল্লাহ পাকের এ বিধানকে নিজেদের পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কার্যকর করে তবে পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে, কলহ-দ্বন্দ্ব কমে যাবে। ভ্রাতৃত্বভাব ও মমত্ববোধ জাগ্রত হবে। আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের ক্ষেত্রে এ বিধান রেখেছেন যে, যদি বন্দা নেক আমল করে তবে তার বদ আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হবেনা। ঠিক এমনিভাবে মানুষ যদি পরস্পরের গুণের প্রতি

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৯৮

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮ দ্রষ্টব্য।
তফসীরে তাবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০

লক্ষ্য রাখে, দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তবে পরস্পরের সম্প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।[১]

আল্লামা আলুসী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের الحسنات শব্দের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং অন্যান্য নেক আমল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন একখানি হাদীসে রয়েছে যে, আরাফার দিনের রোজা তার পূর্বের এবং পরের গুনাহর কাফ্ফারা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে খাবার পরে এ দোয়া পাঠ করে আল্লাহ পাক তার আগের পরের গুনাহ (সগীরা) মাফ করে দেন। দোয়াটি হল এই,

الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة

এমনিভাবে যে নতুন পোষাক পরিধান করে এ দোয়া পাঠ করবে তার জন্যেও অনুরূপ সু-সংবাদ রয়েছে। দোয়াটি হল এই–

الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة

আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেছেন, এ সমস্ত হাদীসে যে গুনাহ মাফ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা হল সগীরা গুনাহ। কেননা, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। এর দলিল হিসেবে তিনি মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।[২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মওলানা থানভী (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীর কারণে মর্দে মোমেনের অন্তরে যে নূর পয়দা হয় তা গুনাহর অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেয়। আর আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে তথা সত্য-সাধনার ফলে মানব অন্তরে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তা পাপ প্রবৃত্তিকে দূর করে দেয়।[৩]

وَاصْبِرْ

"(হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন"।

অর্থাৎ- (হে রসূল!) আপনার সম্প্রদায়ের কাফেরদের তরফ থেকে আপনাকে যে কষ্ট দেয়া হয় আপনি তাতে সবর অবলম্বন করুন। কেননা আল্লাহ পাক এজন্যে আপনাকে এবং আপনার সঙ্গের মোমেনদেরকে অশেষ সওয়াব দান করবেন। আর আল্লাহ পাক কোন নেক আমলের সওয়াব বিনষ্ট করবেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ নামাযের আদেশের পর সবরের আদেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায এবং সবর-এ দু'টি বিষয় একটি আরেকটির সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। নামাযের সঙ্গে সবরের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। আর নামায ও সবরের জন্যে নিয়তের এখলাস বা আন্তরিকতা পূর্বশর্ত।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১২
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৭
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৪৭৩

কেননা নিয়ত সঠিক না হলে তথা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সত্য-সাধনা না করা হলে আল্লাহ পাকের দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।[১]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, যেহেতু সীরাতুল মুসতাকীম বা সরল সঠিক পথের উপর সুদৃঢ় থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তদপুরি কাফের মুশরেকদের থেকে নিজের মনকে রক্ষা করাও কম কঠিন নয়, আর নামাযও অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাই পূর্বের আদেশ সমূহের পর সবর অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেননা,

الصبر مفتاح الفرج

অর্থাৎ- সবর হল সাফল্যের চাবি। অতএব, আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ রয়েছে, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনে যে কর্মসূচী উপকারী হয় তা হল সবর। আর সবর অবলম্বনের তাগিদ হিসাবে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না) এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, সবর অবলম্বনের নির্দেশের পর সবর অবলম্বনকারীদের সওয়াব বিনষ্ট করা হয়না বলা হয়নি; বরং ঘোষণা করা হয়েছে, "নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না"। কেননা, সবর একটি বড় নেক কাজ তাই নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না বলে সামগ্রিকভাবে একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হল। নামাযের পর সবরের উল্লেখ করার আরও একটি কারণ হল এই যে, আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের ব্যাপারে নামায এবং সবর উভয় কর্মসূচীর গুরুত্ব সমধিক। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

(সূরা বাকারা)

"আর তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর এবং নামায দ্বারা"।[২]

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ

"অতএব, তোমাদের পূর্বে অতীত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এমন লোক কেন হয়নি, যাদের মধ্যে পূণ্যের নিদর্শন ছিল, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে বাঁধা দিত, তবে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই এ সৎ কাজ করত, যাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পৃথিবীর বিভিন্ন অপরাধী জাতির ধ্বংসের কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের ধ্বংসের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে তথা যাবতীয় অন্যায় অনাচার থেকে নিজেকে এবং অন্য মানুষকে বাঁচাতে এমন সৎ লোকের বড় প্রয়োজন যারা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। একটা জাতির শুধু উন্নতি-অগ্রগতি নয়; বরং তাকে

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৬

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯৮

রক্ষা করার জন্যেই এমন এক দল লোকের অত্যন্ত প্রয়োজন অথচ পূর্ববর্তী জাতি সমূহের মধ্যে এমন লোক ছিলনা যারা তাদেরকে সত্যের নির্দেশ দেবে এবং অসত্য কাজ থেকে বিরত রাখবে, যেহেতু এমন লোকের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় যাদের উপদেশ অরণ্যে রোদন হয়েছে, ফলে পূর্বকালের সে সব জাতি পাপাচার থেকে বিরত হয়নি।

আর তাই হয়েছে তাদের ধ্বংসের কারণ। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এ মর্মে যে, যদি তোমাদের মধ্যেও ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে একদল লোক সর্বক্ষণ সচেষ্ট না থাকে, তবে তার পরিণাম তোমাদের জন্যে হবে ভয়াবহ।

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ

অর্থাৎ- তাদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই ছিল যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ করেছে, যারা মানুষকে অন্যায় অনাচার থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়েছে, আমি তাদেরকে রক্ষা করেছি।

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

যারা ছিল নাফরমান, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল, তারা অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই তারা আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়েছে।

শাহ আবদুল কাদের (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যদি সৎ লোকের প্রভাব বিস্তার হত, যদি তারা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তবে এসব জাতির মূলোৎপাটন হতো না। এজন্যেই কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে এ পর্যায়ে সতর্ক করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ.....الاية

"আর হে মুসলিম জাতি! তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণকর কাজের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে সফলকাম"।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

এবনে জরীর লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের ظُلْمٌ শব্দ দ্বারা শেরক উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ শুধু শেরকের কারণেই কোন জনপদকে ধ্বংস করা হয়না, যদি তথাকার লোকেরা আত্ম সংশোধনে সচেষ্ট হয়; বরং শেরকের সঙ্গে সঙ্গে যদি পরস্পরের প্রতি জুলুম অত্যাচার, অন্যায়-অনাচার হতে থাকে, বিশেষতঃ যে সমাজে কারো জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ না থাকে, আমানতে খেয়ানত, বেঈমানী, চুরি-ডাকাতি, ওজনে

ফাঁকি, পরস্পরের কলহ দ্বন্দ্ব এবং অবিচার ও ব্যভিচার হতে থাকে, এমন সম্প্রদায়ের জন্যে ধ্বংস নেমে আসে।

তেবরানী এবং আবুশ শেখ হযরত জরীর এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম مصلحون শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল যারা পরস্পর ন্যায়বিচার কায়েম করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাকের রহমত অনন্ত অসীম। এজন্যে যারা আল্লাহ পাকের হক্ব নষ্ট করে তথা শেরক করে শুধু এ কারণে দুনিয়াতে তাদেরকে ধ্বংস করেন না, আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। কিন্তু এক বন্দা যখন আরেক বন্দার হক্ব নষ্ট করে, পরস্পর জুলুম অত্যাচার করে তখন তাদের শাস্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, শুধু শেরকের জন্যে আল্লাহ পাক কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না, যদি তারা পরস্পরের কাজ ইনসাফ ভিত্তিক করে। পক্ষান্তরে, যদি কোন সম্প্রদায় শেরকের মাধ্যমে আল্লাহর হক্ব নষ্ট করে এবং জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে বন্দার হক্ব নষ্ট করে, তখন তারা কোপগ্রস্ত হয়।[২]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, কুফর ও শেরকের চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই নেই। আর ঈমানের চেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ আর কিছুই নেই। অতএব, আল্লাহর আযাবের মূল কারণ হল কুফর ও শেরক আর নাজাত লাভের মূল উপকরণ হল ঈমান এবং শরীয়তের অনুসরণ।

তফসীরকার আতীয়্যাও এ ব্যাখ্যাই করেছেন, তবে তিনি আরো বলেছেন যে, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে শেরক বর্জনের তাগিদ করেছেন এবং শেরকের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টির মূল কারণ সমূহের মধ্যে শেরক অন্তর্ভূক্ত। তাই যারা শেরক করে তারাই সীমালঙ্ঘন করে এবং তারা বাড়াবাড়ির চরমে পৌঁছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয় শেরক হল সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম"।

অতএব, আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে শেরক এবং পরস্পরের জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত থাকা এবং ঈমান ও নেক আমলের কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত জরুরী, এর পাশাপাশি অন্যকে সত্যের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়াও একান্ত কর্তব্য।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৭
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৭৩
[৩]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬০১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৬০

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ
مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا
نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَجَآءَكَ
فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا
يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ط إِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَانْتَظِرُوْا ج إِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ
كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

তরজমা

(১১৮) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।

(১১৯) তবে যাদের প্রতি আপনার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়। আর তিনি তাদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আসলে আপনার প্রতিপালকের কথাই পূর্ণ হয়েছে যে, "আমি জ্বীন ও মানুষ দ্বারা দোযখকে পূর্ণ করবোই"।

(১২০) আর (হে রসূল!) আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আপনার চিত্তকে আমি সুদৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে আপনার নিকট এসেছে সত্য এবং মোমেনদের নিকট এসেছে উপদেশ এবং সতর্কবাণী।

(১২১) আর (হে রসূল!) আপনি বলুন তাদেরকে যারা ঈমান আনেনা, তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাও, নিশ্চয় আমরাও কাজ করছি।

(১২২) তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষা করছি।

(১২৩) আর আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আসমান জমীনের গোপন তথ্য। আর সকল কাজের শেষ গতি তাঁরই নিকট। অতএব, তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখ। আর আপনার প্রতিপালক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরুল কোরআন

হে নবী! যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে সকল মানুষকে একই দ্বীনের উপর একত্রিত করে দিতেন। দুনিয়ার সকল মানুষ এক পথে এক মতে একত্রিত হত। আল্লাহ পাকের জন্যে এ কাজ আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু এটি তাঁর অভিপ্রায় নয়। লোকেরা সর্বদা মতবিরোধ করতে থাকবে। তবে আল্লাহ পাক যার প্রতি দয়া করেন সে দ্বীনের ব্যাপারে

মতবিরোধ থেকে নিরাপদ থাকবে। যে মতবিরোধ করবে তাকে এজন্যেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। আর যাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত হবে তারা আহলে হক্ব বা সত্য পথের অনুসারী হবে। আর যারা দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তারা বাতিলপন্থী হবে। মুশরেক হোক বা ইহুদী নাসারা অথবা অগ্নি পূজক কিংবা মূর্তি পূজক।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ইসলাম বা কুফরের উপরে একত্রিত করে দিতে পারেন। কিন্তু তা হবে তাঁর সৃষ্টি রহস্য বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ। মানুষের মত ও পথ, চিন্তাধারা, জীবন ধারা অন্যান্য অবস্থা সবই হবে বিভিন্ন। এটিই স্বাভাবিক। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এখতেলাফ বা মতবিরোধ হল ধর্মীয় ব্যাপারে। যাদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন তারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের অনুসারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। যেমন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর যারা ভাগ্যবান, তারা তাঁর অনুসারী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আর তাঁরাই নাজাত লাভে ধন্য হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইহুদীদের মধ্যে ৭১ ফেরকা হবে, আর নাসারাদের মধ্যে হবে ৭২ ফেরকা আর এ উম্মতে হবে ৭৩ ফেরকা। একদল ব্যতীত সকলেই দোযখী হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যে দল নাজাত লাভ করবে তাদের পরিচয় কি? তিনি এরশাদ করেছেন, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম যে মত ও পথে রয়েছি, যারা এ মতের অনুসারী হবে, তারাই নাজাত লাভ করবে। (মোসতাদরাক হাকেম)

তফসীরকার আতা (রহঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে তারা মতবিরোধ করবে তারা হল ইহুদী, নাসারা, অগ্নি-পূজক। আর যাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া করবেন, তারা হল ইসলামের সঠিক ও পরিপূর্ণ অনুসরণকারী।

কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, যদিও এই লোকদের দেশ এবং অন্যান্য অবস্থা বিভিন্ন, কিন্তু তারা একই দলভুক্ত-তথা হক্বপন্থী। পক্ষান্তরে, যারা দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে মতবিরোধ করে পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদের দেশ আর দেহ বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তারা একই মত ও পথের অনুসারী তথা বাতিল পন্থী।

হযরত তাউছ (রহঃ)-এর নিকট দু' ব্যক্তি নিজেদের বিতর্ক নিয়ে হাযির হল। আর এ ঝগড়া তাদের মধ্যে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমরা অত্যন্ত বেশী বিতর্ক করছো। তাদের একজন বললো, আমাদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি ভুল বলছো। সে তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত পাঠ করলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ পাক এজন্যে সৃষ্টি করেন না যে তোমরা পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হও; বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর রহমত হাসিল করার জন্যে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের

---

[১]। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯১

وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ

বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক রহমতের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আযাবের জন্য নয়, কোরআনে করীমে রয়েছে এর ঘোষণা

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ "আমি জ্বীন এবং মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি"। আর যারা সঠিকভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করবে তারা অবশ্যই আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, আল্লাহ পাক রহমত এবং এখতেলাফ উভয়টির জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, তাই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, এজন্যেই একদল জান্নাতী হবে আর এক দল হবে দোযখী। যারা জান্নাতী তাদেরকে রহমত লাভের জন্যে, আর যারা দোযখী তাদেরকে মতবিরোধের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) আরো বলেছেন, তোমার প্রতিপালকের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে উভয় ধরনের লোক হবে। একদল দ্বারা জান্নাত আর একদল দ্বারা দোযখ পূর্ণ করা হবে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তিনিই অবগত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাত এবং দোযখের মধ্যে কথা হয়েছে। জান্নাত বলেছে, আমার মধ্যেতো শুধু দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে। আর দোযখ বলে আমাকে বিশেষভাবে অহংকারী এবং জালেমদেরকে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ পাক জান্নাতকে বলেনঃ তুমি আমার রহমত, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমায় দান করব। আর দোযখকে বলেনঃ তুমি আমার আযাব, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার দ্বারা শাস্তি দেব।

তোমরা উভয়ে পরিপূর্ণ হবে, জান্নাতীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এমনকি, আল্লাহ পাক জান্নাতের জন্যে একটি নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং জান্নাতে আবাদ করবেন। দোযখীদের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে এমনকি, অবশেষে আল্লাহ পাক তার উপর স্বীয় কদম মোবারক স্থাপন করবেন। তখন দোযখ বলবে, তোমার ইজ্জতের শপথ! এখন যথেষ্ট হয়েছে।[১]

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৩৯

যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে সমস্ত লোককে একই দলভুক্ত করে দিতেন, অর্থাৎ সকলকে নেককার মুসলমানরূপে গড়ে তুলতেন (যদিও তিনি সকলকে নেককার মুসলমান হওয়ার আদেশ দিয়েছেন)।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা জানা যায় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি ভিন্ন বিষয় এবং তাঁর আদেশ হল ভিন্ন, দু'টি এক নয়। আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষকে মোমেন বানাবার অঙ্গীকার করেননি। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক সবাই মোমেন হত।

وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ

আর তারা সর্বদা মতবিরোধ করতে থাকবে, বিভিন্ন প্রকার বাতিল মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে। কেউ ইহুদী হবে, কেউ খৃষ্টান, কেউ অগ্নি পূজক, কেউ মূর্তি পূজক, কেউ জবরীয়া, কেউ কাদরীয়া, কেউ রাফেজী, কেউ খারেজী, কেউ কমিউনিষ্ট, কেউ এথিষ্ট, কেউ ধর্ম বিরোধী, কেউ ধর্ম বিদ্রোহী, কেউ ধর্ম নিরপেক্ষ।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ

তবে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন, অর্থাৎ সে সব লোক ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ পাক দয়া করে সরল সঠিক পথের হেদায়েত করেছেন। তারা সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসের অধিকারী হবে এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করতে থাকবে। আর পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত লোকেরা মতবিরোধ করতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাদের সম্মুখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটা সরলরেখা টানলেন এবং বললেন, এটিই হল সঠিক পথ। এরপর কয়েকটি আঁকাবাকা রেখা টানলেন এবং এরশাদ করলেন, এগুলো হল ভ্রান্ত পথ, এর প্রত্যেকটি পথে শয়তান বসে আছে এবং সে মানুষকে নিজের দিকে ডাকে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

"আর নিশ্চয় এটি হল আমার সরল সঠিক পথ, তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর, আর অন্য পথের অনুসারী হয়োনা"। (আহমদ, নেসায়ী, দারেমী)

وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ

আর এজন্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ রহমতের জন্যেই আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এ অর্থ গ্রহণ করা হবে তখন যখন ذٰلِكَ সর্বনামের দ্বারা রহমতের দিকে ইঙ্গিত করা হবে।

হাসান বসরী (রহঃ) ও আতা (রহঃ) বলেছেন, ذٰلِكَ সর্বনামটির দ্বারা এখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ এ মতভেদের জন্যেই আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আশহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে এজন্যে সৃষ্টি করেছেন যে, একদল জান্নাতে যাবে আর একদলকে আযাবের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

ফররা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক যাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন তাদেরকে রহমতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আর যারা সত্যের ব্যাপারে মতভেদ করে তাদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন।

ফররা (রহঃ)-এর মতে, ذلك সর্বনামটি দ্বারা রহমত এবং এখতেলাফ উভয় শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এবনে জরীব তবরী (রহঃ) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো তবে সকলেই মুসলমান হয়ে যেত। আর মানুষ সর্বদাই সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন তারা মতবিরোধ করবে না। তফসীরকার আতা (রহঃ) বলেছেনঃ

وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ

তারা সর্বদা মতবিরোধ করতে থাকবে, অর্থাৎ ইহুদী নাসারা এবং অগ্নি পূজক। وَّلَا يَزَالُوْنَ "তবে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করবেন তারাই হবে সঠিক পথের অনুসারী"। মনসুর এবনে আবদুর রহমান বলেনঃ আমি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-কে বললাম, وَّلَا يَزَالُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেনঃ লোকেরা সত্য দ্বীন নিয়ে মতবিরোধ করতে থাকবে, বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করবেন তারা মতবিরোধ করবে না।

আর মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, যারা মতবিরোধ করতে থাকবে; তারা হবে বাতিলপন্থী, আর আল্লাহ পাক যাদের প্রতি দয়া করবেন তারা হবে আহলে হক্ব বা হক্বপন্থী।

وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ

আর এজন্যেই তাদেরকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ হক্বপন্থীদেরকে জান্নাতের জন্যে, আর বাতিল পন্থীদেরকে দোযখের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। একরামা (রহঃ) বলেছেনঃ যারা দ্বীন নিয়ে মতবিরোধ করবে তারা হলো ইহুদী নাসারা আর যাদের প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন তারা হলেন আহলে কেবলা।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৮

কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, যারা দ্বীন নিয়ে মতভেদ করবে তারা হলো পাপাচারী। আর যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক দয়া করেন তারা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। যদিও তাদের বাড়ি-ঘর বিভিন্ন স্থানে হয় কিন্তু তারা এক, অভিন্ন।[১]

মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দয়া মায়ার বিকাশ ক্ষেত্র হিসাবে তিনি তাঁর নেককার বন্দাদের জন্যে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্ পাকের অন্তহীন নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তারা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গজব এবং শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। তাই চরম গজব এবং শাস্তির বিকাশ ক্ষেত্র স্বরূপ তিনি নাফরমানদের জন্যে দোযখ তৈরী করেছেন। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর রহমতের যোগ্য বিবেচিত হয় তারা মোমেন, আর যারা গজবের যোগ্য তারা কাফের। তাই পরস্পরের মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী, ফুলের বাগানে শুধু ফুল থাকেনা থাকে কাঁটাও। ফুল, কাঁটা এবং পাতা মিলেইতো বাগান তৈরী হয়। ফুল আর কাঁটা থাকে কাছাকাছি, পাশাপাশি। ফুল রহমতেরই প্রতীক আর কাঁটা গযবের প্রতীক। যারা সত্যকে অগ্রাহ্য করে, সত্যের বিরোধিতাকে জীবনের একান্ত করণীয় কাজ মনে করে তারা, আর যারা সত্য-সাধনায় রত থাকে তারা এক হতে পারে না। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় দ্বীন ইসলাম প্রচার আরম্ভ করলেন, তখন দু'টি চরিত্র দেখা দিল। একটি ঈমান আর একটি কুফর। ঈমানের প্রতীক হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) আর কুফরের প্রতীক হল আবু জেহেল। ঠিক এমনিভাবে আখেরাতে ঈমানদারদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে দোযখ তৈরী করা হয়েছে। যদি দোযখ তৈরী করা না হত তবে আবু জেহেল, আবু লাহাবকে কোথায় রাখা হত? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

মূলতঃ আপনার প্রতিপালকের কথাই পূর্ণ হয়েছে, একই সঙ্গে জ্বীন এবং মানুষ দ্বারা আমি দোযখকে পরিপূর্ণ করবো। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ পরিহার করেছে, আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তারা দোযখের পথ বেছে নিয়েছে তাই চিরস্থায়ী শাস্তির জন্যে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাঁদের উম্মতের লোকেরা তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাঁরা সকল অবস্থায় সবর করেছেন। অবশেষে কাফের মুশরেকরা কোপগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের আযাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং তারা চিরতরে ধ্বংস হয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা

[১]। তফসীরে তাবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮৫
[২]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩০৪

আল্লাহর নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের অনুসরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন। (হে রসূল!) আপনার নিকট এসব ঘটনা এজন্যে বর্ণনা করছি যেন আপনার মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের চরম নির্যাতনের মুখে আপনার মনে সান্ত্বনা থাকে। এ সূরাতেও সত্য সুস্পষ্ট ভাবে আপনার নিকট প্রকাশিত হয়েছে। এসব মানুষের জন্য শিক্ষণীয় এবং মোমেনদের জন্যে বিশেষ নসিহত।

(হে রসূল!) আপনার উম্মত যেন সত্য তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং তাদের জীবন-সংগ্রামে এসব সত্যকে স্মরণ রাখতে পারে– মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবতারণা।

যাদের মধ্যে সামান্যতম মানবতাবোধ রয়েছে তারা অবশ্যই এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ

(হে রসূল!) যারা ঈমান আনেনা, আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে বোঝাবার পরও যখন তোমরা সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হওনা, আমার আহ্বানে সাড়া দাওনা, তবে এখন তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর, আমিও আমার কর্তব্য পালন করছি, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখার অপেক্ষা করছি। এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণরণ করা হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে। যখন কারো হেদায়েত লাভের ব্যাপারে কোন আশা না থাকে, তখন এমন কথাই বলা হয়। এখানে অপেক্ষা করার অর্থ হল কর্মের পরিণতি প্রকাশ পাওয়ার অপেক্ষা। অর্থাৎ তোমাদের কর্মের পরিণতির অপেক্ষা কর. আমরাও আমাদের কর্মের ফলাফলের অপেক্ষা করছি। আলহামদুলিল্লাহ! বিশ্ববাসী দেখেছে, যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে ইসলাম প্রচারে বাধা দিয়েছিল, তাদের পরিণতি কত শোচনীয় হয়েছে আর অষ্টম হিজরীতে মুসলমানদের মক্কা বিজয় এবং দশম হিজরীতে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক দিনে ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা, পরবর্তীতে মুসলমানদের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার এবং তদানীন্তন কালের রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ববাসী মুসলিম জাতির শুভ পরিণতি লক্ষ্য করে।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে আসমান জমীনের গোপন তথ্য। সব কাজের শেষ গতি আল্লাহ পাকের নিকটই। (হে রসূল!) যদি কাফেররা আপনার প্রতি ঈমান না আনে, আপনার সাথে মন্দ ব্যবহার করে এবং এক আল্লাহর বন্দেগী করতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাদের বিষয় আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দিন। আসমান জমীনের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই, সব কিছুর শেষ পরিণতি আল্লাহ পাকের নিকটই। অতএব, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের বন্দেগী করুন। আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এবাদতের আদেশের পর তাওয়াক্কুলের আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের দ্বারা তখনই উপকৃত হওয়া যায়, যখন বন্দেগীর সঙ্গে তাওয়াক্কুল করা হয়। এবাদত বন্দেগী ব্যতীত শুধু তাওয়াক্কুল যথেষ্ট নয়।[১]

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আর তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পাক গাফেল নন। মোমেনদের এখলাস এবং কাফেরদের নাফরমানী, মুনাফেকদের মুনাফেকী ও দুশমনী সবই তিনি জানেন।

আল্লামা বগভী কা'ব (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তওরাত যে আয়াতের উপর শেষ হয়েছে, সূরা হুদও সে আয়াত দ্বারাই শেষ করা হয়েছে।[২]

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হুদের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর এই মহান সাধনা এবং তফসীরে নূরুল কোরআন সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১০
২। তফসীরে তাবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮৯
তফসীরে মাজেদী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইউসুফ

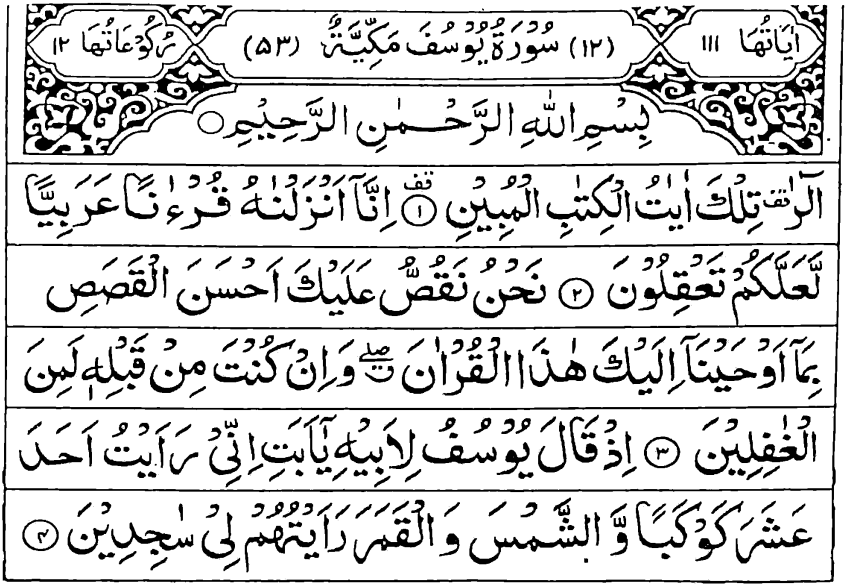

তরজমা

(১) আলিফ-লাম-রা-। এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের।

(২) আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।

(৩) (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে এ কোরআন প্রেরণ করছি। যদিও ইতিপূর্বে আপনি (এ সম্পর্কে) সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন।

(৪) স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমি স্বপ্নে দেখলাম একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখলাম তারা সকলে আমাকে সেজদা করছে।

সূরা ইউসুফ প্রসঙ্গে–

মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এজন্যে তাঁর নামেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। বিগত সূরায় কয়েকজন নবী-রসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় শুধু একজন নবীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক অনেক ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা

করেছেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাকে বার বার বর্ণনা করেননি। কেননা, এ ঘটনা মানুষের ফরমায়েশের কারণে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে তা একই স্থানে একবারে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইনের ঘটনাও একবারই বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা হুদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্ত্বনার জন্যে অতীত কালের ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই সূরা ইউসুফেও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থার অনুরূপ। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রারম্ভিক অবস্থায় সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে–

اول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে (আল হাদীস)। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নবুওয়্যত আরম্ভ হয় একটি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তার বিবরণ।

اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا۔ الاية

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা তাঁকে হিংসা করেছে এবং চরম কষ্ট দিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) চরম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মান-মর্যাদা এবং প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের থেকে কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান"।

এমনকি হযরত ইউসুফ (আঃ) কখনও তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগ করেননি; বরং তাদেরকে অনেক দান-দক্ষিণায় ধন্য করেছেন। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। কোরায়শ গোত্রের লোকেরা তথা তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরম কষ্ট দিয়েছে। সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি তাদের দ্বারা নির্যাতীত উৎপীড়িত হয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক অসাধারণ সবর এবং এস্তেকামতের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। এমনকি, অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ চলে

গিয়েছেন। তারপরও তারা বারে বারে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছে। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন তিনি বললেন–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি পরম দয়ালু।

আরও বললেনঃ اذهبوا انتم الطلقاء "তোমরা আজ মুক্ত"।

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় তিনিও মক্কার কোরায়শদেরকে যখন তারা ইসলাম কবুল করেছে, তখন হোনায়নের যুদ্ধের গণিমত থেকে প্রত্যেককে একশত করে উষ্ট্র দান করেছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর জালেম ভাইদের সাথে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার কোরায়শদের সাথে অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্র-মাধুর্যের প্রমাণ রয়েছে এ ঘটনায়, শয়তান কোনভাবেই তাঁকে কাবু করতে পারেনি, ঠিক এভাবে এতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিরাপদ।

যেভাবে হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল ছিল, ঠিক এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাও পবিত্র কোরআনের আল্লাহর কেতাব হওয়া এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে রয়েছে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-তাঁর ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও সবর অবলম্বন করেছেন, ঠিক তেমনি (হে রসূল)! আপনিও মক্কাবাসীর জুলুম অত্যাচারে সবর অবলম্বন করুন, সত্যের উপর অটল অবিচল থাকুন এবং পরিণামের অপেক্ষা করুন।[১]

শানে নুযুল

এ সূরার শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে।

(১) হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ পবিত্র কোরআন অনেক দিন থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়ে আসছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শ্রবণ করাতেন। ঐ সময় তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি কোন ঘটনা বর্ণনা করতেন, তবে ভাল হত। তখন এ সূরা নাযিল হয়।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১-২

(২) তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে। কেননা, মক্কায় কোরায়শ বংশের লোকেরা তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করছিল, তাতে তাঁর মনক্ষুণ্ন হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনে সান্ত্বনা আসাও স্বাভাবিক।

৩. এ পর্যায়ে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তখন এ সূরা নাযিল হয়।

৪. আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা মক্কার কাফেরদেরকে বলেছিল, যেন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করে যে, বনী ইসরাঈলরা কেন সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা জানতে চেয়েছিল, তখন এ সূরা নাযিল হয়।[১]

এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি হিজরতের সময় মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মধ্যখানে নাযিল হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরার ৪খানি আয়াত ব্যতীত আর সবই মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে। অবশ্য নোহাস, আবুশ শেখ, এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।[২]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা হুদের শেষে এ আয়াত ছিল–

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ

(রসূলগণের এ সকল বৃত্তান্ত (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি যেন এর মাধ্যমে আমি আপনার চিত্তকে সুদৃঢ় করি) এরপর আলোচ্য সূরায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যা সুন্দরতম এবং সর্বোত্তম কাহিনী।

আ'মালুল কোরআন

যে ব্যক্তি সূরা ইউসুফ লিপিবদ্ধ করে ধৌত করে পান করবে তার রিয্ক বৃদ্ধি পাবে এবং সকলের নিকট সে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। (দোরারুন নাযিম)

---

[১]। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৭০
খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯২
[২]। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯

এ সূরাকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীলোকের গলায় তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা হলে এর বরকতে আল্লাহ পাক তাকে নেককার পরহেযগার সন্তান দান করবেন।

বর্ণিত আছে যে, যে কোন দুশ্চিন্তা দূরীভুত করার ব্যাপারে এ সূরা পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী হয়। যেখানে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নাম উল্লেখিত আছে সেখানে ১৫৬ বার "ইয়া আজিজু" পাঠ করবে, আর নিজের মকসুদের কথা মনে রাখবে।

স্বপ্নের তা'বির

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে সূরা ইউসুফ পাঠ করছে তবে তার তা'বির হবে এই, যদিও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার দুশমনী থাকে কিন্তু অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে তার সমাজে সম্মানিত করবেন।

তফসীরুল কোরআন

আলিফ-লাম-রা-। এ অক্ষর গুলোকে "মোকাত্যাআ'ত" বলা হয়।

আল্লাহ পাক ব্যতীত এর প্রকৃত অর্থ কারোই জানা নেই, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীদের এটিই অভিমত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, এ অক্ষরগুলো আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের মধ্যে একটি রহস্য। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ রহস্য সম্পর্কে অবগত। পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ২৯টি সূরা 'মোকাত্যাআত' অক্ষর দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তন্মধ্যে আলিফ, লাম, রা, অক্ষর দ্বারা পাঁচটি সূরা শুরু করা হয়েছে।[১]

পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

"এ আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট কিতাবের"। যেভাবে সূরা ইউনুস শুরু করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সূরা ইউসুফও শুরু করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের প্রারম্ভেও পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে اٰيَات শব্দটি اٰيت শব্দের বহু বচন।[২]

আলোচ্য আয়াতে "কিতাব" বলতে পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা যখনই কোন আয়াত নাযিল হতো তা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হতো, তাই তাকে কিতাব বলা হয়েছে।

---

[১]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩

[২]। আয়াত সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭-৮৮

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে তা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ-পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট গ্রন্থের, যার মধ্যে হালাল হারামের বিবরণ সুস্পষ্টভাবে স্থান পেয়েছে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনের বরকত, হেদায়েত সুস্পষ্ট। আর জুযাজ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআন হক্বকে বাতিল থেকে, হারামকে হালাল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি বর্ণনা অতি সুস্পষ্ট, এতে অস্পষ্টতা বলতে কিছুই নেই, এর নসিহত এবং বিধি-নিষেধ অতি উজ্জ্বল, অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"নিশ্চয় আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে তিনি প্রেরিত, তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেও কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়্যত বাকী থাকবে, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে যা কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রয়েছে এতে হেদায়েত। এর পাশাপাশি একথাও সত্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে আরব দেশে, আরববাসীই পবিত্র কোরআন সর্বপ্রথম পেয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, "নিশ্চয় আমি পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার"। পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার কারণে আরববাসীই সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনের মর্মকথা বুঝবে, তার জন্যে আরবী ভাষায়ই পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা সমগ্র বিশ্ব মানবের কাছে পবিত্র কোরআন পৌঁছে দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদের উপরই অর্পিত হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম এবং মর্মবাণী তাঁরাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করবেন, এটিই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত একথা সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে আরবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক, অতীব মধুর, অত্যন্ত সুন্দর এবং ঐশ্বর্যমন্ডিত। তাই পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এবনে আসাকের তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আদম (আঃ) যখন জান্নাতে ছিলেন তখন তাঁর ভাষা ছিল আরবী। যখন তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোগ করেছিলেন তখন আরবী ভাষা তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু যখন তিনি তওবা করলেন তখন তিনি পুনরায় আরবী ভাষায় কথা বলার তৌফিক পেলেন। বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, তখনও তিনি আরবী ভাষায় কথা বলেছেন। অবশ্য যুগের আবর্তন-বিবর্তনে পরে সুরীয়ানী ভাষা প্রচলিত হয়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) একথাও লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে যে প্রলয়ংকরী বন্যা আসে তার পূর্বে তিনি এবং তাঁর লোকেরা আরবী ভাষায়ই কথা বলতেন। এমনকি

যে ৮০ জন লোক হযরত নূহ (আঃ)-এর ঐতিহাসিক তরীতে আরোহন করেছিল তাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই আরবী ভাষায় কথা বলতেন।

হাকেম মোসতাদরাকে, বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত যাবের (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার পর এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে আরবী ভাষার জ্ঞান দান করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় সর্ব প্রথম কথা বলেছেন। আর আরবগণ হলো হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর।[১] যদিও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মাতৃভাষা ছিল কিবতী। ফিলিস্তিনে অবস্থান কালে তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু তিনি আরবী ভাষায় তবলিগ করতেন। তখন ইয়ামন, হাজরামুত, নাজদ এবং বাত্হা প্রভৃতি এলাকায় তিনি আরবী ভাষায় মানুষকে তৌহিদের দাওয়াত দিতেন।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ সম্পর্কে লিখছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ সর্বোত্তম ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতার মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাহাবাগণ আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কোন ঘটনা বর্ণনা করলে ভাল হতো, তখন নাযিল হলো–

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

অর্থাৎ-আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে একটি অত্যন্ত সুন্দর, অতীব মনোরম, প্রামাণ্য, শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করছি। এ ঘটনায় রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়, অনেক তাৎপর্যবহ কথা। আরও অনেক চিত্তাকর্ষক সঠিক ও সত্য তথ্য রয়েছে যা মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিককে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত করে, উম্মুক্ত করে জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার। এতে রাজা এবং প্রজাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং নারী জাতির চক্রান্তের দৃষ্টান্ত স্থান পেয়েছে। এরপর হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মানুষ মানুষের কত ক্ষতি করতে পারে তারও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। যারা আল্লাহর প্রিয়, তারা কিভাবে সবর করেন এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও দুশমন থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করার যে মাহাত্ম রয়েছে তার অনুপম দৃষ্টান্তও এতে পেশ করা হয়েছে।

খালেদ এবনে মা'দান বলেছেন, সূরা ইউসুফ এবং সূরা মরয়ম জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পাঠ করবেন।

এবনে আতা (রঃ) বলেছেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কোন মানুষ যদি এ সূরা শ্রবণ করে তবে তার দুঃখ দূরীভূত হবে এবং সে লাভ করবে মনের শান্তি এবং সান্ত্বনা।[৪]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৭২
২। আল জামাল ওয়াল কামাল, পৃষ্ঠা-৪২
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উদু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৪০
৪। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১৪

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, বাইবেল এবং অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত নিখুঁত, সুন্দর এবং আকর্ষণীয়ভাবে ঘটনাটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

"(হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি যে এই কোরআন প্রেরণ করেছি"।

وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

যদিও আপনি ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বে-খবর ছিলেন অর্থাৎ এ সম্পর্কীয় ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে আপনি এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অতএব, ওহীর মাধ্যমে যা বাস্তব, যা সত্য তা-ই আপনার নিকট পবিত্র কোরআনের ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে। এটি কোন গল্প বা কোন ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণও নয়; বরং ধ্রুব সত্য, প্রামাণ্য ঘটনা।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনার বর্ণনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল। কেননা তিনি এ ঘটনা দেখেননি, কারো নিকট শ্রবণও করেননি। এমনকি এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থও পাঠ করেননি; বরং আল্লাহ পাকের ওহীর মাধ্যমে সঠিক ঘটনা যা তিনি জানতে পেরেছেন তা বর্ণনা করেছেন।

সুন্দরতম কাহিনী

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এই কাহিনীকে কোরআন "আহসানুল কাসাস" বা সুন্দরতম কাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, এতে সুন্দরতম মানুষের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যেহেতু এ ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর তাই তাকে "আহসানুল কাসাস" বলা হয়েছে। আর এটি শুধু একটি ঘটনা নয়; বরং এতে রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমতের বিবরণ যা তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাক কারো অদৃষ্টে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা খন্ডন করার ক্ষমতা কারোই নেই–এ কথাও সু-স্পষ্টভাবে এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ মানুষ যখন সততা-সাধুতা, ঈমানদারী-আমানতদারীর উপর সুদৃঢ় থাকতে চায়, নিজেকে পাপাচার থেকে রক্ষা করতে চায় আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখে তখন আল্লাহ পাক তাকে এ সত্য-সাধনায় সাহায্য করেন।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য ঘটনায় এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক যদি কোন মানুষকে কোন নেয়ামত দান করেন অন্য মানুষ তাকে হিংসা করে কিন্তু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ তার নিকট থেকে আল্লাহর নেয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেনা। পক্ষান্তরে, হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষনীয় বিষয় এই যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মোমেনের কর্তব্য। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে, তাঁকে অযথা কারাবরণ করতে হয়েছে, তাঁকে তাঁর পিতার নিকট থেকে দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি সবর অবলম্বন করেছেন। তিনি

ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়, এটি ছিল তাঁর মহান আদর্শ। অতএব, এ ঘটনায় রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক মহান শিক্ষা।[১]

হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কিছু তথ্য

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর স্ত্রী রাহীল থেকে তাঁর দু'টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন (১) ইউসুফ (২) বিন ইয়ামিন।

ইউসুফ (আঃ) যখন মাতৃ-গর্ভে তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) সিরিয়ার সফরে ছিলেন। হযরত জীব্রাইল (আঃ) তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন, হে ইয়াকুব! আল্লাহ পাক আপনাকে এমন একটি সন্তান দান করেছেন যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করেননি। আল্লাহ পাক তাঁকে সৌন্দর্যের এক বিরাট অংশ দান করেছেন। ইয়াকুব (আঃ) এ সু-সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরই মধ্যে ইউসুফ (আঃ)-এর জন্ম হয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্র সন্তান লাভের শোকরিয়া স্বরূপ এক হাজার বকরী জবেহ করেন এবং গরীব মিসকিনদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা রাহীল ইন্তেকাল করেন।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক সৌন্দর্যকে দশ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ সমস্ত মানুষকে দিয়েছেন, আর অবশিষ্ট নয় ভাগ একা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দান করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) একদিন আয়নায় তাঁর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্যান্বিত হন। মনে মনে বলেন, যদি আমি কারো গোলাম হতাম তবে কেউ আমার মূল্য আদায় কতে সক্ষম হতো না। এ কথাটির পরিণতিতেই তাঁর ভ্রাতারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল। মাত্র ১৭ দেরহামের বিনিময়ে তাঁকে ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হলো।[২]

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

তফসীকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বয়স যখন ১২ বছর তখন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র তাঁকে সেজদা করছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত করলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, ১১টি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র তাদের স্থান থেকে নীচে অবতরণ করলো এবং আমাকে সম্মান সূচক সেজদা দিল। বায়হাকী হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কস্তান নামক এক ইহুদী এ প্রশ্ন করলো, যে নক্ষত্রগুলো ইউসুফ (আঃ)-কে সম্মান সূচক সেজদা দিয়েছে সেগুলোর নাম বলুনঃ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪

২। বাদায়েউজ্জুহুর ফিওয়াকেরিদ্দহুর-কৃত শায়খ মোহাম্মদ এবনে আহমদ আল হানাফী, পৃষ্ঠা-৯২

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন। এমন সময় হযরত জীব্রাইল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং তাঁকে নক্ষত্রগুলোর নাম বলে দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীকে বললেনঃ আমি যদি এগুলোর নাম বলি তবে তুমি ঈমান আনবে তো?

তখন সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ ১১টি নক্ষত্র হলো (১) জোরসান (২) আত্ তারেক (৩) আজ জোবাল (৪) কাবেস (৫) অমুদান (৬) আলফালিক (৭) আল মুসবেহ (৮) আজ জোরুহ (৯) আল ফরগ (১০) ওসাব (১১) জুল কাতফাইন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে দেখলেনঃ এ নক্ষত্রগুলো এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁকে সেজদা করছে।

ইহুদী বললোঃ আল্লাহর শপথ! নক্ষত্রগুলো এ নামেরই ছিল।

رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِيْنَ

আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা আমাকে সেজদা করছে। স্বপ্নের তা'বির হিসাবে ১১টি নক্ষত্র দ্বারা তাঁর ১১ ভ্রাতাকে বোঝানো হয়েছে, আর সূর্য দ্বারা পিতার দিকে এবং চন্দ্র দ্বারা মাতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

স্বপ্নের তাৎপর্য

স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ

১. মনের কথা, মানুষ দিনে যে কাজে মশগুল থাকে, তার মনে যে সব ভাবনা থাকে রাতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্নেও তাই দেখে। যেমন কেউ যদি নির্বাচনে প্রার্থী হয়, সারা দিন এ কাজেই মশগুল থাকে তবে রাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নেও তাই দেখবে।

২. ভয়ের উদ্রেককারী স্বপ্ন, যা শয়তানের তরফ থেকে দেখানো হয়। এ দু' প্রকার স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা বা তা'বির নেই।

৩. সত্য স্বপ্ন যা শয়তানী ওয়াসওয়াসা এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত, মূলতঃ এগুলোকেই সত্যিকার স্বপ্ন বলা হয়, যার তা'বির করা হয়। এ স্বপ্নগুলোকেই হাদীস শরীফে সত্য স্বপ্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অবগত করা হয়েছে।

যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র আত্মা শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে পবিত্র এবং মুক্ত থাকে, এজন্যে তাঁদের স্বপ্ন ওহী হিসাবে পরিগণিত। যেমন হযরত ইবাহীম (আঃ)-এর স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে জবেহ করছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১৫
খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৫

إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰ

আউলিয়ায়ে কেরাম যেহেতু বে-গুনাহ হন না সেজন্যে তাঁদের স্বপ্ন ওহী রূপে বিবেচিত হয়না। অবশ্য তাঁদের বেলায়েতের মর্তবা যেমন হবে, স্বপ্নের গুরুত্বও তেমন হবে।[১]

ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشَّرَاتُ

হাদীস শরীফে একথাও আছে যে, নবুওয়্যতের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। তবে সুসংবাদের ধারা অব্যাহত থাকবে আর এ সুসংবাদ হল সত্য-স্বপ্ন।

নেয়ামত দু' প্রকার

মূলতঃ আল্লাহ পাকের নেয়ামত দু' প্রকার।

এক. সাধারণ যা মোমেন, কাফের সকলেই লাভ করে। যেমন আল্লাহ পাক সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকলকে লালন-পালন করেন, তিনি সকলকে রিয্ক দান করেন, এসব নেয়ামত মোমেন, কাফের, ভাল-মন্দ সকলেই ভোগ করে।

দুই. খাছ তথা বিশেষ নেয়ামত। যেমন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, আখেরাতে নেক আমলের সওয়াব লাভ করা প্রভৃতি। এ নেয়ামত সমূহ শুধু মোমেনদের বৈশিষ্ট্য। যে স্বপ্ন নবুওয়্যতের ৪৬ অংশের এক অংশ তা মোমেনদের জন্যেই নির্দিষ্ট। এটি হল সত্য স্বপ্ন। হাদীসের ভাষায় "রুইয়ায়ে সালেহা"। সাধারণ স্বপ্ন যে কেউ দেখতে পারে, তাতে মোমেন হওয়া শর্ত নয়, তবে সত্য স্বপ্নের জন্যে নেককার মোমেন হওয়া শর্ত।

স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত নসীব হতে পারে। তিনি নিজেই এরশাদ করেছেনঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে সত্যিই আমাকে দেখে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

ইমাম নববী (রঃ) লিখেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাককেও স্বপ্নে দেখতে পারে (আল্লাহ পাক যে আকৃতি পছন্দ করেন সে আকৃতিতেই তাঁকে দেখা যেতে পারে, যেমন ইমাম আহমদ (রঃ) যিনি দশ লক্ষ হাদীস মুখস্ত করে রেখেছিলেন, তিনি একাধিকবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনকে স্বপ্নে দেখার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ব্যতীত আর কিছু নয়)।

নিয়ম হল মানুষ যখন চক্ষু, কর্ণ এবং রসনা বন্ধ করে নেয়, তখন তার প্রবৃত্তি অনুভূতিহীন হয়ে পড়েনা; বরং অন্য সূত্রে তার কাজ চলমান থাকে। মানব-অন্তর যত পরিচ্ছন্ন থাকে, প্রবৃত্তি যতখানি পবিত্রতা অর্জন করে, ততখানি আল্লাহ পাকের

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬

মা'রেফাতের নূর তার প্রতি বিচ্ছুরিত হয়, ততখানি সততা, সত্য-সাধনা এবং আখেরাতের সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে প্রকাশ পায়। ফলে এ ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়ার সম্পর্ক ক্ষীণ হতে থাকে। আধ্যাত্মিক সাধনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যারা এসব গুণে গুণান্বিত হয়, তাদের স্বপ্ন হয় সত্য। তাই মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا

"তোমাদের মধ্যে যে যত বেশী সত্যবাদী হবে, তার স্বপ্ন ততবেশী সত্য হবে"।

স্বপ্নের তা'বির

যেহেতু স্বপ্ন অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কীয় হয়, যেখানে প্রতিটি বস্তু তার প্রকৃত রূপ এবং গুণাবলীসহ উপস্থিত হয়। কোন কোন সময় কোন বস্তুর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়, কোন কোন সময় তার গুণ পরিলক্ষিত হয়, যে স্বপ্ন দেখে তার অবস্থাও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয়, এজন্যে বিভিন্ন কারণে স্বপ্নের তা'বিরও বিভিন্ন হয়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে জবেহ করছেন, এটি ছিল তাঁর প্রতি পুত্রকে জবেহ করার আদেশ।

হিজরত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এরশাদ করেনঃ আমি দেখলাম, আমি এমন স্থানে হিজরত করছি, যেখানে অনেক খেজুরের বৃক্ষ রয়েছে। স্বপ্নের তা'বির অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ মদীনা শরীফের হিজরতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয় হযরত আয়েশাকে (রাঃ) এবং বলা হয়, "খোল, ইনি তোমার স্ত্রী" আমি খুললাম, "হে আয়েশা! তুমিই ছিলে"। আমি মনে মনে ভাবলাম, এটি আল্লাহর তরফ থেকে। এরপর হযরত আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিবাহ মোবারক সম্পাদিত হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমি দেখলাম কোন কূপ থেকে আমি পাত্র দ্বারা পানি তুলেছি। এরপর আবু বকর দুই বা এক বার পানি তুলেছে। এরপর ওমরের হাতে পাত্রটি বড় হয়ে গিয়েছে এবং সে পূর্ণ শক্তি দ্বারা পানি তুলেছে। এর অর্থ ছিলো, "তখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে"।

তিনি আরও এরশাদ করেন, "আমি দেখলাম কারো পরিধেয় জামা ছোট কারো বড়, এর তা'বির হলো দ্বীন, অর্থাৎ দ্বীন কারো কাছে কম আছে আর কারো কাছে বেশী।

তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ আমি দেখলাম যে, আমাকে দুধের পেয়ালা দেয়া হয়েছে। আমি পান করলাম। এরপর ওমরকে দান করলাম। এটি ছিল এলম।

তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ আমি দেখলাম আমার হাতে দু'টি বালা রাখা হয়েছে। আর তা আমার অত্যন্ত অপছন্দনীয় হয়েছে। এরপর হুকুম হলো ফুঁক দাও। তখন বালা দু'টি উড়ে গেল। এ স্বপ্নের তা'বির তিনি করেছেন দু'জন মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার প্রকাশ পাবে। অবশেষে তাই হয়েছিল। এ দু' মিথ্যুকের একজন ছিল আসওয়াদ আনাসী, আর অন্যজন ছিল মুসায়লামাতুল কাজ্জাব। যেহেতু বালা স্বর্ণের হয়, মূল্যবান হয় এবং ওজনে ভারী হয়। তাই এর তাৎপর্য হলো নবুওয়্যতের দাবী, যা তারা

উভয়ে করেছিল। আর ওজনে ভারী হওয়া সত্ত্বেও উড়ে যাওয়ার তাৎপর্য হলো, নবুওয়্যতের দাবীতে তারা ছিল মিথ্যাবাদী। তাই তারা মর্যাদার দিক থেকে হালকা এবং গুরুত্বহীন হবে। একটু ফুঁকের কারণেই তারা উড়ে যাবে। আর যেহেতু দুনিয়াতে পুরুষের জন্যে স্বর্ণের অলংকার হারাম আর প্রত্যেক হারাম বিষয়ের উপর আল্লাহ্ পাকের গজব এবং লা'নত। তাই এ দু' মিথ্যুক আল্লাহ্ পাকের দরবারে অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্ত।

আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফুঁকের তাৎপর্য হলো তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা এ মিথ্যুকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন এবং নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবীদার আসওয়াদ এবং মুসায়লামাকে হত্যা করেছেন। এতে প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। বিশেষতঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ফজিলতের দিকে রয়েছে ইঙ্গিত।

উম্মে ফজল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম আমার ঘরে আপনার দেহ মোবারকের একটি অংশ রয়েছে। তিনি এরশাদ করেছেনঃ ভাল স্বপ্ন দেখেছ।

ফাতেমার ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, তুমি দুগ্ধ পান করাবে। অবশেষে তাই হয়েছে। কিছু দিন পরেই ইমাম হাসান (রাঃ) বা ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং উম্মে ফজল দুগ্ধ পান করান।

স্বপ্নের তা'বির বর্ণনার সময় কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ

১. পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে যে তা'বির সমূহ রয়েছে সেগুলোর অনুসরণ করা।

২. পবিত্র কোরআনে ও হাদীস শরীফে এ পর্যায়ে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলোর অনুসরণ করা (যেমন পবিত্র কোরআন স্ত্রীদেরকে পোষাক, চন্দ্রকে নূর এবং সূর্যকে আলো বলা হয়েছে। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বীর পুরুষকে বাঘ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৩. কোন বস্তুর আনুষ্ঠানিক যে ব্যাখ্যা হয় তার অনুসরণ করা।

৪. কোন স্বপ্নের এক অংশের তা'বির দেয়া আরেক অংশের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া সঠিক নয়; বরং সকল অংশের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া।

যিনি স্বপ্নের তা'বির করবেন তার অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত মানুষের অবস্থা, আদত-আখলাক সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল হওয়াও জরুরী। এমনিভাবে যিনি তা'বির দেবেন তার ধর্মপ্রাণ হওয়া এবং সত্যবাদী হওয়া একান্ত জরুরী। এতদ্ব্যতীত যিনি স্বপ্নে দেখেছেন তার কল্যাণকামী হওয়াও অত্যাবশ্যকীয়। আর নিজের চিন্তা গবেষণা ও অভিমতের উপর কোন প্রকার অহংকার না থাকাও জরুরী।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের তা'বির বয়ান করতেন ফজরের নামাযের পর। মিথ্যা বানোয়াট স্বপ্ন বর্ণনা করা অত্যন্ত বড় গুনাহর কাজ। কেউ যদি কোন ভয়ংকর বা ভয়-ভীতি সৃষ্টিকারী কোন স্বপ্ন দেখে তবে তার কর্তব্য হলো বা দিকে তিনবার থুথু ফেলবে, তিনবার আউজুবিল্লাহ পাঠ করবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে। এভাবে ঐ স্বপ্ন ক্ষতিকর হবে না।[১]

---

[১]। খোলাসাতুত তাফসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৮-০৫

কেননা যদি স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে ভয় প্রদর্শনমূলক হয় তবে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করলে স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয়।

তিরমিজী ও এবনে মাজা শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ স্বপ্ন তিন প্রকারঃ

১. আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সুসংবাদ ২. মানব মনের চিন্তা-ভাবনা ৩. শয়তানের তরফ থেকে ভয় প্রদর্শন। যদি কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে এবং তা বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয় তবে বর্ণনা করতে পারে।

পক্ষান্তরে, যদি কোন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তবে কারো নিকট যেন বর্ণনা না করে; বরং এমন অবস্থায় নামাযে মশগুল হওয়াই কর্তব্য।

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হয়, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে। যে ব্যক্তি মন্দ স্বপ্ন দেখে সে যেন বাঁ দিকে থু-থু ফেলে এবং শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর ঐ স্বপ্ন কারো নিকট বর্ণনা না করে। ঐ স্বপ্ন তার জন্যে ক্ষতিকর হবে না। আর যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে খুশি হবে কিন্তু যার সঙ্গে তার মহব্বত এবং ভালবাসা রয়েছে সে ব্যতীত আর কারো নিকট ঐ স্বপ্ন বর্ণনা করবে না।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে অন্য সূত্রে এ মর্মের হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১]

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ
كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٥ وَكَذٰلِكَ
يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ
وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝٧ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ
اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٨

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২১

তরজমা

(৫) তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করোনা। নতুবা তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(৬) আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। আর তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দেবেন। যেভাবে তিনি তা ইতিপূর্বে পরিপূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(৭) নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতাদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসাকারীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

(৮) স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইউসুফের ভ্রাতারা বলেছিল, ইউসুফ এবং তাঁর ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। অথচ আমরা একটি সুসংহত দল, নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যেই রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন শ্রবণ করে তার তা'বির উপলব্ধি করলেন। ১১টি নক্ষত্র হলো ১১ জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আর সূর্য চন্দ্র হলো পিতা-মাতা, এরা সকলেই একদিন ইউসুফ (আঃ)-কে সম্মান করবে। স্বপ্ন দ্বারা এ সুসংবাদ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর প্রিয়পুত্র ইউসুফ (আঃ)-কে সতর্ক করলেন, খবরদার! এ স্বপ্ন তোমার ভাইদেরকে বলোনা। কেননা, যদি তারা এ স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত হয় তবে হয়ত তারা শয়তানের প্ররোচনায় তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। সৎ ভাইদের সম্পর্ক সাধারণতঃ ভাল হয়না, এ সত্য সর্বজন-বিদিত এবং স্বীকৃত।

এতদ্ব্যতীত, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঐ ভাইয়েরা সর্বদা তাঁকে হিংসা করতো। এর সত্যিকার কারণতো এক আল্লাহ পাক জানেন। তবে তওরাতে এর দু'টি কারণ লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ

১. অতি শৈশব থেকেই হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আদর্শ সন্তান, অত্যন্ত খোশমেজাজ, উত্তম স্বভাবের অধিকারী, সর্বদা যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী, এ সমস্ত ব্যাপারে তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্রের অধিকারী।

২. এজন্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর এ পুত্রকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসতেন, যা অন্যদের নিকট ছিল অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ, তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁকে হিংসা করতো। ঐ সময় তিনি এ স্বপ্ন দেখেন এমন অবস্থায়, যদি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা এ স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত হয় তবে বিচিত্র নয় যে, তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। এটি ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-

এর আশঙ্কা যে জন্যে তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে সতর্ক করেছেন এবং এ স্বপ্ন তাঁর ভাইদের নিকট প্রকাশ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا

"ইয়াকুব বললেন, "হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তুমি তোমার ভ্রাতাদের নিকট প্রকাশ করোনা নতুবা তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে"। কেননা,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু"। মানুষের সর্বনাশ সাধনে সে সর্বদা ব্যস্ত। স্বপ্নের মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-এর যে প্রাধান্য এবং উচ্চ মর্যাদার কথা প্রকাশ পায় তা তারা কোনভাবেই সহ্য করতে পারবে না। শয়তান তাদেরকে কোন চক্রান্ত করতে প্ররোচনা দেবে। কেননা শয়তান মানুষের চিরশত্রু। মন্দ ও নিন্দনীয় কাজকে শয়তান মানুষের নিকট পছন্দনীয় এবং লোভনীয়ভাবে উপস্থাপন করে। এভাবে মানুষ শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিজের জন্যে ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। তফসীরকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কোরআনের এ কথাটি–এ সত্যেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে নবীর পুত্র হওয়াও যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্যে সর্বদা প্রত্যেককে সকল অবস্থায় সাবধান থাকতে হয় এবং শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পুত্র ইউসুফ (আঃ)-কে স্বপ্ন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যেন তার ভাইদের নিকট তা বর্ণনা না করা হয়। এরপর হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে উৎসাহিত করার জন্যে যা বলেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَذٰلِكَ

অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং তোমার সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি করার সুসংবাদ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি তিনি তোমাকে নবুওয়্যত এবং ক্ষমতা পরিচালনার জন্যে মনোনীত করবেন, তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ তিনি তোমাকে দান করবেন।

رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

আর আল্লাহ পাক তোমাকে স্বপ্নের তা'বির তথা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী করবেন। তিনি তোমাকে অসাধারণ বিচার বুদ্ধি দান করবেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করার তৌফিক দান করবেন, আল্লাহ পাকের মহান বাণী এবং

রসূলগণের বক্তব্যের মাহাত্ম এবং নিগুঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার এবং তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন–

تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

কথা দ্বারা এসব কিছুই বোঝানো হয়েছে।[১]

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন যা তোমার উচ্চ মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে আরো অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করবেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল তোমার প্রতিপালক তোমাকে নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করবেন। আর অন্যান্য তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাক তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তোমাকে আল্লাহ পাক স্বপ্নের তা'বির করার ব্যাপারে পারদর্শী করবেন। পরবর্তীতে দেখা যায় হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের তা'বিরের ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ

"আর আল্লাহ পাক তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করবেন"।

আলোচ্য আয়াতে নেয়ামত অর্থ নবুওয়্যত, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সকল নেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। "আলে ইয়াকুব" শব্দ দ্বারা বনী ইসরাঈলের নবীগণকে বোঝানো হয়েছে।[২]

يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ

(যেভাবে তোমার পিতামহ ইব্রাহীম এবং ইসহাকের প্রতিও আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছিলেন) অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)-এর প্রতি অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছিলেন ঠিক তেমনি তোমার প্রতিও এবং আলে ইয়াকুবের অন্যান্য নবীগণের প্রতিও তিনি তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করবেন। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের নেয়ামত দ্বারা তাঁদেরকে সমৃদ্ধ করবেন, এ পর্যায়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ) শুধু ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)-এর উল্লেখ করেছেন। অত্যন্ত বিনয়ের কারণে নিজের নাম উল্লেখ করেননি।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২২
[২]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮৬
[৩]। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৪৭৬

পিতৃ পুরুষদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছেন। নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো। আল্লাহ পাক তাঁকে অগ্নি থেকে রক্ষা করেছেন এবং অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেছেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শত্রু তথা মানবতার শত্রু নমরুদকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন। আর হযরত ইসহাক (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নবুওয়্যত দান করেছেন। তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নবী ছিলেন। তাঁর পুত্র ইয়াকুব (আঃ)-ও নবী হয়েছেন এবং তাঁর পৌত্র ইউসুফ (আঃ)-ও নবী হয়েছেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم

অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসহাক (আঃ), ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকুব (আঃ) আর ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র ইউসুফ (আঃ)। তাঁরা একের পর এক চার পুরুষ থেকে সকলেই অত্যন্ত মহৎ এবং সম্ভ্রান্ত, সকলেই হয়েছেন নবী। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন এবং বাল্যকালে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মধুর ব্যবহার এবং প্রশংসনীয় আচার-আচরণ এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে হয়তো হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্কে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, তিনি সকলের সম্পর্কে সবকিছু জানেন, কার কি যোগ্যতা, আর কার দ্বারা কি কাজ হবে এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। কাকে কি পদে অধিষ্ঠিত করতে হবে তা তিনি সবচেয়ে বেশী ভাল জানেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী, সবকিছুই তাঁর নখ দর্পণে রয়েছে। আর তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তিনি অত্যন্ত সুবিবেচক। তাই হেকমত এবং বিবেচনা মোতাবেকই সকলের সঙ্গে তিনি যথাযোগ্য ব্যবহার করেন।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ

"নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতাদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসাকারীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে"।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইহুদীদের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় এবং তাঁর নিকট সূরা ইউসুফের কিছু অংশ শুনতে পেয়ে তার

সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে একথা জানায় যে, তৌরাতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা যেভাবে বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবেই হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আমি শ্রবণ করেছি। তখন ইহুদীদের একদল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল, তারাও সেভাবেই প্রিয়নবী (সাঃ)-এর কণ্ঠে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনা শ্রবণ করলো। এরপর তারা জিজ্ঞাসা করলো, এ ঘটনা কে আপনাকে জানিয়েছেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে জানিয়েছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্ন করেছিল যে, ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানেরা কেনান থেকে মিশরে কেন গিয়েছিলেন? তার জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইহুদীরা তাঁর বর্ণনাকে তৌরাতের বর্ণনার মোতাবেক পেয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রশ্নকারী বলতে শুধু ইহুদী নয়; বরং যে কোন প্রশ্নকারীই হতে পারে। কেননা এতে আল্লাহ পাকের তৌহিদ এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'ايت' শব্দটির অর্থ হল নিদর্শন সমূহ তথা শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ, কেননা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনায় অনেক উপদেশ এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একদিকে এতে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের অপূর্ব নিদর্শন সমূহ রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের জীবন্ত নিদর্শন। কেননা তিনি ছিলেন উম্মী। জীবনে তিনি কারো নিকট লেখাপড়া শেখেননি, কোন বই-পুস্তক জীবনেও পাঠ করেননি। অথচ কয়েক হাজার বছর পূর্বের এ ঘটনা তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান না করলে তাঁর পক্ষে তা আদৌ সম্ভব হতো না। এটিই প্রমাণ যে তিনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল, আল্লাহ পাকই তাঁকে সব কিছুর জ্ঞান দান করেছেন। মক্কার মুশরেকদের জন্যে এ ঘটনায় রয়েছে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে হিংসা করতো। কেননা, তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণাবলীর কারণে অত্যন্ত বেশী ভালবাসতেন। শুধু যে তারা তাঁকে হিংসা করতো তাই নয়; বরং তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। তাঁকে জঙ্গলের অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে এবং পিতার নিকট মিথ্যা বিবরণ দেয় যে, বাঘ ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ পাকই দৈহিক সৌন্দর্য এবং চারিত্রিক ঐশ্বর্য দানে ধন্য করেছেন। আর আল্লাহ পাকই তাঁকে রক্ষা করেছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করেন। তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর। অবশেষে যখন আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত করেন তখন তাঁর প্রাণের শত্রু বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে তাঁর নিকট আল্লাহ্ পাকই হাযির করেন। তারা তাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। তিনি তাদের সাথে উদারতা মহানুভবতার পরিচয় দেন। এতেও রয়েছে বিশেষ নিদর্শন, মহান শিক্ষা, যারা জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। একদিকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন, অন্যদিকে যারা ছিল অহংকারী, যারা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তাদেরকে আল্লাহ্ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকটই সাহায্য প্রার্থী হিসেবে হাযির করেছেন এবং তিনি তাদের সাথে পরম উদার ব্যবহার করেছেন।

ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃপবিত্র জীবনে। মক্কাবাসী তাঁকে "আল আমীন" বা বিশ্বস্ত খেতাবে ভূষিত করেছিল। তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের কারণে তিনি ছিলেন সর্বত্র পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্ পাকের রেসালতের মহান দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন সর্ব প্রথম তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করার আহ্বান জানালেন। তারা তাঁর বিরোধিতা করলো। শুধু তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শুরু করলো নির্যাতন এবং উৎপীড়ন। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করলো। ঠিক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেছিলো অনুরূপ মন্দ ব্যবহারই মক্কাবাসী করেছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। অষ্টম হিজরীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করলেন, তখন মক্কাবাসীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ প্রাথী হলে তিনিও তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-অনুযোগ করলেন না।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) যার তা'বির করেছিলেন, সেই তা'বিরের বাস্তবায়ন হয়েছিল ঠিক আশি বছর পর। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। কিন্তু মক্কায়ে মোয়াজ্জমার সুদীর্ঘ তেরটি বছর মুসলমানদের নির্যাতীত অবস্থায় অতিবাহিত করতে হয়। এমন অবস্থায় কারো মনে এ সাহায্য সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, তাই আল্লাহ্ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেন মোমেনদের মনে সান্ত্বনা আসে এ মর্মে যে বিলম্ব হলেও একদিন তারা আল্লাহ্ পাকের সাহায্য অবশ্যই লাভ করবেন। অবশেষে তাই হয়েছিলো বদরের রণাঙ্গণে, আল্লাহ্ পাক কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেছিলেন।[২]

যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অনেক দিন সবর করতে হয়েছে, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে যে কূপে ফেলেছিল সেখান থেকে এক ব্যবসায়ী কাফেলা তাঁকে তুলে

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩০৬
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৯২

নিয়ে মিশরের বাজারে বিক্রয় করেছিল, সেদিন অনেক ক্রেতা তাঁকে ক্রয় করার জন্যে জমায়েত হয়েছিল। এরপর তাঁকে সুদীর্ঘ সাত বছর কারাবরণ করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হল। আল্লাহ্ পাক তাঁকে মিশরের ক্ষমতা দান করলেন। পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক পুনরায় পিতা পুত্র একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন। সকল পক্ষের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়েছিলো।

ঠিক এভাবেই সুদীর্ঘ তেরটি বছর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নির্যাতীত অবস্থায় অতিবাহিত করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন। তার এক বছর পর আল্লাহ্ পাক জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে বদরের রণাঙ্গণে যখন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন তখন সকলের মনের দুঃখ দূরীভূত হল, অবসান ঘটলো আঁধার যুগের।[১]

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا

(স্মরণ কর সেই সময়কে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা বলেছিল, ইউসুফ এবং তার ভাই আমাদের পিতার নিকট অধিকতর প্রিয়। অথচ আমরা একটি সুসংহত দল) কেননা, তারা ছিল দশজন।

اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছেন"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ছোট ভাই ছিলেন বিন ইয়ামিন, তাঁরা ছিলেন এক মায়ের ঘরের। আর বাকি দশ ভাই ছিল অন্য মায়ের তরফ থেকে। তাঁর অন্য ভাইদের নাম হলোঃ (১) রোবিল, (২) শামউন, (৩) লাবি, (৪) ইয়াহুদা, (৫) রাইয়ান, (৬) ইয়াশযার, (৭) দান, (৮) তাফতালী, (৯) যাদ ও (১০) আশের। অতি শৈশবেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলীর কারণে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে ভালবাসতেন। আর বিন ইয়ামিন সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন, তাই পিতার বিশেষ স্নেহ লাভ করা তার জন্যে অস্বাভাবিক ছিলনা। কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা মনে করলো আমরা শক্তিশালী, আমাদের দলবল বড়। পিতার বার্ধক্যে আমরাই তাঁকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমাদের পিতা ইউসুফ এবং বিন ইয়ামিনকে অধিকতর স্নেহ করেন, তিনি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছেন। অথচ এটি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ভুল ছিলনা, হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মধ্যে নবুওয়্যতের উজ্জ্বল আভাস লক্ষ্য করেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে অধিকতর ভালবাসতেন।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৩

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ
تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝٩ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا
يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝١٠ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ
وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝١١ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا
لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝١٢ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ
اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝١٣ قَالُوْا لَئِنْ
اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝١٤

তরজমা

(৯) ইউসুফকে হত্যা কর, অথবা কোন স্থানে ফেলে আস যাতে করে শুধু তোমাদের প্রতি পিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং এরপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।

(১০) তাদের মধ্যেই একজন বললো, ইউসুফকে হত্যা করোনা, তোমরা একান্তই যদি কিছু করতে চাও তবে তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর, কোন মুসাফির তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাক।

(১১) তারা বললো, হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না কেন? অথচ আমরা তার শুভাকাঙ্খী।

(১২) আগামীকাল আমাদের সঙ্গে তাকে প্রেরণ করুন। সে খুব ভাল খাবার গ্রহণ করবে এবং খেলাধূলা করবে আর নিশ্চয় আমরা তার হেফাজতের জন্যে রয়েছি।

(১৩) ইয়াকুব বললেন, তোমাদের তাকে নিয়ে যাওয়াতে আমি ব্যথিত হই, আমার আশঙ্কা যে, তোমাদের অসাবধানতার কারণে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।

(১৪) তারা বললো, আমরা একটি শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে এমন অবস্থায় নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা যখন উপলব্ধি করলো যে, তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের চেয়ে বেশী স্নেহ করেন এবং তারা এ ধারণাও করলো যে, আমরা শক্তিশালী, আমরা

সুসংহত, পিতার যে কোন আদেশ পালনে আমরা সক্ষম, অথচ ইউসুফ এবং বিন ইয়ামীন বয়সে ছোট, তখনও কোন খেদমতের যোগ্য হয়নি। এমন অবস্থায় পিতার স্নেহের অধিকতর হক্বদার আমরাই। তাই আমাদের পিতা স্নেহ মায়ার ব্যাপারে ভুল করছেন (অথচ হযরত ইয়াকুব (আঃ) লক্ষ্য করেন তাঁর পরে নবুওয়্যত লাভ করবেন হযরত ইউসুফ (আঃ), একজন নবীর মন পরবর্তী নবীর প্রতি আকৃষ্ট হবে, এটিই স্বাভাবিক। যে আল্লাহর পছন্দনীয়, তাকে অধিকতর পছন্দ করাই স্বাভাবিক)। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হল। তাই তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হিংসা করতে লাগলো। হিংসার আগুনে তাদের অন্তর অনেক দিন থেকেই পুড়তে থাকে। তাই ঈর্ষাকাতর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে পরামর্শ করলো, তাদের পরামর্শের বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ

"তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর"।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বোহ (রহঃ) বলেছেন, এ কথাটি শামউন বলেছে। কা'ব (রহঃ) বলেছেন, কথাটি দান বলেছিল, আর তফসীরকার মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, কথাটি রোবিল বলেছিলো। যাই হোক, এ কথা যেই বলুক তাদের অধিকাংশ লোকই এ প্রস্তাবে একমত ছিল। পিতার স্নেহ লাভের ক্ষেত্রে তারা ইউসুফ (আঃ)-কে পথের কাঁটা মনে করলো এবং এ কাঁটা চিরতরে নির্মূল করার পরামর্শ হল। এ পরামর্শে দু'টি প্রস্তাব আসলোঃ

১. ইউসুফকে হত্যা করা,

২. এমন দূর দেশে তাকে নির্বাসিত করা যেন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়। যখন ইউসুফ থাকবেনা তখন পিতা বাধ্য হয়ে তোমাদেরকেই স্নেহ করবেন। বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে তারা কোন গুরুত্ব দেয়নি। কেননা তারা মনে করতো বিন ইয়ামীনের প্রতি পিতার যে ভালবাসা-তা ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর ভালবাসার পরিশিষ্ট মাত্র। যখন ইউসুফ থাকবেনা তার ভালবাসা থাকবেনা, তখন বিন ইয়ামীনের প্রতি ভালবাসাও স্বাভাবিকভাবে কমে যাবে।

اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ

এটি হল তাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ তাকে কোন দূর দেশে নির্বাসিত কর, যাতে করে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। কেননা, ঐ অচেনা অজানা স্থান থেকে ইউসুফ প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, পিতাও সেখানে যেতে পারবেন না। উভয় অবস্থায় পিতা এবং ইউসুফের মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় তোমরাই থাকবে তাঁর সম্মুখে এবং তোমাদেরকেই তিনি ভালবাসবেন।

وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ

(এরপর তথা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার পর তোমরা ভাল মানুষ হয়ে যাবে) অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করবে যে আর এমন পাপাচারে লিপ্ত হবে না। অথবা এর অর্থ হল ইউসুফের বিদায়ের পর তোমাদের কাজ সঠিকভাবে হবে। বর্তমানে তোমাদের যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান হয়ে যাবে তথা তোমরা তোমাদের পিতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, কোন যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়তও পেশ করবে। এভাবে তোমাদের পিতা তোমাদের কথা মেনে নেবেন, পিতার সাথে তোমাদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের কাম্য বস্তু তোমরা পেয়ে যাবে।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের হিংসা যখন বেড়ে গেল তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, আমাদের পিতার নিকট থেকে ইউসুফকে সরিয়ে না দিতে পারলে আমাদের কোন উদ্দেশ্য সফল হবেনা। ইউসুফকে সরানোর দু'টি পথ হতে পারে। তাকে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা নির্বাসনের মাধ্যমে। এ দু' পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করে আমরা ভাল মানুষ হয়ে যাব। অর্থাৎ তওবা করে ভাল মানুষ হয়ে যাব। এর দ্বারা মানব চরিত্রের এ দিকটি উন্মোচিত হল যে, মানুষ যখন কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয় তখন চরম মন্দ কাজও করতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত এ ঘটনায় দেখতে পাওয়া যায়।

ইমাম রাজী (রহঃ) একথাও লিখেছেন, "ইউসুফকে সরিয়ে দেয়ার পর তোমরা ভাল মানুষ হয়ে যাবে"– এতে একথা প্রমাণিত হয় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এ সত্য উপলব্ধি করেছিলো যে, তারা মহাপাপে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। এজন্যেই এ অন্যায় আচরণের পর তওবা করে ভাল মানুষ হওয়ার চিন্তাও করেছে।[২]

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ

"তাদের মধ্যে একজন বললো, "ইউসুফকে তোমরা হত্যা করোনা, তাকে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ কর"।

কাতাদা (রাঃ) বলেছেন এ কথাটি রোবিল বলেছে। আর আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেনঃ এ কথাটি ইয়াহুদা বলেছে। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ এ কথাটি শামউন বলেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ ইয়াহুদার কথাই অধিকতর সঠিক মনে হয়। আর ইয়াহুদার কথার মর্ম হলো এই, তোমরা পিতার অধিকতর স্নেহ পেতে চাও এ উদ্দেশ্যে হত্যার মত গুরুতর অপরাধ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? অতএব, তাকে হত্যা করোনা, এটি কবীরা গুনাহ। তাঁকে তোমাদের পথ থেকে যদি সরাতেই চাও তবে তাকে কোন অন্ধ কূপে নিক্ষেপ কর।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৪-২৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৯৪
[৩]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯২

غَيٰبَتِ الْجُبِّ

এর ব্যাখ্যায় তফসীরকার আবু হাইয়ান বলেছেনঃ কূপের ভেতরে পানির উপরে যে তাক নির্মিত হয় তাকেই "গায়াবাতিয়ুব্ব" বলা হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'গায়াবাত' সে স্থানকে বলা হয় যাতে প্রবেশকারীকে কেউ দেখতে পায়না। এজন্যে গভীর গর্তকেও গায়াবাত বলা হয়।

ইয়াহুদার প্রস্তাব হলো এই, ইউসুফকে হত্যা করোনা; বরং কোন গভীর অন্ধ কূপে তাকে নিক্ষেপ কর। কোন পথিক মুসাফির যদি তাকে পেয়ে যায় তবে তুলে নিয়ে যাবে, অথবা পানিতে ডুবে মরে যাবে। এভাবে তোমাদের অপরাধের মাত্রা কমবে, অথচ তোমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে।

اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

অর্থাৎ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার পরামর্শ মোতাবেক ইউসুফকে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ কর।

অথবা এর অর্থ হলো যদি ইউসুফকে পিতা থেকে দূরে সরাতেই মনস্থ করে থাক তবে এ কর্মসূচীকেই যথেষ্ট মনে কর।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের এ কর্মসূচীতে কয়েকটি অপরাধ ছিলঃ

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

২. পিতার অবাধ্য হওয়া।

৩. একটি নিঃষ্পাপ শিশুর উপর জুলুম করা।

৪. নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা।

৫. আমানতে খেয়ানত করা।

৬. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

৭. মিথ্যাবাদীতা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে হযরত্ ইউসুফ (আঃ)-কে রক্ষা করেছেন।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এখানেই আল্লাহ পাকের হেকমত এবং কুদরতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ পাকের মর্জি ছিল ইউসুফ (আঃ)-কে নবুওয়্যত দান করবেন এবং তাঁকে মিশরের ক্ষমতা অর্পন করবেন। আর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদেরকে ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখে সাহায্য প্রার্থী করে হাযির করবেন। এজন্যে তাদের মধ্যে ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করার শক্তিই ছিলনা। তারা ইয়াহুদার প্রস্তাব বিনা

দ্বিধায় মেনে নিল। আর এজন্যে পরস্পরের পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, সবাই একত্রিত হয়ে পিতার নিকট ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের সঙ্গে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করবে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যে অনাবাদী কূপে ইউসুফ (আঃ)-কে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে তা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের কূপ। ওয়াহাব (রহঃ) বলেছেনঃ এটি ছিল জর্দানের একটি কূপ। আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এ কূপটি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে ছিল।[১]

তারা ধারণা করেছিল ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে ফেলে দিলে কোন পথিক তাকে তুলে দূর দেশে নিয়ে যাবে। এভাবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

লক্ষ্যণীয়, শয়তান মানুষকে কীভাবে পথভ্রষ্ট করে এবং কত মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়। আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা, পিতার অবাধ্য হওয়া, নিঃস্পাপ শিশুর প্রতি অকথ্য জুলুম করা, বৃদ্ধ পিতাকে চরম ব্যথায় ব্যথিত করা, তাঁর নয়ন মনের শান্তি দূরীভূত করা, বৃদ্ধ পিতা তথা আল্লাহর নবীকে অসহনীয় কষ্ট দেয়া, পিতাকে পুত্রের বিরহে শোকে মুহ্যমান করে রাখা, একই সঙ্গে আল্লাহর দুজন নবীকে কষ্ট দেয়া প্রভৃতি। কত জঘন্য অপরাধ তারা করেছে এবং শয়তান কীভাবে তাদেরকে এমন অন্যায় কাজে প্ররোচনা দিয়েছে।[২]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করার পরামর্শ ইবলিস শয়তানই দিয়েছিল। এমনিভাবে অন্যায় করার পর তওবা করে ভাল মানুষ হওয়ার পরামর্শও ইবলিস শয়তানই দিয়েছিল। কেননা পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে ইবলিস শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু একথা ঘোষণা করা হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কোন কোন গুনাহ এমন রয়েছে যা শুধু ইবলিস শয়তানের প্ররোচনাতেই হয়। সে গুনাহগুলোর মধ্যে জুলুম এবং হত্যা অন্তর্ভুক্ত।

মারাত্মক অপরাধ

এ আশায় পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া যে, পরে তওবা করে নেব তা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ এবং চরম ধৃষ্টতা, আর ক্ষেত্র বিশেষে তা আল্লাহ পাকের রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়।[৩]

এ যুগেও এমন কথা বলতে শোনা যায়। তবে নিঃসন্দেহে এটি শয়তানী ধোকা, আর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধোকা। আলোচ্য আয়াতে একথাটি উল্লেখের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

قَالُوا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৯৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৪৫
৩। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৭

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, "হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদেরকে ইউসুফের ব্যাপারে আদৌ বিশ্বাস করেন না"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা মনে হয় তারা ইতিপূর্বেও এমন আবেদন করেছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। যাহোক এবার তারা চারিদিকের আট-ঘাট বেধেই হাযির হয়েছে এবং বলেছে, হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদেরকে ইউসুফের ব্যাপারে আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেননা অথচ এভাবে ঘরে বসে থাকলে তার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। আগামীকাল আমরা মাঠে যাব, উন্মুক্ত ময়দানে খেলা-ধূলা করবো।

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ

ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে দিন, মুক্ত বাতাসে তার স্বাস্থ্য ভাল হবে। উন্নতমানের খাবার গ্রহণ করবে, খেলা-ধূলা আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠবে, তার দেহ মন চাঙ্গা হবে।

وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

আর তার ব্যাপারে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় আমরা তার হেফাজত করবো, সে কোন প্রকার কষ্ট পাবে না।

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের এ আবদারের ব্যাপারে দু'টি আপত্তি পেশ করলেনঃ

(১) তোমরা জান ইউসুফের প্রতি আমার মহব্বত অনেক বেশী, তোমরা যে তাকে নিয়ে যাবে এতক্ষণের বিরহ আমার পক্ষে সহনীয় নয়।

(২)

وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ

তাছাড়া আমার ভয় হয় যে, তোমরা খেলাধূলার মত্ত থাকবে, তার ব্যাপারে গাফেল থাকবে আর এমন অবস্থায় নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলবে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, নেকড়ে বাঘ ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি হামলা করেছে, তার পর থেকে তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন।[১]

وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৯৭
তফসীরে কুরতবী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৪০

"তোমরা থাকবে তার ব্যাপারে গাফেল"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ কথাটি বলার উদ্দেশ্যে হলো আমি তোমাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের আশঙ্কা করিনা তবে এ আশঙ্কা আছে যে, তোমরা খেলাধূলায় মশগুল থাকবে, আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকবে, ইউসুফের হেফাজত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এমন সময় কোন নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলবে।

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

তারা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কথার জবাবে বললো, আমরা শক্তিশালী ১০টি মানুষের একটি দল। আমাদের উপস্থিতিতে যদি নেকড়ে বাঘ ইউসুফকে নিয়ে যায় তবে এটি হবে আমাদের দুর্ভাগ্য, নিশ্চয় আমরা এমন অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

অর্থাৎ এমন অবস্থায় দুর্বলতার কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব এবং অসহায় হয়ে পড়বো। অথবা এর অর্থ হলো যদি আমরা বাঘের হাত থেকে আমাদের ভাইকে রক্ষা করতে না পারি তবে আমাদের গৃহপালিত পশুগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারবনা। আমরা হব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৯৮

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾
وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا
نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ
اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ
بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ
جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৫) এরপর তারা যখন ইউসুফকে নিয়ে যায় এবং অন্ধকূপে তাকে ফেলতে একমত হয়, এমন অবস্থায় আমি ইউসুফকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এ কীর্তি সম্পর্কে অবশ্যই বলে দেবে যখন তারা তোমাকে চিনবেনা।

(১৬) তারা রাত্রিকালে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট উপস্থিত হয়।

(১৭) তারা বলে, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মাল পত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, এ সময় নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে। আমরা যত সত্য কথাই বলিনা কেন আপনি যে আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

(১৮) তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে আনে। ইয়াকুব বলেন, তা কখনও নয়; বরং তোমাদের মন একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। অতএব, এখন সবরই উত্তম। তোমরা যা বর্ণনা করছো তাতে আমি আল্লাহ পাকেরই সাহায্য চাই।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, তারা তাঁকে নিয়ে গেল।

আল্লামা বগভী (রঃ) ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, পিতার সামনে ইউসুফ (আঃ)-কে তারা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়, যতক্ষণ ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ছিল ততক্ষণ তাঁকে কাঁধেই রাখে। কিন্তু যখন পিতার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় তখন তারা তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং মারপিট করতে থাকে। তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি যে শত্রুতা ছিল তা তারা প্রকাশ করে। একজন যখন

আঘাত করে তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে অন্য ভাইয়ের নিকট ফরিয়াদ করেন। কিন্তু সাহায্য করার স্থলে সেও তাঁকে মারে। এভাবে প্রত্যেকেই তাঁকে মারতে থাকে। তাঁর বুক ফাটা চিৎকার তাদের মনে এতটুকু দাগ কাটেনি, তাঁর জন্যে তাদের অন্তরে সামান্যতম দয়ারও উদ্রেক হয়নি।

রবিল তাকে এমন আঘাত করে যে তিনি প্রায় অর্ধ মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। রবিল তাঁর বুকের উপর বসে পড়ে এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্দত হয়। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, আমাকে হত্যা করোনা। সে বলে হে রাহিলের পুত্র! এবার বল আমাদের হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? এ সময় ইয়াহুদা সম্মুখে এসে বললো, তোমরা আমাকে কথা দিয়েছ যে, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করবেনা। আমিইতো বলেছিলাম ইউসুফকে তোমাদের পথ থেকে সরানোর সহজ পথ গ্রহণ কর, আর তা হলো ইউসুফকে কোন অন্ধ কূপে নিক্ষেপ কর।

অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তের উপর পুনরায় একমত হলো। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বাড়ী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে জঙ্গলে অবস্থিত অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার জন্য তাঁকে নিয়ে যায়। তাঁর হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে দেয়।

ইউসুফ (আঃ) ভাইদের নিকট অনেক কাঁদলেন। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না, তাঁকে এক গভীর অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করলো।

বর্ণিত আছে, যখন কূপের অর্ধেক পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) পৌঁছলেন তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা রশিটি ছেড়ে দিল। তিনি পানিতে পড়ে গেলেন, একটি পাথর পেয়ে তাতে দাঁড়ালেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, নিক্ষেপ করার পর তারা তাঁকে নাম ধরে ডাকলো। তিনি মনে করলেন হয়তো তাদের দয়া হয়েছে তাই তিনি জবাব দিলেন। তখন বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা উপর থেকে পাথর বর্ষণ করে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু ইয়াহুদা তাদেরকে এ অন্যায় থেকে বিরত রাখলো।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম সুদ্দীর (রঃ) সূত্রে লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) সিরিয়াতে বাস করছিলেন। ইউসুফ (আঃ) এবং বিন ইয়ামিনকে তিনি সর্বদা কাছে রাখতেন যে কারণে তাদের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হিংসানলে জ্বলতে থাকে। ইউসুফ (আঃ)-কে তারা অরণ্যে নিয়ে গেল এবং অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করলো। হযরত ইউসুফ (আঃ) অন্ধকারে আচ্ছন্ন গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে যখন চরম অসহায় অবস্থায় ছিলেন, নিষ্ঠুর বৈমাত্রেয় ভাইদের জুলুমের শিকার হলেন, আল্লাহ পাক তখন তাঁকে ওহীর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিলেন, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ

"আর আমি ইউসুফের নিকট ওহী প্রেরণ করলাম (যেন সে সান্ত্বনা লাভ করে)"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এই ওহী নবুওয়্যত লাভের পর যে ওহী হয় তা নয়; বরং এটি ছিল এলহাম। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতার নিকট আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেছিলেন কিভাবে মূসা (আঃ)-কে রক্ষা করতে হবে তার নির্দেশনা দিয়ে।

لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেনঃ চিন্তা করোনা, অবস্থার পরিবর্তন হবে, এমন সময় আসবে যখন তুমি তাদের এ অপকর্মের কথা তাদেরকে বলে দেবে অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না। একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. যখন তারা তোমার সম্মুখে হাযির হবে তখন তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।

২. আমি যে ইউসুফের নিকট ওহীর মাধ্যমে সান্ত্বনা বাণী পাঠিয়েছি তা তারা জানতো না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইয়াহুদা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যে অন্ধ কূপের মধ্যে খাবার পৌছাত। আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য জীব্রাইলকে (আঃ) প্রেরণ করেন। জীব্রাইল (আঃ) তাঁকে বলেন, যখন আপনি অশান্তি উপলব্ধি করেন তখন এ দোয়া পাঠ করবেনঃ[১]

ياسريخ المستصرخين وياغوث المستغيثين ويامفرج كرب المكروبين قد ترى مكانى وتعلم حالى ولايخفى عليك شئ.

যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) এ দোয়া পাঠ করলেন তখন ফেরেশতাগণ সেখানে সমবেত হলো এবং তিনি নিজেকে আর একা উপলব্ধি করেননি।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ আত্ তাইফি বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ করা হলো তখন তিনি এভাবে দোয়া করেছেনঃ

يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ارحم ضعفى وقلة حيلتى وصغر سنى

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন ইউসুফ (আঃ)-কে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করা হল তখন জিব্রাইল (আঃ) এসে তাকে বললেনঃ হে যুবক! কে আপনাকে এ অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করেছে?

তিনি বললেনঃ আমার ভাইয়েরা, জিব্রাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেন? তিনি বললেনঃ যেহেতু আমার আব্বাজান আমাকে ভালবাসেন সেজন্যে তারা আমার প্রতি হিংসা করেছে। জিব্রাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখনকি এখান থেকে বের হতে চান?

ইউসুফ (আঃ) বললেন, এটি নির্ভর করছে ইয়াকুব (আঃ)-এর মা'বুদের মর্জির উপর। তখন জিব্রাইল (আঃ) বললেন ঃ এ দোয়াটি পাঠ করুন–

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৮-২৯

اللهم إنى أسألك باسمك المكنون المخزون يابديع السموات والارض ياذا الجلال والاكرام أن تغفرلى وترحمنى وأن تجعل من أمرى فرجا ومخرجا وأن ترزقنى من حيث احتسب ومن حيث لااحتسب

ইউসুফ (আঃ) যখন এ দোয়া পাঠ করলেন তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বিপদ দূর করে দিলেন। অবশেষে মিশরের রাজত্ব পর্যন্ত তাঁকে দান করলেন, যা ছিল তাঁর জন্যে অচিন্তনীয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর এরশাদ করেছেনঃ তোমরা এ বাক্যগুলো অত্যন্ত বিনীতভাবে পাঠ কর, এর দ্বারা দোয়া করতে থাক, কেননা এটি হলো নেককারদের দোয়া।[১]

ইমাম আহমদ (রঃ) "কিতাবুজ যোহদে", এবনে আবদুল হাকাম ফতুহুল মেছের নামক গ্রন্থে এবং এবনে জরীর ও এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, আবুশ শেখ, এবনে মরদবিয়া হাসান বসরীর (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনার সময় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বয়স ছিল ১৭ বছর। যৌবন লাভের পূর্বেই তাঁর নিকট ওহী এসেছিল। যেমন হযরত ইয়াহয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট তাঁদের অল্প বয়সেই আল্লাহর তরফ থেকে ওহী এসেছিল।

যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, তাঁর বয়স ছিল তখন মাত্র ছয় বছর, আর হযরত হাসান (রঃ)-এর মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল ১২ কিংবা ১৮ বছর। আর এবনে সায়েবের (রঃ) মতে ১৭ বছর।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনায় একথাও বর্ণিত আছে যে, নমরূদ যখন ইব্রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে তখন তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পোশাক তাঁর দেহ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) জান্নাত থেকে একটি রেশমী জামা এনে তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে সে জামাটি তাঁর পুত্র হযরত এসহাক (আঃ) পেয়েছিলেন। এরপর জামাটি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট আসে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ঐ জামাটি একটি কবজে পুরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গলায় পরিয়ে দেন। যেহেতু ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার সময় ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি ছিনিয়ে নিয়েছিল তাই হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঐ জামাটি তাবিজ থেকে খুলে ইউসুফ (আঃ)-কে পরিয়ে দেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একটি বকরী জবেহ্ করে এবং তার রক্ত দ্বারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটিকে লাল করে নেয়।[২]

---

[১]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৭-৯৮
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯

তফসীরকারগণ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ হৃদয়বিদায়ক ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

وَجَآءُوْٓا اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ

"আর তারা সন্ধ্যাকালে অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট উপস্থিত হয়"।

অর্থাৎ সন্ধ্যার পর যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট হাযির হয়। এ কান্না ছিল তাদের মেকী, আর অন্ধকারে আসার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, মিথ্যা কথা বলার সুযোগ নেয়ার জন্যেই তারা অন্ধকারে এসেছে। তাই বর্ণিত আছে, তারা বাড়ীর কাছে এসে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে। তাদের চিৎকার শ্রবণ করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বের হয়ে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে?

বকরীগুলোর উপর কোন বিপদ এসেছে? তারা বলে না। এরপর হযরত ইয়াকুব (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইউসুফ কোথায়?

পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ

হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে থাকি এবং ইউসুফকে আমাদের মাল পত্রের নিকট রেখে যাই। এ সময় নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে। আমরা যত সত্যবাদীই হইনা কেন আপনি যে আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না (তা আমরা জানি কেননা, ইউসুফের মহব্বত আপনার অন্তরে অত্যন্ত বেশী। আর আমাদের ব্যাপারে আপনার ভুল ধারণা রয়েছে। ইউসুফের মহব্বতই আমাদের কথা অবিশ্বাস করার কারণ হবে)।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ যেহেতু আপনি আমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন না, তাই আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। অথবা এর অর্থ হলো যেহেতু আমাদের সত্যতার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নাই, তাই আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই। কেননা আপনি পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর আপনি এ কথাও বলেছিলেন, হয়তো তোমরা গাফেল হবে, তখন নেকড়ে বাঘ এসে তাঁকে খেয়ে ফেলবে। আর ঘটনাক্রমে তাই হয়েছে তার প্রমাণ হলো ইউসুফের জামা।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ

"আর তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে আনে"।

তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৭-৯৮
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৯৯

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, আবুশ শেখ হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর দুঃসংবাদ শ্রবণ করে চিৎকার দিলেন এবং ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি বার বার উল্টিয়ে দেখলেন, জামাটি এতটুকুও ছেড়া ছিলনা। রক্ত মাখা জামাটি তিনি দেখেই তাদের মিথ্যা কথা উপলব্ধি করলেন এবং মন্তব্য করলেনঃ মনে হয় নেকড়ে বাঘটি বড় বুদ্ধিমান ছিল, সে আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে খেয়ে ফেললো, আর তার জামাটিকে অক্ষত অবস্থায় রেখে গেল।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন সে ব্যক্তি, যিনি সুদূর কেনান থেকে তাঁর প্রিয়পুত্র ইউসুফের জামার সুগন্ধ পেয়েছিলেন, অথচ ইউসুফ (আঃ) তখন ছিলেন মিশরে। তিনি ছাগলের রক্তকে ইউসুফের রক্ত মনে করে ভুল করবেন তা অকল্পনীয়।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا

তাই তিনি বললেনঃ এসব তোমাদের বানানো কথা, সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ

যাহোক এখন সবর করা ব্যতীত কোন গতি নেই। আমি সবর করবো, আর এ সবর হবে উত্তম সবর।

উত্তম সবরের তাৎপর্য

যে সবরকে উত্তম সবর বলা হয় তা হল কোন মানুষের উপর যদি কোন বালা-মুসিবত আপতিত হয় তবে সে ঐ বিপদের ব্যাপারে কোন বন্দার নিকট কোন প্রকার অভিযোগ বা দুঃখ প্রকাশ করেনা, চিৎকার বা অতির্নাদ করেনা।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উত্তম সবরের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

এবনে জরীর হিব্যান ইবন হামিয়্যার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "সবরে জামিল" বা উত্তম সবর হল যাতে কোন অভিযোগ না থাকে এজন্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেছেন, "আমার দুঃখ কষ্টের কথা আমি আমার আল্লাহর কাছেই বলি"। যেমন হযরত আইউব (আঃ) কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন, সুদীর্ঘ আঠারো বছর যাবত এ কঠিন রোগ ভোগ করেছেন কিন্তু কোন দিন এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ-অনুযোগ করেননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি যখন কিছু মুনাফেক অপবাদ দিল, তিনি বলেছিলেনঃ আমি যদি শপথ করে কথা বলি তবুও তোমরা বিশ্বাস করবেনা, যদি কোন কৈফিয়ত দেই তবে তা তোমরা গ্রহণ করবে না। আমার অবস্থা এবং তোমাদের অবস্থা হল হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের অনুরূপ, তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকই আমার সাহায্যকারী, আমি তাঁরই সাহায্য কামনা করি। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করলেন।[১]

[১]। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০১-০২

তাই এক্ষেত্রেও হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে তোমরা যে সংবাদ দিচ্ছ এর উপর সবর করা এবং এ দুঃখে ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে আমি আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করি।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনায় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে একটি নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে আসে এবং বলে যে, এ নেকড়ে বাঘটি ইউসুফকে খেয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমার কলিজার টুকরাকে খেয়েছো? আল্লাহ পাক নেকড়ে বাঘটিকে বাক শক্তি দান করলেন। সে জবাব দিল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার পুত্রকে কখনও দেখিনি। হযরত ইয়াকুব (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কেনানে কেন এসেছো? নেকড়ে বাঘটি বললো, আমি আমার আপন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম, এমন অবস্থায় তারা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।[১]

মূলতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) উপলব্ধি করলেন, এটি হয়তো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কঠিন পরীক্ষা অতএব, এ পর্যায়ে সবর অবলম্বন করাই উত্তম। এজন্যে যারা এ ষড়যন্ত্র করল, তাদের শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি।

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ পিতা পুত্রের এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, দেখ উত্তম সবর কীভাবে হয়, দ্বিতীয়তঃ যাকে আল্লাহ পাক উন্নতি দানের মর্জি করেন, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারে না।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩১

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ

فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ
بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ
أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৯) একটি কাফেলা আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করলো, সে তার ডোলটি নামিয়ে দিল, সে বলে উঠলো, কী আনন্দের কথা এ যে একটি বালক, তারা তাকে বাণিজ্য পণ্য রূপে লুকিয়ে রাখলো, আর আল্লাহ পাক তারা যা করছিল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন।

(২০) আর ইউসুফের (বৈমাত্রেয়) ভাইয়েরা অতি নিকৃষ্ট মূল্যে মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রয় করলো, আর তারা ছিল তাতে নির্লোভ।

(২১) আর মিশরে যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনক ভাবে তার থাকার ব্যবস্থা কর। সে আমাদের কাজে আসতে পারে, অথবা তাকে আমরা নিজেদের সন্তান করে নিতে পারি। আর এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। আর আমি তাকে স্বপ্নের তা'বির শিক্ষা দিতে চাই, আর আল্লাহ পাক তাঁর কার্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অপ্রতিহত, অপরাজেয়। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বুঝতে পারেনা।

(২২) আর ইউসুফ যখন যৌবনে উপনীত হয়, আমি তাকে হেকমত এবং জ্ঞান দান করলাম, আর এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

তফসীরুল কোরআন

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে চলে গেল। তিন দিন যাবত তিনি কূপেই অবস্থান করলেন। আল্লাহ পাক তাঁর হেফাজত

করলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপরের ঘটনা হলো এই, যাত্রীদের একটি কাফেলা মাদায়েন থেকে মিশর গমন করছিল। তারা পথ ভুলে এ অরণ্যে এসে পৌঁছেছিল। তারা সকলেই ছিল তৃষ্ণার্ত, কূপ দেখে তারা পানি নেয়ার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলো।

বর্ণিত আছে যে, এ কূপের পানি ছিল অত্যন্ত লবণাক্ত। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে নিক্ষেপ করার পর আল্লাহ পাকের রহমতে তা মিষ্ট পানিতে পরিণত হলো।[১]

فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ

কাফেলার মধ্যে এক ব্যক্তিকে পানি সংগ্রহের জন্যে তারা প্রেরণ করলো। এ ব্যক্তির নাম ছিল মালেক এবনে জারুল খাজায়ী। যখন ঐ ব্যক্তি পানির জন্যে তার ডোল নামিয়ে দিল তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত ইউসুফ (আঃ) ডোলের রশি ধরে উপরে উঠে আসলেন। পানির বদলে এই সুদর্শন বালককে পেয়ে সে বিস্মিত হলো এবং চিৎকার দিয়ে বললো কী আনন্দ! এ যে একটি বালক। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করার পর তার কি হয় তা দেখার উদ্দেশ্যে আশে পাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আল্লাহ পাকের কুদরত এবং রহমতেই মিশরগামী ঐ কাফেলা পথ ভুলে সেখানে পৌঁছে এবং তারা পানি তুলতে যে ডোল কূপে ফেলে, তার রশি ধরে হযরত ইউসুফ (আঃ) উপরে উঠলেন। কাফেলার লোকেরা সকলেই তাঁকে দেখে আশ্চর্যন্বিত হলো।[২]

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমগ্র মানব জাতিকে যে সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে তার অর্ধেক একা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেয়া হয়েছে (এবনে আবি শায়বা, আহমদ, আবু ইয়ালা, হাকেম, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত)।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ সৌন্দর্য তাঁর দাদী হযরত সারা থেকে এসেছে। আল্লাহ পাক তাঁকে পৃথিবীর সৌন্দর্যের ছয় ভাগের একভাগ দিয়েছিলেন। এবনে এসহাক লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর মাতার অংশে দু' তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য এসেছিল।

মালেক এবনে জার তাঁকে দেখা মাত্র চিৎকার দিয়ে বললো কী আনন্দ! এ যে অতি সুন্দর বালক!

قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১০৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩১
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৪৮

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ) তাঁর পিতার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে যখন অন্ধকার কূপ থেকে বের করা হলো তখন ঐ কূপটি ক্রন্দন করেছিল।[১]

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً

মালেক এবনে জার এবং তার সাথীরা ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে গোপন করে রাখলো। কেননা কাফেলার অন্য লোকেরা যদি তাকে দেখতে পায় তবে তাঁর বিক্রয়-লব্ধ সম্পদের অংশ দাবী করবে।

অথবা এর অর্থ হলো তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিষয়টিকে গোপন রাখলো এবং বললো, কূপের প্রতিবেশী অধিবাসীরা আমাদেরকে এ বালকটিকে দিয়েছে যেন আমরা তাদের পক্ষ থেকে তাকে মিশরের বাজারে বিক্রয় করি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর বিষয়ে কাফেলার লোকদের নিকট গোপন রেখেছে অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের ভাই বলে পরিচয় দেয়নি। বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদা নামক ভাইটি তার নিকট প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতো। একদিন খাবার নিয়ে এসে তাঁকে পেলনা। ইয়াহুদা এ খবর তার ভাইদেরকে দিয়ে দিল। তারা ইউসুফ (আঃ)-এর খোঁজ করতে লাগলো এবং মালেক এবনে জারের নিকট এসে পেল। তখন তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে বললো, এ হলো আমাদের পলাতক গোলাম।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

(আর তারা যা কিছু করছিল আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন) তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন ছিলনা। অথবা এর অর্থ হলো, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর সাথে এবং তাদের পিতার সাথে যে ব্যবহার করছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। যে যা-ই করছিল সবই আল্লাহ পাকের নখ-দর্পণে ছিল।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নাম মাত্র মূল্যে তথা মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রয় করে দিল।

তফসীরকার যাহ্যাক, মোকাতেল (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের بَخْسٍ শব্দটির অর্থ হলো হারাম। কেননা হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন স্বাধীন মানুষ। অথচ তাঁকে গোলাম পরিচয় দিয়ে বিক্রয় করা হয়, তার বিনিময়ে যে মূল্য গ্রহণ করা হয় তাও হারাম। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, কম হওয়া যেহেতু হারাম সম্পদের বরকত কমে যায় তাই হারামকে "বাখসুন" বলা হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ত্রুটিপর্ণ। আর একরামা (রঃ) এবং শা'বী (রঃ) এর তরজমা করেছেন, সামান্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা মাত্র ২০ দেরহামের বিনিময়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রয় করেছে। আর একরামা (রঃ) বলেছেন, তাঁকে ৪০ দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, ২২ দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন যে, প্রত্যেক ভাই দুই দেরহাম করে পেয়েছিল।[১]

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

অর্থাৎ- হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা (অথবা কাফেলার ক্রেতারা) ইউসুফ (আঃ)-এর বিক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলনা কেননা, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে নির্বাসিত করা, তার দ্বারা সম্পদ রোজগার করা নয়।

আর যদি আয়াতের অর্থ করা হয় যে ক্রেতারা তাকে ক্রয় করতে আগ্রহী ছিলনা, এর কারণ হবে এই যে, বৈমাত্রেয় ভায়েরা তাদেরকে বলেছিলো যে, এ হল আমাদের পালাতক গোলাম, তাই তাঁর ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কম ছিল।

বিদায়ের করুণ দৃশ্য

বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একথাও বলেছিলো যে, তোমরা এর ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে যেন সে পলায়ন করতে না পারে। ক্রেতারা একথা শ্রবণ করে তাঁকে মজবুত ভাবে বেঁধে ফেলল এবং একজন শক্তিশালী কালো বর্ণের গোলামকে তাঁর প্রহরায় নিযুক্ত করল। যখন তাদের রওয়ানা হওয়ার সময় আসল, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) কাঁদতে লাগলেন। ক্রেতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোনো কাঁদছ? তিনি বললেন, আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা, যারা আমাকে আপনাদের কাছে বিক্রয় করেছে তাদের থেকে রীতিমত বিদায় গ্রহণ করি এবং তাদেরকে বলি, সে ব্যক্তির নিকট থেকে সালাম গ্রহণ কর যে আর কোনদিন তোমাদের নিকট ফিরে আসবেনা। ক্রেতা তার গোলামকে আদেশ দিল যে তাকে নিয়ে যাও তার পুরনো মালিকদের নিকট। আমি এর চেয়ে ভাল স্বভাবের কোন বালক দেখিনি, তখন তাঁর প্রহরী তাঁকে বৈমাত্রেয় ভাইদের নিকট নিয়ে আসে। তাদের একজন তখন জাগ্রত ছিল এবং বকরীর পালের প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হস্ত দ্বয় বাঁধা অবস্থায় ছিল, তিনি ক্রন্দণরত ছিলেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করল, কেন এসেছ? তিনি বললেন, এসেছি তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিতে এবং তোমাদেরকে সালাম দিতে। তখন সে অন্য ভাইদেরকে জাগ্রত করে বলল, তোমরা আস তার কাছে যে এসেছে তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিতে, যে কোন দিন আর তোমাদের নিকট

[১]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৩

আসবেনা। হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রত্যেকের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন এবং প্রত্যেকের কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের হেফাজত করুন, যদিও তোমরা আমাকে ধ্বংস করেছ। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আশ্রয় দান করুন যদিও তোমরা আমাকে বহিঃস্কার করেছ। আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি দয়া করুন, যদিও তোমরা আমার প্রতি নির্দয় হয়েছ। এ বিদায়ের অনুষ্ঠান এত হৃদয় বিদারক ছিল যে, বকরীগুলোর পেট থেকে তাদের বাচ্চাগুলো পড়ে গিয়েছিলো। এরপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রহরী গোলাম তাঁকে বেঁধে নিয়ে কাফেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল এবং কাফেলার সঙ্গে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল। পথে কেনানের কবরস্থানে তাঁর মায়ের কবর দেখে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে তিনি লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন এবং কবরের পার্শ্বে হাযির হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে আম্মাজান! আপনি মাটির ভেতর থেকে মাথা উত্তোলন করুন, আপনি দেখবেন আপনার পুত্র বন্দী অবস্থায় রয়েছে, আমার ভাইয়েরা আমাকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছে এবং আমার পিতা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এমনকি, হীন মূল্যে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। আমার বাল্যকালের প্রতি লক্ষ্য করেও তারা এতটুকু দয়া করেনি, আমি আমার আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করি যেন তাঁর রহমতে ও দয়ায়, আমার পিতা-মাতার সঙ্গে পুনরায় একত্রিত হতে পারি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। এদিকে তাঁর প্রহরী দেখল যে, তিনি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে নেই, তিনি আছেন কবরের পার্শ্বে। তাই কবরের পাশে এসে তাঁকে তাড়া করতে লাগল এবং বলল, তোমার পূর্বের মালিকরা ঠিকই বলেছে, তুমি একজন পলাতক গোলাম। একথা বলে অত্যন্ত জোরে তাঁকে একটি চাপড় মারল। আঘাতের কারণে তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন তাঁকে বললেন, আমাকে এখুনি তুলে নেবেনা, এটি আমার মায়ের কবর। আমি আমার মাকে সালাম করার জন্যে অবতরণ করেছি, হয়তো জীবনে আর কোন দিন এখানে আসতে পারবনা। এরপর তিনি আসমানের দিকে তাকালেন। তাঁর নয়নের অশ্রু এবং কবরের মাটি তাঁর চেহারায় একাকার হয়ে গেল।

এরপর আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করে বললেন, "হে আল্লাহ্! যদি আমার কোন গুনাহ হয়ে থাকে তবে আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, এস্হাক এবং ইয়াকুবের উছিলায় আমাকে মাফ করে দিও। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান! তুমি আমার প্রতি দয়া কর"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফেরেশতারা কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, হে আমার ফেরেশতারা! এ হলো আমার নবী এবং আমার নবীগণের বংশধর, সে আমার নিকট ফরিয়াদ করেছে, আমি তার ফরিয়াদ শ্রবণ করেছি, আমি সকল ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শ্রবণ করে থাকি। হে জীব্রাঈল! তুমি তাঁর নিকট যাও। জীব্রাঈল (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে অবতরণ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলেছেন, তুমি সাত আসমানের সমস্ত ফেরেশতাকে কাঁদিয়ে ফেলেছ, তুমি কি চাও? যে আসমান জমীনের উপর পড়ুক। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, হে জীব্রাঈল! আমি তা চাইনা। আমি চাই আল্লাহ্ পাক বন্দার অন্যায় আচরণ সহ্য করেন, আমি সেই চরিত্র মাধুর্য অর্জন করি।

তখন জীব্রাঈল (আঃ) তাঁর ডানা দিয়ে মাটির উপরে আঘাত করলেন। ফলে সজোরে বাতাস বইতে লাগলো, সূর্যের আলো বিদায় নিল, সর্বত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কাফেলার একজন আরেকজনকে দেখতে পারলনা, তখন কাফেলার সর্দার ব্যবসায়ী বলল, তোমরা সকলে অবতরণ কর, আমি এ পথ দিয়ে বহু বছর ধরে চলাফেরা করি, কোনদিন এ অবস্থা দেখিনি। এই যে বিপদ দেখা দিয়েছে তা অবশ্যই তোমাদের কোন গুনাহর কারণে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা কর। তখন ইউসুফ (আঃ)-এর প্রহরী গোলাম যা কিছু ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে করেছে তা বর্ণনা করল এবং বলল, আমি যখন তাঁকে মেরেছিলাম, তখন সে আসমানের দিকে তাকাল এবং তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ে উঠল (মনে হয় কিছু বলছিলো)। তখন ঐ ব্যবসায়ী বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করেছ, নিজেকেও ধ্বংস করেছ। এরপর ঐ ব্যবসায়ী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি জুলুম করেছি এমনকি, আপনাকে মেরেছি। এখন আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের কাছ থেকে বদলা নিতে পারেন, আমরা আপনার সম্মুখেই আছি। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি এমন পরিবারের লোক নই, যাদের প্রতি জুলুম করলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে; বরং আমি এমন পরিবারের লোক যাদের প্রতি জুলুম করলে তারা ক্ষমা করে। আমি তোমাদেরকে এ আশায় মাফ করে দিয়েছি যেন আল্লাহ পাক আমাকেও মাফ করেন। এরপর আঁধার কেটে গেল, বাতাস থেমে গেল, সূর্যের আলো ফিরে এল এবং পৃথিবী আলোকিত হল। তাদের সফর পুনরায় শুরু হল এবং তারা নিরাপদে মিশর পৌঁছে গেল।[১]

বর্ণিত আছে যে, মালেক এবনে জার হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে নিয়ে মিশর পৌঁছল এবং বিক্রয়ের জন্য তাঁকে বাজারে তুললো। কেতফীর নামক এক ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করলো। এ অভিমত হল হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর। কোন কোন তফসীরকার ঐ ব্যক্তির নাম কেতফীর এর স্থলে এতফীরও বলেছেন। এ ব্যক্তি ছিল মিশরের বাদশাহর অর্থ বিভাগের মুখ্য সচিব। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, সে ছিল তখন মিশরের প্রধানমন্ত্রী। তার খেতাব ছিল আজীজ। সে যুগের মিশরের বাদশাহ ছিল রাইয়ান এবনে ওয়ালিদ এবনে সারওয়ান ওমায়লেকী।

বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ জীবন সায়াহ্নে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলো এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী হয়েছিলো। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ঐ বাদশার ইন্তেকাল হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিশরে পৌঁছলেন, কেতফীর মালেক এবনে জার থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করলো, বিশটি স্বর্ণ মুদ্রা, একজোড়া জুতা এবং দু' জোড়া পোশাকের বিনিময়ে।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিশরের বাজারে পৌঁছলেন এবং তাঁকে বিক্রয়ের জন্য পেশ করলো, তখন লোকেরা তাঁকে ক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করলো এবং মূল্য উত্তরোত্তর

[১]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৫-০৬

বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে তাঁর মূল্য হবে তাঁর দেহের ওজন মোতাবেক স্বর্ণ এবং ততখানি রৌপ্য এবং ঐ ওজনের রেশমী কাপড় আর ততখানি কস্তুরী। তখন তাঁর বয়স ছিল তের বছর। পাল্লায় তাঁকে পরিমাপ করা হল এবং পরিমাপ মোতাবেক মূল্য আদায় করে কেতফীর তাঁকে ক্রয় করলো।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖ

"আর মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বললো, তাকে স-সম্মানে রাখ, আমাদের কাজে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করি"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হল ইউসুফ (আঃ)-কে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের কয়েকটি নেয়ামত

১. হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহ পাক অন্ধকার কূপে তাঁর হেফাজত করেন এবং তিন দিন পর কূপ থেকে নাজাত দান করেন।

২. তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে হীন মূল্যে পথিক ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়, আল্লাহ পাক তাঁকে মিশরের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে পৌঁছে দেন, যেন উন্নত মানের জীবন লাভ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ সম্পর্কে অবগত হন।

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ

"মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলে তাকে স-সম্মানে রাখ"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার উল্লেখ রয়েছে।

৩. আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাঁর রহমত এভাবে নাযিল করেছেনঃ কেতফীর নামক যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছে তার অন্তরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মান এবং মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে তাঁর নূরানী চেহারা দেখেই উপলব্ধি করেছে যে, এ নওজয়ানের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। তাই এর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়া দরকার। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ ব্যক্তি ছিল মিশরের মন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রলালয়ের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তার পিতার নাম ছিল ওহীব। তার

স্ত্রীর নাম ছিল রায়ীল। মতান্তরে তার স্ত্রীর নাম ছিল জোলায়খা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, আসল নাম ছিল রায়ীল, আর ডাক নাম ছিল জোলায়খা। তার মাতার নাম ছিল রাআবীল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীতে তিন জন মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং পরিণামদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

১. আজীজে মিসীর, যে প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে সঠিক ধারণা করেছিলো। ইউসুফ (আঃ)-কে পাল্লায় পরিমাপ করে তাঁর ওজন মোতাবেক স্বর্ণ, রৌপ্য, কস্তুরী এবং রেশমী কাপড় মূল্য হিসাবে আদায় করে তাঁকে ক্রয় করেছে এবং বাড়ীতে নিয়ে তার স্ত্রী জোলায়খাকে বলেছে, তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রাখ। তাঁর থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় বিষয় উচ্চমানের হতে হবে। হয়তো সে কোনদিন আমাদের কাজে লাগবে। অথবা তাঁকে আমরা সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবো।

২. হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সেই কন্যা যিনি এক নজরেই হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্কে সঠিক ধারণা করেছিলেন এবং পিতার নিকট বলেছিলেন, যদি আপনার কোন লোকের প্রয়োজন হয় তবে তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করুন।

৩. হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতিভা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী খলিফা হিসেবে তাঁকে মনোনীত করেছিলেন।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, মিশরের আজীজ যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করে তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো, তার বাড়ীতে তিনি ছিলেন তের বছর। ৩০ বছর বয়সে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের অর্থ মন্ত্রী হন। ৩৩ বছর বয়সে আল্লাহ পাক তাঁকে "মূলক এবং হেকমত" দান করেন। আর ১২০ বছরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়।

عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ

"হয়তো সে আমাদের জন্যে উপকারী হবে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল যদি আমরা পরবর্তীতে তাকে বিক্রয় করি তবে অনেক লাভ হবে। অথবা আমাদের অর্থ সম্পদের ব্যবস্থাপনায়ও সে ভূমিকা রাখতে পারবে।

اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

(অথবা আমরা আমাদের পুত্র হিসাবেও তাকে গ্রহণ করতে পারি) কেননা তাঁর মধ্যে বুদ্ধিমান হওয়ার অনেক নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। মিশরের কেতফীর নামক এ মন্ত্রী নিঃসন্তান ছিল।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৫০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১০৯-১০

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ

আর এভাবেই আমি ইউসুফকে সে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করি, যাকে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল। তাকে কূপ থেকে বের করে মিশরের রাজ দরবারে পৌঁছানো এবং সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া-সবই ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান।

وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

"আর আমি তাকে স্বপ্নের তা'বির শেখাতে চাই"।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন করা হয় এলম দ্বারা, যে এলম হাসিল করে, জ্ঞান অর্জন করে তার মর্যাদা সর্বদা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে শুধু যে সম্মান এবং ক্ষমতা দান করেন তাই নয়; বরং তাঁকে একটি বিশেষ এলমও দান করেছেন তা হল স্বপ্নের তা'বির বা স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, তিনি ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্নের তা'বির বিশেষজ্ঞ, আর এ এলমই তাঁর জেলখানা থেকে মুক্তি লাভের কারণ হয়।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়

আল্লাহ পাক তাঁর কার্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অপরাজেয়, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তাঁর নিকট অসম্ভব বলতে কিছুই নেই। কিন্তু এ সত্য অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করেনা। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা চেয়েছিল তাঁকে নির্বাসিত করে তাদের পিতার সবটুকু স্নেহ মায়া লাভ করতে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাদের যে ঈর্ষা ছিল তার কারণে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে। আর যারা তাঁকে অন্ধকার কূপ থেকে তুলে এনেছিলো, তারা চেয়েছিল তাঁকে মিশরের বাজারে বিক্রয় করে মোটা অংকের টাকা লাভ করতে। আর আল্লাহ পাক চেয়েছিলেন তাঁকে মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে। আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করা হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অবশ্যই কার্যকর হয়, এটিই চিরসত্য।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

"আর ইউসুফ যখন যৌবনে পৌঁছেন, আমি তাকে হুকুম এবং এলম দান করি। এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি"।

হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হন, যখন তাঁর মধ্যে নিহিত যাবতীয় শক্তি এবং যোগ্যতা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের অধিকতর করুণা-বৃষ্টি হয়। তিনি মানুষের বিভিন্ন কঠিন সমস্যার সহজ ও সন্তোষজনক সমাধান দিতে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ এর অর্থ হলঃ "যখন তিনি পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন এবং শক্তি অর্জন করেন।"

মুজাহেদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তাঁর বয়স হয় ৩০ বছর। আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যখন তাঁর বয়স হয় ২০ বছর। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, ২০ বছর। কালবী (রঃ) বলেছেন, আঠার থেকে ত্রিশ বছরের মাঝামাঝি সময় বোঝাতেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইমাম মালেক (রঃ)-কে এ শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল পরিপূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধি অর্থাৎ যখন তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি পরিপূর্ণ হয়, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তিনি পূর্ণ পরিণত হন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে এলম এবং হেকমত দান করেছেন। আলোচ্য আয়াতে হুকুম অর্থ নবুওয়্যত। আর এলম অর্থ হল দ্বীনি জ্ঞান।

"হুকুমের" ব্যাখ্যা

তফসীরকারগণ বলেছেন, হুকুম অর্থ নবুওয়্যত অথবা সেই সঠিক এলম যা মানুষকে মূর্খতা, ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে রাখে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে।[১]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সঠিক এল্‌ম সেই এলমকে বলা হয় যার সঙ্গে নেক আমলও পাওয়া যায়। কেননা যদি এলমের সঙ্গে আমল না থাকে তবে তা এলম নয়; বরং মূর্খতা। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হাকীম এবং আলেমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে আলেম বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে জানে বা কোন বিষয়ের এলম রাখে। আর হাকীম বলা হয় তাকে যে এলম মোতাবেক আমল করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের হুকুম শব্দটির অর্থ হল নবুওয়্যত আর এলম হল শরীয়তের এলম।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "এলম" শব্দ দ্বারা স্বপ্নের তা'বিরের এলমকে বোঝানো হয়েছে। আর কারো কারো মতে, এর দ্বারা কোন বিশেষ এলমকে বোঝানো হয়নি, এর অর্থ হল সাধারণভাবে দ্বীনি এলম। এক কথায় বলা যায়, এলম হলো জ্ঞান, মনীষা, বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়ে পারদর্শিতা।[২]

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

"আর এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের "মোহসেনীন" শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'মু'মিনীন'। অর্থাৎ এভাবেই আমি মোমেনদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, 'মোহসেনীন' শব্দটির অর্থ হল হেদায়েত প্রাপ্ত লোক। অর্থাৎ যারা হেদায়েত প্রাপ্ত তাদেরকেই আমি এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৫

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, 'মোহসেনীন' শব্দটির অর্থ হল যারা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারী।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর নিঃস্কলংক চরিত্র মাধুর্য, কঠিন বিপদে ধৈর্য এবং সত্য-সাধনা ও পরহেযগারীর জন্যে প্রতিদান দিয়েছেন।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হল এই, যেভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে এলম, হেকমত দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা, ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছি ঠিক এভাবে যারা নির্মল চরিত্রের অধিকারী হয় তথা নৈতিক গুণাবলী অর্জন করে, ধৈর্য ও সহনশীলতা, উদারতা-মহানুভবতা, ক্ষমা ও ঔদার্য্যের গুণ আয়ত্ব করে, তাদেরকে আমার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করি। এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন এহসানের মকামে ছিলেন, আর এহসান হল–

ان تعبد الله كانك تراه.

অর্থাৎ তুমি এভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে যেন তুমি স্বয়ং আল্লাহকে দেখছ, যদি তোমার মনের এ অবস্থা না হয় তবে অন্ততঃ একথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ পাক তোমাকে দেখছেন। যারা মনের এ অবস্থা নিয়ে এবাদত করে, তারাই "মোহসেন" তথা সত্যিকার নেককার। আর তাদের এ নেক আমলের সওয়াব বা শুভ পরিণতি আল্লাহ পাক দান করে থাকেন।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককার লোকদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককারদের সঙ্গে আছেন) অর্থাৎ নেককারগণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবেন। আর আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের চেয়ে বড় কোন নেয়ামত নেই।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল এই, কোন বিশেষ ঘটনা বর্ণনার পর একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয় যেমন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাবলী বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মর্যাদা দান করা হয়েছে তা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়; বরং

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৫-৩৬

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭

এ পৃথিবীতে যে বা যারা এসব গুণাবলী অর্জন করবে যা ইউসুফ (আঃ) অর্জন করেছিলেন, তাকে তার নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হবে।[১]

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ
رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ
قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ
مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾

তরজমা

(২৩) আর যার ঘরে তিনি অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রীলোকটি তাকে আত্মসংযম ত্যাগ করতে অনুপ্রেরণা দিতে লাগল, সে ঘরের দ্বারগুলো রুদ্ধ করে দিল এবং বললঃ আস, তোমাকেই বলছি, ইউসুফ বললেন এটি মহাপাপ, আল্লাহ রক্ষা করুন, নিশ্চয় আমার মনীব আমাকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে রেখেছেন। নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা কোন দিনও সফল হয়না।

(২৪) ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং তিনিও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন যদি তিনি তাঁর প্রতিপালকের কুদরত না দেখতেন। এমনই হয়, আমি অপকর্ম এবং অশ্লীল আচরণ তার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, কেননা নিশ্চয় তিনি আমার মনোনীত বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

(২৫) তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে যায়। স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে ফেলে, তারা উভয়েই দরজার কাছে স্ত্রীলোকটির স্বামীর সম্মুখীন হয়। তখন স্ত্রীলোকটি বলে, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অপকর্ম করতে ইচ্ছুক হয় তাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা কঠিন দন্ড বিধানই তার একমাত্র শাস্তি।

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮৯

তফসীরুল কোরআন

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পূতঃপবিত্র জীবনে এসেছে পরীক্ষার পর পরীক্ষা। বৈমাত্রেয় ভাইদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে অন্ধকার কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে শুরু করে মিশরের রাজ দরবারে পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর উপর কঠিন পরীক্ষার অন্ত নেই। আলোচ্য আয়াতে আরেকটি চরম পরীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের আজিজ অত্যন্ত আদর-যত্নে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তার বাড়ীতেই রেখেছেন। এরই মধ্যে তার স্ত্রী জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, দিনের পর দিন তার আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে সে তার অদম্য প্রেমের কথা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করে এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তাঁকে আহ্বান করে। আল্লাহ পাক ঘটনাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ

যার ঘরে ইউসুফ ছিলেন সে স্ত্রীলোকটি তাকে আত্ম সংযম ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে। সে ঘরের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দেয় এবং তাকে বলে আসো, তাড়াতাড়ি কর।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তার আহ্বানের জবাবে তিনটি কথা বলেনঃ

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

১. হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ "মাআজাল্লাহ"-আমি এমন মন্দ কাজ থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হয় আল্লাহ পাক তাকে আশ্রয় দান করেন। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) "মাআজাল্লাহ" বলে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর যাকে আল্লাহ পাক আশ্রয় দান করেন তাকে শয়তানের ইন্দ্রজালে জড়ানো সম্ভব হয় না।

২. হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলায়খার আহ্বানের জবাবে দ্বিতীয় কথাটি বলেছেনঃ

اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ

যার বাড়ীতে আমি বাস করছি, যিনি আমার মনিব, যিনি আমাকে উত্তম ভাবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দে রেখেছেন, আমি তাঁর দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছি। এমন অবস্থায় তাঁর আমানতে খেয়ানত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অর্থাৎ প্রথমতঃ এটি জঘণ্য অপরাধ, এমন অপরাধ আমি কখনও করতে পারবো না।

দ্বিতীয়ত, যিনি আমাকে তার বাড়ীতে অত্যন্ত আদর-যত্নে রেখেছেন, আমার প্রতি যার অনেক অনুগ্রহ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমি এমন নেমক হারামী

করতে পারবো না, এটি হলো চরম বিশ্বাসঘাতকতা, কোন অবস্থাতেই আমি তা করতে পারবো না।

৩. হযরত ইউসুফ (আঃ) তৃতীয় কথা বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

"নিশ্চয় জালেমরা তথা পাপীষ্ঠরা কখনও সফলকাম হয়না"। ব্যভিচারের মত জুলুম আর কি হতে পারে! ব্যভিচারী নিজের প্রতিও জুলুম করে এবং যার সাথে ব্যভিচার করে তার প্রতিও জুলম করে। অতএব এত বড় জালেম কোন দিনও সফল হয়না।

লক্ষ্যণীয়, হযরত ইউসুফ (আঃ) শুধু যে মন্দ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে আত্মরক্ষা করলেন তাই নয়, বরং এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জোলায়খাকেও নসিহত করলেন এ মর্মে যে, তোমার স্বামী আমার বড় উপকারী এবং দরদী ব্যক্তি, তিনি আমার মনিব, আমি তার অনেক আদর-যত্ন পেয়েছি এমন অবস্থায় তোমার সাথে কুকর্মের অর্থ হলো তার সাথে নেমকহারামী করা, তার আমানতে খেয়ানত করা।

অতএব, তুমি নিজের ব্যাপারেও চিন্তা কর, তুমি কিভাবে নেমকহারামী করবে? তুমি যে তার স্ত্রী, তুমি কিভাবে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকাত করবে? অতএব, তোমারও সংযমী হওয়া উচিত।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য তা হলো إِنَّهُ এর সর্বনামটি দ্বারা যদি জোলায়খার স্বামী কেতফিরকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে বাক্যটির এ অর্থই হবে যা বর্ণিত হলো।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সর্বনামটির উদ্দেশ্য স্বয়ং আল্লাহ পাক, এমন অবস্থায় এ বাক্যাংশের অর্থ হবে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ পাক আমাকে বহু বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি এখানেও অনেক আদর-যত্ন এবং অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপনের তৌফিক দান করেছেন। আমার প্রতি আল্লাহ পাকের দান অনন্ত অসীম। অতএব, আমি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হতে পারবোনা। আমি তাঁর নাফরমানী করতে পারবো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকই আমার আশ্রয়দাতা, তিনিইতো কেতফিরের মনকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারবো না। আমি কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের নাফরমান হতে পারবো না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ সুদ্দী (রঃ) এবং এবনে এসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন, জোলায়খা তার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে প্ররোচনা দিতে থাকে। এর জন্যে সে নানা ছলনার আশ্রয় নেয়। জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে থাকে, জোলায়খা বলে ইউসুফ তোমার চুলগুলো কত সুন্দর! হযরত ইউসুফ (আঃ) তার জবাবে বলেনঃ আমার মৃত্যুর পর সর্ব প্রথম এ চুলগুলোই আমার দেহ থেকে সরে যাবে।

জোলায়খা এরপরে তাঁর নয়ন যুগলের প্রশংসা করে, তিনি বলেন মৃত্যুর পর এগুলোই সর্ব প্রথম আমার চেহারায় ঝুঁকে পড়বে। জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সুন্দর মুখমন্ডলের প্রশংসা করে। তিনি তার জবাবে বলেন, কবরের মাটি এ চেহারাকে খেয়ে ফেলবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তার অদম্য প্রেমের কথা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলোনা, সে তাঁকে কাছে ডাকলো এবং একের পর এক সাতটি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সে ভোগের নেশায় মত্ত ছিল। বর্ণিত আছে জোলায়খা তখন তাঁকে বলেছিল রেশমী বিছানা তৈরী আছে, তুমি আস এবং আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে বলেছিলেন, যদি আমি এমন অপরাধ করি তবে জান্নাতে আমার কোন স্থান থাকবে না।[১]

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

"এ মহিলা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো যদি সে তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখতো"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার কামনা পূর্ণ করার লক্ষ্যে সে একের পর এক সাতটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। জোলায়খা ছিল তখন ইউসুফ (আঃ)-এর অভিভাবিকা। সে তাঁকে আদেশ দিয়ে ঐ কক্ষে নিয়ে গেছে, অভিভাবিকা তখন প্রেমিকার রূপ ধারণ করে তাঁর নিকট আত্ম-নিবেদন করে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে পূর্ণ যৌবনা রূপসী প্রেমিকার এমন আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন পরীক্ষা, আল্লাহ পাক রক্ষা না করলে এমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) জোলায়খার আহ্বানের উত্তরে বলেছিলেনঃ "আমি এমন কুকর্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, জোলায়খা ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁকে কাছে ডেকে এনেছে। ইউসুফ (আঃ)-এরও জোলায়খার প্রতি আকর্ষণ হতো, যদি তিনি আল্লাহ পাকের নিদর্শন না দেখতেন। পুরুষ হিসাবে নারীর প্রতি আকর্ষণ হওয়া নিতান্ত স্বভাবগত ব্যাপার। কিন্তু তিনি তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা দিয়ে সে আকর্ষণকে দূরীভূত করেছেন। এটিই সত্য-সাধকের ভূমিকা। মানুষ মানুষই ফেরেশতা নয়। মন্দ কাজের প্রতি ফেরেশতাদের কোন ইচ্ছাই হয় না।

পক্ষান্তরে, মানুষের অবস্থা ভিন্ন। প্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু প্রকৃত মানুষের কর্তব্য হলো ঈমানী শক্তি দ্বারা সংকল্পের দৃঢ়তার মাধ্যমে মন্দ অভিপ্রায়কে দূরীভূত করা, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নাফরমানীর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৭
তফসীরে তবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১১০

শেখ আবুল মনসুর মাতুরীদি লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে জোলায়খার প্রতি আকর্ষণ হওয়া ছিল তাঁর মনের একটি অনিচ্ছাকৃত অভিব্যক্তি, যদি ঐ অভিব্যক্তি তাঁর ইচ্ছাকৃত হতো তবে আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে তাঁর প্রশংসা করতেন না। এ ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি ইউসুফ (আঃ)-এর প্রশংসা করেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

"নিশ্চয় ইউসুফ ছিল আমার মনোনীত বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত"।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, এ প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর নবীর অন্তরে অনিচ্ছাকৃত হলেও এমন ভাব কেন আসবে? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক অন্য নবীদের ন্যায় ইউসুফ (আঃ)-কে এর দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। যেন এ ঘটনা স্মরণ করে সর্বদা তিনি আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁকে পরীক্ষা করেছেন যেন তিনি আল্লাহর নেয়ামতের কথা উপলব্ধি করেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে এজন্যে এর দ্বারা পরীক্ষা করেছেন যেন তিনি সে সব লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যারা গুনাহ করার পর তওবা করে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ইচ্ছা দু' প্রকার (১) সুদৃঢ় ইচ্ছা যাকে সংকল্প বলা যায়। যে কোন কাজের জন্যে সংকল্প করা যে, কাজটি অবশ্যই করবো। যেমন জোলায়খার ইচ্ছা এমনই ছিল, যার বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ

(২) আর অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে কোন ধারণা আসা বা কোন খেয়াল হওয়া, এ ধরণের ইচ্ছা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হয়েছিল, এটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় না। হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেনঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যখন আমার কোন বন্দা কোন প্রকার নেক আমলের কথা মনে মনে ভাবে, ঐ অবস্থাতেই আমি তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করি। যখন সে ঐ নেক কাজটি করে তখন ঐ নেক কাজের বদলে তার আমলনামায় ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ করি। পক্ষান্তরে, আমার কোন বন্দা যখন কোন মন্দ কাজের কথা মনে মনে ভাবে আর মনের ঐ ভাব কার্যতঃ বাস্তবায়িত না হয় তবে আমি তা মাফ করে দেই কিন্তু যদি সে ঐ মন্দ কাজ করে তবে ঐ মন্দ কাজের জন্যে এতখানি গুনাহর কথা লিপিবদ্ধ করি যা সে করেছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৭
[২]। তফসীরে তাবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১০৯-১০

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (রঃ)। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ এবং তিরমিজী শরীফে এ মর্মের হাদীস সংকলিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যখন আমার কোন বন্দা কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে আর কাজটি না করে তবুও তার জন্যে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করি। আর যদি সে ঐ নেক কাজটি করে তবে তার জন্যে ১০ থেকে ৭০০শ' নেকী পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করি। যদি বন্দা কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর সে কাজটি না করে তবে কিছুই তার জন্যে লিপিবদ্ধ করিনা। যদি মন্দ কাজটি সে করে তবে তার জন্যে একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করি।

এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেন যে, যদি এ পর্যায়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কোন গুনাহ্ হতো তবে আল্লাহ্ পাক তাঁর তওবা এস্তেগফারের কথাও উল্লেখ করতেন। যেমন হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত ইউনুস (আঃ)-এর তওবা এস্তেগফারের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। অথচ তাঁদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত কোন গুনাহ্ হয়নি; বরং অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা বিনীতভাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছেন। আর পবিত্র কোরআনে সে ক্ষমা প্রার্থনার উল্লেখ করা হয়েছে। আর হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর নিঃষ্পাপ হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

هِيَ رَاوَدْتُنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ

(এই মহিলাটি আমাকে কামনা করে)

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

"ইউসুফ বললেন আজিজ যেন জানতে পারেন যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

"নিশ্চয় যে পরহেযগার হয় এবং সবর অবলম্বন করে আল্লাহ্ পাক এমন নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না"। আর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

"নিশ্চয় ইউসুফ (আঃ) আমার মনোনীত বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত"।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যতা, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

"যদি ইউসুফ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখতেন (তবে তাঁর দ্বারা মন্দ কাজ হয়ে যেত)"।

এখন প্রশ্ন হলো হযরত ইউসুফ (আঃ) ঐ মুহূর্তে আল্লাহ পাকের কি নিদর্শন বা দলিল দেখতে পেয়েছেন? এ পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে।

যে নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন

হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ সে দলিল বা নিদর্শন হলো নবুওয়্যত, যা আল্লাহ পাক তাঁর মাঝে আমানত রেখেছিলেন অর্থাৎ নবুওয়্যতের নূর এমন অন্যায় কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন।

ইমাম কাতাদা এবং আরো অনেক তফসীরকার বলেছেনঃ ঐ মুহূর্তে হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে দেখতে পান যে, তিনি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দাঁতে আঙ্গুল চেপে আক্ষেপের সুরে বলেছেনঃ ইউসুফ! মূর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করছো? তোমার নাম আম্বিয়ায়ে কেরামের দপ্তরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রাঃ) লিখেছেন, আমার মতে এ মতটিই সঠিক।

হাসান বসরী (রঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ) ও যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন ছাদে একটি ফাটল রয়েছে। যেখানে হযরত ইয়াকুব (আঃ) দাঁতে আঙ্গুল চেপে আক্ষেপরত অবস্থায় চেয়ে আছেন।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের কুদরতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বশরীরে সম্মুখে এসে গেছেন এবং তাঁর হাত ইউসুফ (আঃ)-এর বক্ষে স্থাপন করেছেন, ফলে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ মোহাম্মদ এবনে সিরিনের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে দাঁত দিয়ে আঙুল চেপে বলছিলেন, ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ পুত্র এসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকুব, তাঁর পুত্র ইউসুফ তুমি যে আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত, তুমি মূর্খদের ন্যায় কাজ করছো?

হযরত ইউসুফ (আঃ) ঐ মুহূর্তে আল্লাহর তরফ থেকে যে নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) সেই মুহূর্তে একটি গায়বী আওয়াজ শুনেছেন। আওয়াজটি হলো এই, হে ইউসুফ! যতক্ষণ তুমি এ কর্মে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ তোমার অবস্থা সে পাখীর ন্যায় যে আকাশে উড়ে বেড়ায় এবং তাকে কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু যখন তুমি এ কর্মে লিপ্ত হবে তখন তোমার অবস্থা সেই পাখীর ন্যায় হয়ে যাবে যে মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকে। এ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তোমার অবস্থা সে বেয়াড়া গরুর ন্যায় যে কারো নিয়ন্ত্রণে আসেনা, আর এ

অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তোমার অবস্থা সে গরুর ন্যায় হবে যে মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকে এবং পিপিলিকারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে।

এবনে জরীর, কাসেম এবনে আবি বজ্জার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হে ইয়াকুবের পুত্র! সেই পাখীর ন্যায় হয়োনা যার পাখা ছিল অত্যন্ত ভাল কিন্তু এ অপকর্মে লিপ্ত হলে সব পাখা পড়ে যাবে।

এরপর হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে তিনি দেখতে পান।

মুজাহেদ (রঃ) একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঐ মুহূর্তে হযরত জীব্রাইল (আঃ) তখন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন দেয়ালে লেখা রয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়োনা, এটি অত্যন্ত অশ্লীল কাজ, অতীব মন্দ পথ"।

আতীয়্যা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) সেখানে ফেরেশতার আকৃতি দেখেছিলেন। ঐ দৃশ্যকেই আলোচ্য আয়াতে "বোরহান" বলা হয়েছে।

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন এবনে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ঐ গৃহে একটি মূর্তি ছিল। জোলায়খা ঐ মূর্তির উপর আবরণ রাখতে গিয়েছিল। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি এমনটি কেন করলে? সে বললো আমার লজ্জা লাগলো যে মূর্তিটি দেখবে। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে বললেনঃ তুমি এমন বস্তু থেকে লজ্জাবোধ করছো যা শ্রবণ করে না, দেখে না এমনকি কিছু বোঝেও না এমন অবস্থায় আমার প্রতিপালক থেকে আমার লজ্জাবোধ করা উচিত- একথা বলেই তিনি সেখান থেকে পলায়ন করলেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি মোজেযা

হযরত ইউসুফ (আঃ) সাতটি কক্ষের মধ্যে সপ্তম কক্ষে ছিলেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে যখন সেখান থেকে পলায়ন করলেন তখন আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত ও রহমতে প্রত্যেকটি দরজার বন্ধ তালা আপনা আপনি খুলে গেল। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এটি ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মোজেযা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে দিব্যজ্ঞান নিহিত ছিল তথা ব্যভিচারের জঘন্যতা সম্পর্কে তাঁর যে উপলব্ধি ছিল, তাই তিনি আল্লাহর তরফ থেকে দলিল হিসাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْۗءَ وَالْفَحْشَاۗءَ

"এভাবেই আমি অপকর্ম এবং অশ্লীল আচরণ তাঁর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই কেননা, তিনি আমার মনোনীত বন্দাদের অন্যতম"। যাঁরা আল্লাহর প্রিয় এবং মনোনীত বন্দা এবং বিশেষতঃ যাঁদেরকে আল্লাহ পাক নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করেন তাঁদের চরিত্র মহিমা অক্ষুণ্ন থাকবে, এটিই স্বাভাবিক এবং তাদেরকে কোন প্রকার পাপ কার্যের সংস্পর্শ থেকেও দূরে রাখার ব্যবস্থা আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয়ে থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারেও তাই হয়েছিল। পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) আদৌ মন্দ কাজের প্রতি সামান্যতম ইচ্ছাও করেননি, মন্দ কাজ তাঁর দিকে আসছিল, তিনি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন নিঃস্পাপ, তাঁর চরিত্র মহিমা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ

ঐ মহিলাটি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা ভাবে, তাঁর কথা চিন্তা করে এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

وَهَمَّ بِهَا

আর হযরত ইউসুফ (আঃ) ঐ মহিলাটির কথা চিন্তা করেন তথা তার ছলনা থেকে আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করেন। যদি বলা হতো যে,

وَلَقَدْ هَمَّا

আর তারা উভয়েই ইচ্ছা করে তখন হযরত ইউসুফও (আঃ) অন্যায় ইচ্ছা করেন বলে প্রমাণিত হতো কিন্তু তা বলা হয়নি। জোলায়খার ইচ্ছা ছিল তাঁকে পাওয়ার, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল তার নিকট থেকে আত্মরক্ষা করার অতএব, উভয়ের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

শেখ মহিউদ্দিন এবনে আরাবী (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার আধ্যাত্মিক জগতে কাশ্‌ফ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল। আমি আরজ করেছিলাম আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে আপনার ঘটনার বর্ণনায় এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا

"মহিলাটি তাঁর ইচ্ছা করেছিল, আর সে মহিলাটির কথা চিন্তা করেছিল"। এ পর্যায়ে কার কি ইচ্ছা তা নির্দৃষ্ট করে বলা হয়নি, প্রকাশ্যে একই ইচ্ছা মনে হয়। শেখ এবনে আরাবী (রঃ)-এর এ কথার জবাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেনঃ

نعم صدقت لكن فى اللفظ دون المعنى فانها هممت بى

অর্থাৎ হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু এ ঐক্য শাব্দিক, মর্মে নয়। সে ইচ্ছা করেছিল তার মতলব সিদ্ধির জন্যে আমাকে বাধ্য করতে, আর আমার ইচ্ছা ছিল তাকে বাঁধা দিতে এবং আত্মরক্ষা করতে। ইচ্ছা এবং চেষ্টা উভয়েরই ছিল। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আর একথার প্রমাণ স্বয়ং আজিজের স্ত্রীর কথায়ও রয়েছে, সে নিজেই স্বীকার করেছে।[১] পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ

"এক্ষণে সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, আমিই তাঁর নিকট অসৎ কর্ম কামনা করেছিলাম"।

وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"আর নিশ্চয় সে সত্যবাদী"।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উভয়ে ইচ্ছা করেছেন এ কথা সত্য, কিন্তু উভয়ের ইচ্ছার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। স্ত্রীলোকটির ইচ্ছা ছিল ভোগ, আর আল্লাহর নবীর ইচ্ছা ছিল মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সত্যের নির্দেশ দেয়া, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা।[৩]

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, গরমের মওসুমে রোজাদার ব্যক্তির মনে পানির খেয়াল আসে। কিন্তু সে পানি পান করেনা। ঐ খেয়াল আসার কারণে রোজার কোন ক্ষতি হয়না। ঠিক এমনিভাবে যদি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মনে কোন খেয়াল এসেও থাকে তবে তা ছিল অনিচ্ছাকৃত কেননা, নবীগণ নিঃষ্পাপ হন আর আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেনঃ

لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ

(আমি ইউসফকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রেখেছি) এরপর আল্লাহ পাক তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

"নিশ্চয় তিনি আমার মনোনীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত"।

এর পরবর্তী আয়াতেও রয়েছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিঃষ্পাপ নিষ্কলংক হওয়ার ঘোষণা।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০
২। আল-ইয়াওয়াবিত ওয়াল যাওয়াহের খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১১৮

"আর তারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়ে যায়, স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে নেয়"।

হযরত ইউসুফ (আঃ) আত্ম সংযমের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি ঐ মুহূর্তে জোলায়খার পাল্লা থেকে আত্মরক্ষার্থে দরজার দিকে দৌড়ান। তাঁর পেছনে জোলায়খাও দৌড়ে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। হযরত ইউসুফ (আঃ) দৌড়াচ্ছিলেন আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ (তোমরা দৌড় আল্লাহর দিকে) এই আদেশ মোতাবেক।

পক্ষান্তরে জোলায়খা দৌড়াচ্ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ধরে রাখতে পারেনি, তবে পেছন দিক থেকে তাঁর জামা ধরে টান দিয়েছে, জামা ছিঁড়ে গেছে, তিনি তাঁর নাগালের বাইরে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) দৌড়ে ঘরের বাইরে এসে পৌঁছেন, তাঁর পেছনে ছুটে এসে জোলায়খাও পৌঁছে, এখানে তারা উভয়ে জোলায়খার স্বামী কেতফীরকে দেখতে পায়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, জোলায়খার চাচাত ভাই এবং কেতফীর সেখানে উপস্থিত ছিল।

ছলনাময়ী জোলায়খা ঐ মুহূর্তে তার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলো। অপরাধিনী জোলায়খা তার অপরাধ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বললোঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا

যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সাথে অপকর্মের ইচ্ছা করেছে তার শাস্তি কি হতে পারে? তাকে কারারুদ্ধ করা, অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করা। স্বামীর নিকট নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে সে একথা বললো।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ
إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ
كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ
نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن
نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৬) ইউসুফ বললেন ঃ সে-ই আমার নিকট থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিল। আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়ে বললো, তার জামাটি যদি সম্মুখ ভাগে ছিন্ন হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

(২৭) কিন্তু তার জামাটি যদি পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটিই মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।

(২৮) অতঃপর যখন গৃহস্বামী দেখলো যে, ইউসুফের জামাটি পেছন দিক থেকে ছিড়ে গেছে তখন সে বললো এ হলো তোমাদের নারীদের ছলনা। নিশ্চয় তোমাদের ছলনা অত্যন্ত ভয়ংকর।

(২৯) (গৃহস্বামী বললো) হে ইউসুফ! এর চর্চা ছেড়ে দাও (এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর, মনে কিছু নিওনা)।

(হে জোলায়খা!) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই অপরাধী।

(৩০) আর ঐ শহরের মেয়েরা বলাবলি করতে থাকে, আজিজের স্ত্রী তার গোলাম থেকে অসৎ কর্ম কামনা করে, নিশ্চয় প্রেম তাকে উন্মত্ত করে ফেলেছে। নিশ্চয় আমরা তাকে স্পষ্ট ভুলের মধ্যেই দেখছি।

তফসীরুল কোরআন

যেহেতু অপরাধিনী জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাই তিনি বাধ্য হয়ে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي

"তিনি বললেন, আমি নই, এ মহিলাটিই আমার নিকট থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিল"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যদি জোলায়খা তাঁর উপর অপরাধ চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা না করতো তবে হযরত ইউসুফও (আঃ) আসল ঘটনা এভাবে ব্যক্ত করতেন না। তিনি বলেছেনঃ "মন্দ এবং ঘৃণ্য কাজের মূল হোতা ইনিই। আমি পলায়ন করে কোনভাবে আত্মরক্ষা করেছি"।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا

জোলায়খার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি এ স্বাক্ষ্য দিল। কেউ বলেছেন, এ সাক্ষী ছিল জোলায়খার চাচাতো ভাই, আর কেউ বলেছেন মামাতো ভাই।

সাঈদ এবনে যোবায়ের এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এ সাক্ষী ছিল একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু যাকে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতে ঐ মুহূর্তের জন্যে বাকশক্তি দান করেছেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, উফীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, চারটি শিশু শৈশবে কথা বলেছে।

১. ফেরাউনের মেয়ের খাদেমার ছেলে,

২. ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষী,

৩. যোরাইহ রাহেবের পবিত্রতার সাক্ষদাতা শিশু,

৪. ঈসা এবনে মরয়ম।

হয়তো এ শিশুটি জোলায়খার আপন লোকদের মধ্যে কারো ছিল।[১]

اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ

সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিল তা হলো এই, যদি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামা সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে জোলায়খার কথা সত্য হবে। আর ইউসুফ (আঃ) মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত হবে।

পক্ষান্তরে, যদি তাঁর জামাটি পেছন থেকে ছেঁড়া থাকে তবে একথা প্রমাণিত হবে যে, জোলায়খা মিথ্যাবাদী এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী। কেননা এতে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে যে, ইউসুফ (আঃ) আত্মরক্ষার্থে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছেন এবং জোলায়খা তাঁর পেছনে ছুটে তাঁর জামা ধরে পেছন থেকে টান দিয়েছিল, ফলে জামা ছিঁড়ে গেছে।

বস্তুতঃ এটি ছিল সত্য মিথ্যা যাচাই করার একটি পন্থা।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুন কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দনভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ

মিশরের আজিজ যখন দেখলো ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি পেছন থেকে ছেড়া আছে তখন সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, ইউসুফ (আঃ) পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তিনি সত্যবাদী, তিনি নিস্পাপ-নিস্কলংক। তার স্ত্রীই মূলতঃ অপরাধিনী, এসব তারই চক্রান্ত। জামাটির পেছন থেকে ছেড়া দেখে হযরত ইউসুফ (আঃ) যে নির্দোষ তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। জোলায়খার চক্রান্তের ব্যাপারে আর কারো কোন সন্দেহ রইল না।

قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ

তাই সে বললো ঃ

নিশ্চয় এ হলো তোমাদেরই চক্রান্ত।

اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ

নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত অত্যন্ত ভয়ংকর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, নারীদেরকে প্রকাশ্যে দুর্বল মনে হয়, আর এ কথাও মনে হয় যে তারা সত্য কথা বলে কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। তাদের বুদ্ধি বিবেচনার দুর্বলতা এবং দ্বীনদারীর ত্রুটি সর্বজন স্বীকৃত। শয়তান তাদের সঙ্গে থাকে যে পুরুষদের জন্যে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে রাখে।

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মেয়েরা হলো শয়তানের জাল। তাদের বুদ্ধি কম, দ্বীনও কম। বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু ইসলামী আদালতে এক জন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। দ্বীনের ত্রুটি এ কারণে যে, প্রতি মাসে কিছু দিন তারা অপবিত্রতার কারণে নামাযে হাযির হতে পারে না প্রভৃতি।[১]

আলোচ্য আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন নিঃষ্পাপ নিস্কলংক। এ ব্যাপারে আলোচ্য ঘটনায় তাঁর সামান্যতম দুর্বলতাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়না। তাঁর পবিত্রতায় কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। তিনি নিজেই বলেছেনঃ

১. هِيَ رَاوَدْتُّنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ

"সে আমার নিকট থেকে অপকর্ম কামনা করেছিল"।

২. জোলায়খা এ সত্য স্বীকার করেছেঃ

اَلْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪১-৪৩

"এখন সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেই তার নিকট অপকর্ম কামনা করেছিলাম। নিশ্চয় সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত"।

৩. মিশরের আজিজের স্বীকৃতি

إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ

"নিশ্চয় এসব তোমাদেরই চক্রান্ত। নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত অত্যন্ত ভয়ংকর"। হে ইউসুফ! মনে কিছু নিওনা। এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর। হে জোলায়খা! তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত"।

৪. সাক্ষীর সাক্ষ্য ঃ

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ

যদি তার জামাটি পেছন থেকে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদী, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত (আর জামাটি পেছন থেকেই ছেঁড়া ছিল)।

৫. মিশরের মহিলাদের সাক্ষ্য ঃ

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ

"তারা বললো আল্লাহর শপথ! আমরা তাঁর সম্পর্কে কোন মন্দ কথা জানিনা"।

৬. সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ পাকের ঘোষণাঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ

"আর যার ঘরে ইউসুফ ছিলেন সে স্ত্রীলোকটি তার উপর আসক্ত হয়েছে"।

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

"আমি অন্যায় অশ্লীল অসুন্দর কাজ তাঁর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। সে ছিল আমার মনোনীত বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত"।[১]

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا

মিসরের আজিজ যখন সত্য উপলব্ধি করলো যে, অপরাধ শুধু জোলায়খারই, ইউসুফ সম্পূর্ণ নিঃস্পাপ নিস্কলংক, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সম্বোধন করে সে বললো, হে ইউসুফ! যা হওয়ার হয়ে গেছে, মনে কিছু নিওনা। বিষয়টি ভুলে যাও। এ সম্পর্কে চর্চা করোনা। কেননা এতে অপমান ব্যতীত আর কিছুই নেই। এরপর জোলায়খাকে সম্বোধন করে বললোঃ

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩
তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১২৩-২৪

নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী। অতএব, তোমার অপরাধের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অথবা এর অর্থ হলো তুমি ইউসুফকে কষ্ট দিয়েছ, তাঁর নিকট ক্ষমা চাও।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَّفْسِهِ

ঐ শহরের মেয়েরা বলাবলি করতে থাকে, আজিজের স্ত্রী তার গোলামের প্রতি আসক্ত হয়েছে। অর্থাৎ যে ঘটনা ঘটে গেল তা প্রথমে কয়েকজনই জানতে পেরেছিল। আজিজ নির্দেশ দিয়েছিল যেন এ বিষয়ে আর কথাবার্তা না হয় কিন্তু এ খবর আর গোপন রইল না। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো যে, আজিজের স্ত্রী জোলায়খা তার গোলামের প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। কিভাবে জোলায়খা চক্রান্ত করেছিল আর কিভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) এ অপকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন তা সারা শহরে প্রচারিত হলো এবং তারা এ কথাটি লজ্জাকর মনে করে ঘৃণা প্রকাশ করলো। তারা বললো,

إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(নিশ্চয় জোলায়খা সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছে) সে পথভ্রষ্ট এবং দিশেহারা হয়েছে। যদি তাই না হবে তবে এমন অন্যায় কাজ কি করে হতে পারে?

আমরা নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করছি যে, আজিজের স্ত্রী জোলায়খা অবশ্যই ভুলের মধ্যে রয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, যারা এ সম্পর্কে সমালোচনা করেছে তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ জন। তারা বলেছে ইউসুফের প্রেম তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। এভাবে সমাজে এ ব্যাপারে তার সমালোচনা হতে থাকে।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
وَّآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا
رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ
إِنْ هٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ؕ
وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصّٰغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
كَيْدَهُنَّ ؕ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا
الْآيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِينٍ ﴿٣٥﴾ ع

তরজমা

(৩১) জোলায়খা যখন তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শ্রবণ করে তখন সে তাদের সকলকে ডেকে পাঠায় এবং তাদের জন্যে একটি আসরের আয়োজন করে, তাদের প্রত্যেকের হতে একটি করে ছুরি দেয়, আর ইউসুফকে বলে হে ইউসুফ! এদের সম্মুখে বের হয়ে আস। অতঃপর ঐ মহিলারা যখন তাঁকে দেখতে পায় তখন তারা অভিভূত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলে এবং তারা বলে, আল্লাহ পাকের কি অপূর্ব লীলা! এ-তো মানুষ নয়, বরং এ হলো কোন মহান ফেরেশতা।

(৩২) জোলায়খা বললো এ হলো সে, যার সম্পর্কে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তার নিকট থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যে আদেশ দিয়েছি যদি সে তা না করে তবে অবশ্যই কারাগারে পড়ে থাকবে, অথবা অপমানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩৩) ইউসুফ (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে বিষয়ে আমাকে আহ্বান করে তা থেকে কারাগারই আমার জন্যে অধিক প্রিয়। যদি তুমি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না কর তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

(৩৪) এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মেয়েদের ছলনা থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৩৫) এরপর নিদর্শন সমূহ দেখে তারা বিবেচনা করলো যে, কিছু দিনের জন্যে ইউসুফকে কারাগারে রাখতেই হবে।

তফসীরুল কোরআন

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্যের প্রচার ইতিপূর্বেই হয়েছিল। কিন্তু জোলায়খার এ ঘটনা জানাজানির পর তাঁর সম্পর্কে অনেকেরই কৌতুহল বেড়ে যায়। কিন্তু আজিজের মহলে তাঁর দর্শন লাভ করা সহজ ব্যাপার ছিলনা। জোলায়খার সমালোচনার কারণে তার একটি পন্থা তৈরী হলো। জোলায়খা সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্যে একটি আসরের ব্যবস্থা করে এবং সকলকে ঐ আসরে অংশগ্রহণের জন্যে ডেকে পাঠায়। ভোজের আসর সুসজ্জিত হয়। খাদ্য তালিকায় যে ফল মূল ছিল তা স্বহস্তে কেটে খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিয়ে দেয়া হয়। তারা ছুরি দিয়ে ফল কাটতে শুরু করবে, ঠিক এমন সময় জোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সমস্ত মহিলাদের সম্মুখে যেতে বলে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখা মাত্র মহিলারা হতবাক হয়ে যায়। তারা যেন অন্য জগতে চলে যায়। তাদের বিবেক বুদ্ধি যেন ঐ মুহূর্তে বিদায় নেয়, তারা হাতের ছুরি দিয়ে নিজের হাতই কেটে ফেলে এবং বিস্মিত হয়ে বলে উঠে, এ-তো মানুষ নয়, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً

"আর তাদের জন্যে সে আসরের আয়োজন করে"।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, জোলায়খা ঐ আসরে ৪০ জন মহিলাকে দাওয়াত করে, যাদের মধ্যে সে-সব মহিলাও ছিল যারা তার সমালোচনা করেছিল। ঐ আসরের প্রত্যেকের জন্যে আরামদায়ক আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ مُتَّكَاً শব্দটির অনুবাদ করেছেন খাবার, যারা আরামপ্রিয় লোক তারা আরামদায়ক কুশনে বসে খায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাম হাতে খেতে এবং আরামদায়ক কুশনে হেলান দিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন– مُتَّكَاً সেই খাবারকে বলা হয় যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আজিজের স্ত্রী রকমারী খাদ্যদ্রব্য ও ফল সাজিয়ে রাখে এবং হেলান দিয়ে খাওয়ার জন্যে অত্যন্ত আরামদায়ক কুশনেরও ব্যবস্থা করে।

وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا

আর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিয়ে দেয়। কেননা তারা ছুরি দিয়ে গোশ্ত কেটে খেতে অভ্যস্ত ছিল।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

আর ঐ সময় জোলায়খা ইউসুফকে বললো, এই মহিলাদের সম্মুখে বের হও। তফসীরকারগণ লিখেছেন, জোলায়খা পূর্বাহ্নেই ইউসুফ (আঃ)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি বের হন।

একরামা (রঃ) বলেছেন, সৌন্দর্যের ব্যাপারে সকলের উপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রাধান্য ছিল, যেমন সকল নক্ষত্রের উপর ১৪ তারিখের চন্দ্রের প্রাধান্য রয়েছে।

এবনে জরীর, হাকেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে রাত্রে আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয় (অর্থাৎ শবে মেরাজে) আমি দেখেছি, ইউসুফ (আঃ) ছিলেন ১৪ তারিখের চন্দ্রের ন্যায়। আবুশ শেখ তাঁর তফসীরে এসহাক এবনে আবদুল্লাহ আবি ফরদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিশরের পথ অতিক্রম করতেন তখন তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যে দু'পাশের দেয়ালগুলো আলোকময় হয়ে উঠতো। যেমন, সূর্যের আলোকরশ্মি যখন দেয়ালে পড়ে তখন তার কারণে দেয়াল আলোকময় হয়।[১]

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

অর্থাৎ-মহিলারা যখন ইউসুফ (আঃ)-কে দেখলো তখন তারা হতবাক এবং অজ্ঞান হয়ে গেল।

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কেও অনুরূপ আকৃতি দেয় হয়েছিল। আসরে উপস্থিত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর চেহারায় নবুওয়্যতের নূর দেখেছিল। আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর যে আনুগত্য ও বিনয় ছিল তার বহিঃপ্রকাশও ঘটেছিল তাঁর চেহারার মাঝে। নবুওয়্যতের নিজস্ব জ্যোতি রয়েছে। যার প্রভাব দর্শক মাত্রের উপরই পড়তো। হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন পূতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। নিঃস্পাপ, নিস্কলংক এবং অদ্বিতীয় সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁকে দেখে মনে হতো তিনি যেন একজন ফেরেশতা। তাই মিশরের মহিলারা তাঁকে দেখে বলেছিলঃ

وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا

আল্লাহ পাকের কি অপূর্ব লীলা! এমন বিস্ময়কর, এমন সুন্দর আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করতে পারেন। কেননা তিনি সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র, তাঁর নিকট অসম্ভব কিছুই নেই।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১২৭

مَا هٰذَا بَشَرًا ۭ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

এ-তো মানুষ নয়; বরং সম্মানিত ফেরেশতা। কেননা, মানুষ এত সুন্দর হয়না, আর মানুষের চরিত্র এত পবিত্রও হয়না, যে সৌন্দর্য এবং যে নৈতিক ঐশ্বর্য তাঁর মাঝে দেখা যাচ্ছে। তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে কত অভিভূত হয়েছিল তা ধারণা করা যায় পরবর্তী বাক্য দ্বারা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ

"তারা ফল কাটার পরিবর্তে হাতই কেটে ফেলেছিল"।

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য দেখে তারা এত বিহ্বল হয়েছিল যে, ফল না কেটে নিজেদের হাতই কেটে ফেলেছিল আর হাত কাটার কষ্টের উপলব্ধিও তাদের হয়নি।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, শুধু তাই নয়; বরং রক্ত প্রবাহিত হওয়ার খবরও তাদের হয়নি।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলে দিয়েছে। তবে অন্য তফসীরকারগণ বলেছেন, হাত কেটেছে তবে ফেলে দেয়নি।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে যারা অজ্ঞান হয়েছিলো, তাদের মধ্যে কারো প্রাণ বায়ু বের হয়েছিল।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ

"জোলায়খা বলে, এই-ই সেই (ইউসুফ) যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে দোষারোপ কর। আমিই তার মন নিতে চাই, কিন্তু সে আত্মরক্ষা করে"।

যে মহিলারা ঐ আসরে সমবেত হয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অসাধারণ সৌন্দর্য দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল এবং ফলের স্থলে নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল, জোলায়খা এক্ষণে তাদেরকে তাদের সমালোচনার জবাব দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেল। যারা ইতিপূর্বে জোলায়খাকে কটাক্ষ করে কথা বলতো, তাদেরকে সে বললোঃ এই সেই ইউসুফ, যাঁর কারণে তোমরা আমাকে দোষারোপ করছিলে। এখন নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার অবস্থার মূল্যায়ন কর, যাঁর সৌন্দর্য রশ্মির বিকীরণে তোমাদের এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন চিন্তা কর আমার কি অবস্থা হতে পারে!

জোলায়খা তখন তার কৃতকর্মের কথা সমবেত মহিলাদের নিকট স্বীকার করে বললো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ

এ কথা সত্য যে, নিশ্চয় আমিই তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করেছি। সে তাঁর পবিত্র চরিত্রকে রক্ষা করেছে, আমার আত্ম-নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান

করেছে। এভাবে জোলায়খা সকলের সম্মুখে অকপটে তার মনের কথা বললো। এরই মধ্যে আসরের রূপ পরিবর্তন হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে যারা জোলায়খার সমালোচনায় মুখর ছিল এখন তাদের সকলের মনেই সৃষ্টি হলো তার জন্যে সহমর্মিতা এবং সকলেই হয়ে গেল তার জন্যে দরদী।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ঐ মহিলারা তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট জোলায়খার পক্ষে সুপারিশ করে বললো, তোমার অভিভাবিকা যেমন চায় তেমনি কাজ কর, তার কথা মেনে চল। এতে দু'টি কথা প্রমাণিত হয়ঃ

প্রথমতঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মহান পূতঃ পবিত্র, নিঃষ্পাপ, নিস্কলংক মহৎ চরিত্রের স্বাক্ষ্য পাওয়া যায় স্বয়ং জোলায়খার তরফ থেকে। কেননা সে নিজেই স্বীকার করে আমি আমার পক্ষ থেকেই তাঁকে আকৃষ্ট করার শত চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সে নিজেকে রক্ষা করেছে। দ্বিতীয়ত, জোলায়খা এ পর্যায়ে তার আত্মসংযমে অক্ষমতা এবং অসহায় অবস্থার যে বিবরণ দিয়েছে তার কারণে সমবেত মহিলাদের সহানুভূতি, সমবেদনা এবং সহমর্মিতা লাভে সে সক্ষম হয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে তাদের যে অবস্থা হয়েছে তার প্রেক্ষিতেই তারা জোলায়খার প্রতি দরদী হয়েছে। এ অবস্থায় জোলায়খার সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সে ঐ মহিলাদের সম্মুখেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হুমকি দেয় যেন এর দ্বারা তাঁকে বশ করতে পারে। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ

"আর সে যদি আমার কথা মত কাজ না করে তবে অবশ্যই সে কারাগারে পড়ে থাকবে অথবা অপমানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

ইতিপূর্বে জোলায়খা তার কার্যসিদ্ধির জন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট অনেক ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, বিভিন্নভাবে অনুনয় বিনয় করে তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু যখন কোন চেষ্টাই সফল হয়নি এবং তিনি তার কোন চক্রান্তেরই শিকার হননি, এরপর শহরের গণ্যমান্য মহিলারা এসে সুপারিশ করেছে, তাতেও তাঁকে রাজি করানো সম্ভব হয়নি, তাই জোলায়খা তাঁকে হুমকি ধমকি দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাজি করানোর চেষ্টা করেছে। জোলায়খা বলেছে আগে যা হওয়ার হয়েছে, কিন্তু এখন আমি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যদি ইউসুফ আমার কথামত কাজ না করে, যদি সে আগের মত এখনও আমার কথায় রাজি না হয় তবে তাকে কারাগারে যেতে হবে, অথবা চরম অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বলাবাহুল্য, মানব মনে এমন ধমকের প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মনের গহনে কি সব ধারণার অবতারণা হতে পারে সে সম্পর্কে লিখেছেনঃ

১. তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মনে এ ধারণা হতে পারে যে জোলায়খা একজন সুন্দরী মহিলা।

২. সে সম্পদশালী এবং ক্ষমতার অধিকারিনী। আর সে এ সংকল্প করে রেখেছে যে, যদি তিনি তার মনষ্কামনা পূর্ণ করতে রাজি হন তবে তার যথাসর্বস্ব হয়তো তাঁর জন্যে ব্যয় করবে।

৩. সেদিনের আসরে যারা সমবেত হয়েছিল, তারা সকলেই তাঁকে এজন্যে অনুপ্রাণিত করছিল নতুবা এর পরিণাম ভয়াবহ হবে–এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছিল। এ সম্পর্কে মহিলাদের চক্রান্ত হয় ভয়ংকর।

৪. হযরত ইউসুফ (আঃ) আশঙ্কা করছিলেন, হয়তো সে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, কিন্তু তিনি এ সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিত্যাগ করলেন। এক আল্লাহর ভয়ে তাঁর মনোবলে এতটুকু কমতি হলোনা, তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তায় এবং চরিত্র-নিষ্ঠায় সামান্যতমও ফাটল ধরলো না। আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসায় তিনি সত্য-সাধনা অব্যাহত রাখলেন।[১]

যেহেতু জোলায়খা বলেছে, "সে আমার কথা মেনে চলবে নতুবা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে"। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যে তখন দু'টি পথ খোলা ছিলঃ

১. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অথবা

২. কারাগারের শাস্তি ভোগ করা।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাই আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করে বললেনঃ

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ

"হে আমার প্রতিপালক! তারা আমাকে পাপাচারের দিকে ডাকে, যদি আমি তাদের ডাকে সাড়া না দেই তবে তারা আমাকে কারাগারের ভয় দেখায়। তারা যে অন্যায় অনাচারের দিকে আমাকে ডাকে তা থেকে আমার নিকট কারাগার অতি পছন্দনীয়"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ঐ আসরের প্রত্যেকটি নারীই হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তার নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও লিখেছেন যে, মানুষের কর্তব্য হলো যত বিপদই হোক না কেন সবর অবলম্ব করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য হয়ে নিজের জন্যে কোন অকল্যাণ কামনা করা অনুচিত।

কল্যাণের জন্যে দোয়া করাই কর্তব্য

হযরত মু'আজ এবনে জবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি দোয়া করছে হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে সবর অবলম্বনের তওফিক দান কর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ তুমি বিপদ কামনা করেছ, অতএব, বিপদ থেকে নিরাপত্তা কামনা কর।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩১

তেবরানী আব্বাস এবনে আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কোন একটি কথা শিক্ষা দিন যা আমি দোয়া করব। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি বিপদ থেকে নিরাপত্তার জন্যে দোয়া কর। কিছুদিন পরে আমি পুনরায় হাযির হলাম এবং আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কোন দোয়া শিক্ষা দিন, তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি আল্লাহ পাকের নিকট দুনিয়া আখেরাতের বালা-মসিবত থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে দোয়া কর।

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ

"হে আল্লাহ! যদি তুমি তোমার বিশেষ দয়ায় তাদের এ চক্রান্ত দূরীভূত না কর তবে আশঙ্কা রয়েছে আমি তাদের চক্রান্তে পতিত হব এবং মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব"।

এতে প্রমাণিত হয়, আম্বিয়ায়ে কেরামের নিঃস্পাপ হওয়া আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়ার কারণেই হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিঃস্পাপ নিস্কলংক হওয়া তাঁদের বৈশিষ্ট্য। আর এটি পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা-নির্ভর। এজন্যেই সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ পাকের মদদপুষ্ট হন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শক্তি এবং তৌফিকেই তাঁদের প্রতি অর্পিত মহান দায়িত্ব তাঁরা পালন করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়, মোমেন যদি কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হয় তবে তা মূর্খতার কারণেই হয়।[১]

অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেনঃ

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ

এবং তাঁর থেকে তাদের ষড়যন্ত্রকে অপসারিত করলেন এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে এমন ভয় দিয়েছিলেন যে, তিনি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাস সবই পরিহার করেছেন, পাপাচারের স্থলে কারাগারকে তিনি পছন্দ করেছেন যাতে করে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তিনি রক্ষা পেতে পারেন এবং আখেরাতের সওয়াব লাভ করেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সাত প্রকার লোককে আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন এছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা।

১. মুসলিম সুবিচারক বাদশাহ।

২. সেই যুবক পুরুষ নারী, যে তার যৌবনকে আল্লাহর এবাদতে অতিবাহিত করেছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৭

৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত, মসজিদ থেকে বের হলেও মন মসজিদেই থাকে, এমনকি পুনরায় সে মসজিদে গমন করে।

৪. সেই দু' ব্যক্তি যারা পরস্পর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মহব্বত রাখে, এ মহব্বতের অবস্থায় তারা একত্রিত হয় আর এ অবস্থায় তারা আলাদা হয়।

৫. সে ব্যক্তি যে এত গোপনীয়তার সাথে আল্লাহর রাহে দান করে যে, ডান হাতে যা দান করে বাম হাত তার খবর রাখেনা।

৬. সে ব্যক্তি যাকে কোন মর্যাদা সম্পন্ন সুন্দরী স্ত্রীলোক ডাকে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৭. যে একাকী আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, এরপর তার নয়নযুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।[১]

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ

"অনেক নিদর্শন দেখার পর তারা ইউসুফকে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত কারাগারে রাখার কথা বিবেচনা করে"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিঃস্পাপ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হওয়ার পরও জোলায়খার স্বামী আজিজ এবং তার আত্মীয়-স্বজন তাকে কিছু দিনের জন্যে কারাগারে রাখা সমীচিন মনে করলো। একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে বাকশক্তি পেল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দোষিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল।

দ্বিতীয়ত, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া পাওয়া গেল।

তৃতীয়ত, শহরের গণ্যমান্য মহিলারা এসেও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট জোলায়খার সুপারিশ করলো। এতদ্ব্যতীত জোলায়খা প্রথমে ছলনা এবং অনুনয় বিনয়ের পন্থা অবলম্বন করে যখন ব্যর্থ হলো তখন হুমকি ধমকি এবং ভয় প্রদর্শনের পন্থা গ্রহণ করলো।

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অনমনীয় মনোবলে এতটুকু পরিবর্তন হলোনা। এমন অবস্থায় জোলায়খা মনে করলো যে, কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকার পর কারাগারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হয়ত সে রাজী হয়ে যাবে। আর এভাবে শহরে যে দুর্নাম রটে গিয়েছিল তা দূরীভূত হবে। এজন্যে জোলায়খা আজিজকে বললোঃ এ এবরানী গোলামতো আমাকে অপমানিত করে ফেলেছে, সে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি তাকে প্ররোচনা দিয়েছি। অতএব, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি মানুষের নিকট গমন করে তাদের ভুল ধারণা নিরসন করি, অথবা আপনি তাকে বন্দী করুন যাতে করে মানুষ এসব বিষয় ভুলে যায়।

আজিজ মনে করলো যে, ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ করলে সাধারণতঃ মানুষ মনে করবে হয়ত তার দোষ ছিল।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৫৬

দ্বিতীয়তঃ অনেক দিন কারাগারে থাকলে জোলায়খার প্রেমেও ভাটা পড়তে পারে, এভাবে এ সমস্যার একটি সমাধান হবে।

এ কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে একটি নিদৃষ্ট কালের জন্যে কারারুদ্ধ করা হয়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জোলায়খার সম্পর্কে যে দুর্নাম রটে গিয়েছিল তা যেন বন্ধ হয় এবং মানুষ যেন ঘটনাটি ভুলে যায়, এজন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পবিত্র কোরআনে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কতদিন কারাগারে রাখা হয়েছিল, তবে এতটুকু ঘোষণা করা হয়েছে যে এক নির্দৃষ্ট কাল পর্যন্ত তাঁকে কারাগারে রাখা সমীচিন মনে করা হয়। আর এ নির্দিষ্ট কাল সম্পর্কে তফসীরকারগণের মধ্যে কেউ বলেছেন, পাঁচ বছর, আর কেউ বলেছেন সাত বছর।

মোকাতেল এবনে সোলায়মান বলেছেন ১২ বছর।[২]

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۖ قَالَ
اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ
رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا
بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۚ اِنِّيْ تَرَكْتُ
مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৬) আর তাঁর সঙ্গে দু'জন যুবকও কারাগারে প্রবেশ করে। তাদের একজন বলে, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি আংগুর নিংড়ে রস বের করছি এবং অপরজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখিরা তা থেকে খাচ্ছে, আমাদেরকে এর তা'বির বলে দিন। নিশ্চয় আমরা আপনাকে নেককার দেখছি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৫৬

২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩২-৩৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৩৭

(৩৭) ইউসুফ বললেন, তোমাদেরকে যে খাবার দেয়া হয় তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এর তা'বির বলে দেব, এটি সেই জ্ঞান যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা এবং আখেরাতকে অবিশ্বাস করে, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।

তফসীরুল কোরআন

পুর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়ার উল্লেখ ছিল। তিনি দোয়া করেছিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! এ মহিলারা যেদিকে আমাকে আহ্বান করে তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্যে উত্তম"। আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ একই সময় আরো দু'জন যুবক কারাগারে প্রেরিত হয়। একজন ছিল বাদশার পাচক, তার নাম ছিল বাহলাস। অপর জন ছিল বাদশার সাকী (সূরা পরিবেশক)। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তারা বাদশাহর পানাহারে বিষ মিশিয়েছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কিছু লোক বাদশাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে, এজন্যে উপরোক্ত দু' ব্যক্তিকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বাদশাহর পানাহারে বিষ মিশিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সূরা পরিবেশক এ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু পাচক উৎকোচ নিয়ে বাদশাহর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়। যখন বাদশার সম্মুখে খাবার আসে তখন সূরা পরিবেশক বলে এ খাবারে বিষ রয়েছে। এ খাবার গ্রহণ করবেন না। আর পাচক (জেদ করে) বললো, এ পানিতে বিষ রয়েছে, পানি পান করবেন না। বাদশাহ সূরা পরিবেশককে আদেশ দিলেন, এ পানি তোমাকে পান করতে হবে, সে পান করলো, তার কোন ক্ষতি হয়নি। এরপর বাদশাহ পাচককে আদেশ দিল এ খাবার তোমাকে খেতে হবে কিন্তু সে খাবার গ্রহণ করতে রাজী হলোনা। ঐ খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। বাদশার এ খাবার জন্তুর সম্মুখে রাখা হলো যা খেয়ে জন্তুটি মারা গেল।

বাদশাহ উভয়কে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেয়। পাচককে খাবারে বিষ মেশানোর জন্যে, আর সাকীকে এ পরামর্শে অংশীদার থাকার জন্যে। এদিকে কারাগারে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সততা, সাধুতা এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ঈমানদারী, আমানতদারী, বদান্যতা, এবাদত বন্দেগী, আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা এবং পরহেযগারীর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ ছিল। কারাগারের অধিবাসীদের প্রতি তাঁর মধুর ব্যবহার, তাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, কেউ রুগ্ন হলে তার সেবা-শুশ্রুষা করা, বিপদগ্রস্ত লোকদের প্রতি সমবেদনা-সহমর্মিতা প্রকাশ করা ছিল কারাগারে তাঁর অন্যতম কর্মসূচী। তাঁর সঙ্গে যে দু'জন লোক কারাগারে প্রেরিত হয়েছিল, তারা তাঁর ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা একদিন তাঁর নিকট হাযির হয়ে তাদের স্বপ্নের তা'বির তাঁর নিকট জানতে চাইল। বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজেও একথা ঘোষণা করেছিলেন যে আমি স্বপ্নের তা'বির জানি। এ কারণে তারা তাঁর নিকট তাদের স্বপ্নের

তা'বির জানার জন্যে হাযির হয়। এ পর্যায়ে একথা উল্লেখযোগ্য, কোন ওলী দ্বারা যদি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটে তবে তাকে কারামত বলা হয়। আর যদি নবীর দ্বারা কোন অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পেলে, তাকে মোজেযা বলা হয়। কোন ওলীর জন্যের তাঁর কারামত জাহের করা জরুরী নয়, কিন্তু যেহেতু মোজেযা নবুওয়্যতের দলিল, সেজন্যে যেভাবে নবুওয়্যতের ঘোষণা দেয়া নবীর কর্তব্য, ঠিক তেমনি নবুওয়্যতের দলিল মোজেযা প্রকাশ করাও কর্তব্য। সেজন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের তা'বির সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন, তা মানুষকে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই উভয় যুবক তাঁর নিকট এসে তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করে তার তা'বির জানতে চায়।

قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا

"তাদের একজন বললো, আমি আঙ্গুর নিংড়ে রস বের করছি"। সে স্বপ্নটির বিস্তারিত বৃত্তান্ত এভাবে বর্ণনা করেছে। আমি দেখলাম যে আমি একটি বাগানে রয়েছি, আঙ্গুর বৃক্ষের কাছেই আছি, আঙ্গুরের রস নিংড়ে বাদশাহ প্রদত্ত পাত্রে রাখছি। আমি তা বাদশাহকে দিয়েছি, তিনি তা পান করেছেন।

وَقَالَ الْاٰخَرُ

দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ পাচক বললো, আমি দেখলাম আমি নিজের মাথার উপর রুটি বহন করছি, তিন টুকরি রুটি ছিল, তখন আমার মাথার উপর ছিল এছাড়া আরও অনেক রকম খাদ্য দ্রব্য। আমি দেখলাম যে পাখীরা আমার মাথার উপর থেকে রুটিগুলো নিয়ে খাচ্ছে।

نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ

আপনি দয়া করা এ স্বপ্নের তা'বির আমাদেরকে বলে দিন।

اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

আমাদের ধারণায় আপনি উত্তম তা'বির দাতা। অথবা এর অর্থ হল আপনি অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, অথবা এর অর্থ হল আপনি বন্দীদের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন, তাদের প্রতি এহসান করেন, অতএব এ স্বপ্নের তা'বির জানিয়ে আমাদের প্রতিও এহসান করুন।

কারাগারে হযরত ইউসুফ (আঃ)

যাহ্যাক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কোন্ এহসানের কথা বলা হয়েছে? তিনি বলেছেন, কারাগারে যখন কোন বন্দী অসুস্থ হত তিনি তার খোঁজ-খবর নিতেন। তার দেখাশুনা করতেন। যদি কোন

বন্দীর স্থান সংকীর্ণ হত, তার জন্যে প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা করতেন। যদি কারো কোন জিনিসের প্রয়োজন হত, তবে তিনি সেই প্রয়োজনের আয়োজনে সচেষ্ট হতেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে কঠোর সাধনায় রত থাকতেন। আর রাত্রিকালে নামাযে দন্ডায়মান থাকতেন। আর এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন কারাগারে প্রবেশ করলেন তখন দেখলেন সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, চিন্তিত এবং অসহায়। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা, সবর অবলম্বন কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সওয়াব দান করবেন। বন্দীরা বললো, হে নওজোয়ান! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তোমার চেহারা কত সুন্দর, তোমার ব্যবহার কত মধুর এবং তোমার কথাগুলো কত মিষ্টি, তোমার সাথে অবস্থান কালে আমরা বরকত হাসিল করবো। তোমার নাম কি? তোমার পরিচয় কি? তিনি বললেন ঃ আমার নাম ইউসুফ, আমি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্র, তিনি হযরত এসহাক (আঃ)-এর পুত্র আর তিনি হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-এর পুত্র।

এ পরিচয় পাওয়ার পর কারাগারের কর্মকর্তা বললো, হে নওজোয়ান! যদি আমার সাধ্য থাকতো তবে আমি এখনই তোমাকে মুক্ত করে দিতাম (কিন্তু সে সাধ্য আমার নেই)। তবুও তোমার সঙ্গে সহাবস্থানের হক্ব আমি ভালভাবে আদায় করবো, তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবো, কারাগারের যে কক্ষ তুমি পছন্দ কর সেখানেই থাকতে পার।

বর্ণিত আছে, যে যুবকদ্বয় স্বপ্ন দেখেছিল তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বললো, আপনাকে যখন সর্ব প্রথম দেখেছি তখনই আমাদের অন্তরে আপনার জন্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি আমাকে ভালবেসনা, আমার প্রতি মহব্বত রেখোনা। যে কেউ আমার প্রতি মহব্বত রেখেছে তার কারণে আমি বিপদগ্রস্ত হয়েছি। আমার ফুফু আমার প্রতি মহব্বত রাখতেন, এর কারণে আমার প্রতি বিপদ এসেছে। আমার আব্বাজান আমাকে মহব্বত করতেন সে জন্যে আমাকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর আজিজের স্ত্রী আমার প্রতি মহব্বত রেখেছে, পরিণামে আজ আমাকে কারগারে আসতে হয়েছে।[১]

যাহোক, এরপর উভয় বন্দী তাঁর নিকট তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করলো।

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের উভয়কে তাদের স্বপ্নের তা'বির সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে বললেনঃ এ স্বপ্নের তা'বির করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। তোমরা নিশ্চিত থাক,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫০-৫১

এ ব্যাপারে বিলম্বও হবে না। এমনকি, তোমাদের দৈনিক বরাদ্দ খাবার তোমাদের নিকট পৌঁছার পূর্বেই আমি তোমাদের স্বপ্নের তা'বির বলে দেব।

তিনি একথাও বলেছেন যে, তোমাদের জন্যে নিদৃষ্ট খাবার আসার পূর্বেই কি কি খাবার আসবে এবং কি বর্ণের খাবার হবে এবং কতখানি খাবার হবে এবং কি কি প্রকারের খাবার আসবে এসব কথাও আমি তোমাদেরকে বলে দেব। তোমরা প্রশ্ন করতে পার যে, আমি কিভাবে এসব কথা বলবো?

আমি কি জ্যোতিষী? আমি কি গণক? না আমি এর কিছুই নই।

জ্ঞান আল্লাহ্ পাকের দান

এ জ্ঞান আমার নিজস্বও নয়; বরং আল্লাহ্ পাকের দান।

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ط

অর্থাৎ-তোমাদের স্বপ্নের তা'বির এবং খাবার সম্পর্কে এসব কথা বর্ণনা করা হলো সেই এলম যা আল্লাহ্ পাক আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দানে ধন্য হয়েই আমি এ এলম হাসিল করেছি। অর্থাৎ তোমাদেরকে যা আমি বলবো তা জ্যোতিষীর কাজ নয়, গণকেরও কাজ নয়; বরং এ হলো আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী ও এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আমাকে দান করেছেন। এর কারণ এই, আমি আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেছি, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছি।

اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ.

যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাতকে অবিশ্বাস করে, আমি তাদের মতবাদ পরিত্যাগ করেছি। তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

تَرَكْتُ

তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ "আমি কাফেরদের মতবাদ পরিত্যাগ করেছি"-এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ইতিপূর্বে শেরক করতেন (নাউজুবিল্লাহ) বরং এর অর্থ হলো শেরকের মতবাদ আমি কখনও গ্রহণ করিনি। যেহেতু হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের তদানন্তীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন, আর তারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না এবং আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস ছিলনা তাই হয়ত কেউ ভুল ধারণা করতে পারে যে, তিনিও এ ভ্রান্ত মতেরই অনুসারী। তাই এমন ভুল ধারণা নিরসন-কল্পেই হযরত ইউসুফ (আঃ) একথা বলেছেন। আর ইতিপূর্বে তিনি কোন দিনও তৌহিদ বা ঈমানের কথা বলেননি, তাই এ মুহূর্তে সর্ব প্রথম তিনি ঈমানের কথা ঘোষণা করলেন এবং তৌহিদের তবলিগ করেছেন।[১]

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩৭

ইতিপূর্বে তিনি একথাও বলেছেন যে, আমি স্বপ্নের যে তা'বির বর্ণনা করি তা আমার কোন গুণ নয়; বরং এটি এক আল্লাহ পাকেরই দান এবং তিনি এ এলম দান করেছেন বলেই আমি এ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবগত করতে পারি। এ পর্যায়ে তিনি আল্লাহ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানালেন।

এখানে এ প্রশ্নও হতে পারে যে, যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের তা'বির চেয়েছিল অথচ হযরত ইউসুফ (আঃ) তা'বিরের কথা না বলে অন্যান্য কথা বলেছেন– এর কারণ কি?

তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের একাধিক জবাব দিয়েছেনঃ যে ব্যক্তি এ স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে তার মাথায় রুটি বহন করছে এবং পাখীরা সেখান থেকে রুটি খাচ্ছে, তার শাস্তি হবে মৃত্যু। একথা তিনি উপলব্ধি করেছেন তাই তিনি স্বপ্নের এ তা'বির বর্ণনা করার পূর্বে তৌহিদের দিকে তাকে আহ্বান করছেন যাতে করে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয়ত, সে যুগে মিশরের বাদশার নিয়ম ছিল এই যে, কোন লোককে সে হত্যা করতে ইচ্ছা করলে তার নিকট বিষ মেশানো খাবার পাঠানো হতো এবং এভাবে লোকটির মৃত্যু হতো, তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) এ কথা বলেছেন যে, আজকের দিনের খাবার আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে, এ খাবারের মধ্যে বিষ মিশানো হয়েছে কিনা এবং অন্যান্য অবস্থাও বর্ণনা করবো। যেমন এই মোজেযা আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কেও দিয়েছিলেন।

যাহোক, এসব হলো গায়বী এলম যা শুধু নবুওয়্যতের মাধ্যমেই লাভ হয়। এসব কথা দ্বারা হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আল্লাহর সত্য নবী। আর নবীর সর্বপ্রথম এবং প্রধান কাজ হলো মানুষকে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের তা'বির বর্ণনা করার পূর্বে তাদেরকে তৌহিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে সমূহে আরো বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১]

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা-১৩৭

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ
لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾ يٰصَاحِبَيِ
السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ
اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ
اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদেরই অনুসরণ করি। আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। আমাদের প্রতি এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি এটি আল্লাহ পাকের দান, কিন্তু অনেকেই শোকর গুজার হয়না।

(৩৯) হে আমার কারা বন্ধুরা! তোমরাই বল, ভিন্ন ভিন্ন বহু উপাস্য ভাল না এক অদ্বিতীয় পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ?

(৪০) আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর তা তোমাদের এবং তোমাদের পিতামহদের রাখা কয়েকটি নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়, আল্লাহ পাক তার কোন দলিল প্রমাণ প্রেরণ করেননি। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী না কর। এটিই একমাত্র সরল সঠিক পথ কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি কারাগারের বন্দীদের আন্তরিক ভক্তি-অনুরক্তি লক্ষ্য করে তিনি তাদের প্রতিও দয়াদ্র হন এবং তাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ লাভের পূর্বশর্ত হল আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান। সমগ্র বিশ্বের সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি ঈমান না থাকে তবে অবশেষে সবকিছুই ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। কেননা, সম্পদ এবং শক্তি দ্বারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনেই উপকৃত হওয়া যায়। ঈমান ব্যতীত পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে কিছুই

পাওয়া যায় না। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) কাফের বন্দীদের স্বপ্নের তা'বির বর্ণনার পূর্বে তাদের বাস্তব কল্যাণের লক্ষ্যে তাদেরকে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। আর কথা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন যিনি কথা বলেন, তার গুরুত্ব উপলব্ধি না করলে কথার প্রতিও যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়না। কারাগারে বা মিশরে হযরত ইউসুফ (আঃ) তেমন পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তদানীন্তন পৃথিবীতে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। এজন্যেই হযরত ইউসুফ (আঃ) এ পর্যায়ে তাঁদের উল্লেখ করেছেন যে, আমার পূর্ব পুরুষ হলেন তাঁরা, আমি তাঁদের অনুসারী এবং আমি তাঁদেরই বংশধর। কারাগারের শ্রোতারা যেন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তাঁর কথা শ্রবণ করে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়, এজন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে একথা বলেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন স্থানে যদি কোন আলেম সম্পর্কে জনগণ অবগত না থাকে, তিনি দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে চান এমন অবস্থায় যদি নিজের গুণাবলীও কিছুটা বর্ণনা করেন তবে তা অবৈধ হবেনা, আর একথা আত্ম প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত হবেনা। কেননা, সমস্ত আমলের সাফল্য নির্ভর করে নিয়তের উপর। আত্মপ্রচারের নিয়ত নয়, নিয়ত বা উদ্দেশ্য যদি নিজের গুণাবলী বর্ণনা করে দ্বীনের প্রচার হয়, তবে তা অবৈধ হয়না। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

"আর তোমার প্রতিপালকের যে নেয়ামত তোমার প্রতি রয়েছে তার কথা জানিয়ে দাও"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাও লিখেছেন, এ কারণেই আউলিয়ায়ে কেরাম ক্ষেত্রবিশেষে আধ্যাত্মিক জগতে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন গওসুল আযম হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এবং হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) প্রমুখ তাদের অনেক রহস্য বর্ণনা করেছেন, তাঁদের এসব কথা আদৌ আত্ম-প্রশংসা বা আত্ম-প্রচারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ

(আমাদের জন্যে কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, আমরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করি) কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই হলো তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রচার এবং প্রসার। তৌহিদ হলো আমাদের স্বভাব, আল্লাহ পাক শেরক থেকে আমাদেরকে তথা আম্বিয়ায়ে কেরামকে রক্ষা করেছেন।

مَا كَانَ لَنَآ .....

"আমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা সম্ভব নয়"।

প্রশ্ন হলো আমাদের জন্যে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তফসীরকারগণ বলেছেন, আমাদের বলে আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র দলকে বোঝানো হয়েছে। অথবা এর দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যারা

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর রয়েছি, আমাদের পক্ষে আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা সম্ভবই নয়। কেননা শেরক হলো মানবতার অবমাননা, আর আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন হয় বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের জন্যে, মানবতার মান উন্নয়ন তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে, এ জন্যেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা যে প্রকৃত মানুষ, সে উপলব্ধি করে যে সে আল্লাহ পাকের সেরা সৃষ্টি, তাই তার পক্ষে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা সম্ভবই নয়।[১]

مِنْ شَيْءٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাথে কোন প্রকার শেরকই শোভনীয় নয়, তা তাঁর পবিত্র সত্ত্বার ব্যাপারেই হোক অথবা তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারেই হোক, কোন ভাবেই বা কোন ব্যাপারেই আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা সম্ভব নয়।[২]

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু শেরকের প্রকারভেদ রয়েছে, যারা মূর্তি পূজা করে তারা শেরক করে, আর যারা অগ্নি পূজা করে তারাও শেরক করে, আর কেউ নক্ষত্রপুঞ্জের পূজা করে, তারাও শেরক করে, তাই আলোচ্য বাক্যটি সংযোজনে আয়াতের অর্থ হলো, শেরক যে প্রকারেরই হোক না কেন, তা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, অকল্পনীয়। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হলো আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, কোন স্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত কোন রিয্ক দাতা নেই।[৩]

আল্লাহ পাকের প্রতি এই ঈমান হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দান, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا

অর্থাৎ-এটি হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।

وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ.

আর শুধু আমাদের উপরই নয়; বরং আমাদের উসিলায় সকল মানুষের প্রতি এটি আল্লাহ পাকের দান। তৌহিদের নেয়ামত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে কেরাম সরাসরি লাভ করেন। আর নবী রসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়ার ভাগ্যবান লোকেরা এ নেয়ামত লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া প্রতিটি মোমেনের কর্তব্য।[৪]

এক ব্যক্তি হযরত ফোজায়েল এবনে ইয়াজকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঈমানের নেয়ামত ছিন্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা আছে কি?

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯৩
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫২
[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩৮
[৪]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩৯

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আছে, যদি ঈমানের নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় না করা হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে যে, তৌহিদের প্রতি ঈমান এবং এলম নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, যা আমাদের প্রতি ও অন্যান্য লোকদের প্রতি রয়েছে।

আল্লাহ পাক পৃথিবীতে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এবং উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ রেখেছেন যা দেখে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঐ উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতের কোন কদর করে না এবং এর জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হয়না। হযরত ইউসুফ (আঃ) কিভাবে মানুষকে তৌহিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তার বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে–

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ.

হে কারাগারের সাথীরা! তোমরাই বল ভিন্ন ভিন্ন একাধিক উপাস্য ভাল? অথবা এক অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক? স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ অথবা পাথর দ্বারা তৈরী মূর্তি বা ফেরেশতাগণ, অথবা অন্য কোন সৃষ্টি, বহু সংখ্যক বানানো উপাস্য কি ঠিক? অথবা নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা উচিত, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, যাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) ঐ কাফেরদেরকে সম্বোধন করে একথা বলেছিলেন যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতো। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা যে বিভিন্ন দেব-দেবী বা সৃষ্টির পূজা কর তা কি ঠিক? নাকি যিনি সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি তাঁর বন্দেগী করা উচিত।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ.

তোমরাই ভেবে দেখ তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তারা কি উপাসনার উপযুক্ত? তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা এগুলোর কিছু নাম রেখে দিয়েছ যেগুলোর কোন জ্ঞান বুদ্ধি কিংবা বোধ শক্তি নেই, তারা তোমাদের কথা শ্রবণ করেনা, করতে পারেনা, তোমাদেরকে দেখেনা, দেখতে পারেনা তাদের কোন প্রকার ক্ষমতাই নেই এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন দলিলও আসে নাই, তোমরা তৌহিদের প্রমাণ স্বরূপ দলিল চাও অথচ শেরকের পক্ষে তোমাদের নিকট কি কোন দলিল রয়েছে?

মূলতঃ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা পথভ্রষ্টতার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছ।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডলের প্রতি লক্ষ্য কর, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ তারা, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, স্বাস্থ্য ও রোগ, জীবন ও মৃত্যু প্রভৃতি এর মধ্যে কোথাও কি তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীর হুকুম চলে? না, কোথাও চলেনা, তোমরাই সেগুলোকে তৈরী কর, আর তোমরাই সেগুলোর নামকরণ কর। অথচ হুকুম চলে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের, যিনি এক, অদ্বিতীয়।

اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা। কেননা এতে মানবতার অবমাননা হয়, মানুষকে আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় মানুষ কি করে অন্য সৃষ্টির সম্মুখে মাথানত করতে পারে?

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

এটিই একমাত্র সরল সঠিক পথ। কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত সরল সঠিক পন্থা এটিই। কিন্তু অধিকাংশ লোক হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করেনা, মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার ঘন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই তারা তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস করেনা।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا
فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ
مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ
لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ
الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾
وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰٓاَيُّهَا
الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪১) হে কারাগারের সাথীরা! তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন তার মনিবকে সূরা পান করাবে, আর দ্বিতীয় জনের ফাঁসি হবে, আর পাখীরা তার মাথা থেকে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

(৪২) আর যে লোকটি মুক্তি পাবে বলে ইউসুফ মনে করেন, তাকে বলে দেন তোমার মনিবের নিকট আমার কথা স্মরণ কর কিন্তু শয়তান তার মনিবের নিকট ইউসুফের উল্লেখ করতে তাকে ভুলিয়ে দেয়। ফলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে পড়ে থাকেন।

(৪৩) আর রাজা বললো নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী, যাদেরকে সাতটি জীর্ণ-শীর্ণ গাভি ভক্ষণ করছে। আরো দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্যান্যগুলো শুস্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জান তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান ছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কারাগারের সাথীরা তাঁর নিকট তাদের স্বপ্নের তা'বির জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি দেখলেন, তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে তাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাই তিনি সর্বপ্রথম তাদেরকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন। পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদের বিবরণ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কারাগারের সাথীদের স্বপ্নের তা'বিরের বর্ণনা রয়েছে।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا

"হে আমার কারাগারের সাথীরা! তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন তার মনিবকে সূরা পান করাবে, আর অন্যজনের ফাঁসি হবে এবং পাখীরা তার মাথা থেকে খাবে"।

লক্ষ্যণীয়, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা-সাথীদের স্বপ্নের তা'বির বর্ণনা করছেন, কিন্তু কাউকে নিদৃষ্ট করে বলছেন না যে তোমার স্বপ্নের এই তা'বির, বরং এভাবে বলছেন যে, তোমাদের একজনের স্বপ্নের তা'বির এই এবং অন্য জনের স্বপ্নের তা'বির এই। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এর কারণ বর্ণনা করেছেন এভাবে, যে ব্যক্তির মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তাকে সরাসরি একথা জানালে সে অত্যন্ত ব্যথিত হবে, মৃত্যুর পূর্বেই যেন তার মৃত্যু হয়ে যাবে, এজন্যে স্বপ্নের তা'বির বর্ণনায় এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।[১]

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৫৯

স্বপ্নের তা'বির

তোমাদের মধ্যে একজন তার মনিবকে সূরা পান করাবে অর্থাৎ সে মুক্তি লাভ করবে এবং তার পূর্ব পদে বহাল হবে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ পাচক সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। ফাঁসির মাধ্যমে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবে। এরপর পাখীরা তার মাথার গোশ্ত মগজ খাবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন তারা উভয়ে তা'বির শ্রবণ করলো, তখন তারা বললো, না আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি আমরা শুধু একটু আলাপ করলাম।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.

তোমরা স্বপ্ন দেখ বা না দেখ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমাদের সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। অদৃষ্টের লিখন কে করবে খন্ডনঃ অবশেষে তাই হয়েছিল। যে রাজার "সাকী" ছিল সে মুক্তি পেয়েছে আর যে পাচক ছিল তার ফাঁসি হয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যতক্ষণ স্বপ্নের তা'বির না করা হয় ততক্ষণ তা ঝুলন্ত থাকে কিন্তু যখন তাবির বর্ণনা করা হয় তখন তা প্রকাশিত হয়।

ইমাম রাজী (রঃ) এ স্বপ্নের তা'বির সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিত লিখেছেনঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে বলেছেন, তুমি যে সুন্দর আঙ্গুর দেখেছ তার তাৎপর্য হলো তোমার অবস্থা ভাল হবে, আর তুমি যে আঙ্গুর বৃক্ষের তিনটি শাখা দেখেছ তার তাৎপর্য হলো আর মাত্র তিন দিন পরই রাজা তোমার ব্যাপারে মনোনিবেশ করবেন এবং তোমাকে মুক্তি দেবেন, তোমার পূর্ব পদে তোমাকে বহাল করবেন। ইতিপূর্বে তোমার যে অবস্থা ছিল তুমি তার চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকবে, আর তিনি পাচককে বলেছিলেন, তুমি তিনটি জিন্জির দেখেছিলে অর্থাৎ আর তিনদিন পরে তোমার বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হবে এবং তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে আর পাখীরা তোমার মাথার গোশ্ত খাবে।[২]

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ.

উভয় কারাবন্দীর মধ্যে যার সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন যে, সে মুক্তি পাবে, কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় তিনি তাকে একটা কথা বলেছিলেন যে, তুমি যখন তোমার মনিবের নিকট যাবে তখন তাকে আমার কথা বল যে, একজন নির্দোষ মানুষ অযথা কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থেই তাঁর মুক্তি লাভ একান্ত জরুরী। রাজ দরবারের সাকী রাজাকে একথা বলার অঙ্গীকার করলো, অবশেষে সে

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১২, পৃষ্ঠা-৬০

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৪২-৪৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৪

ব্যক্তি তার পদে বহাল হলো। কিন্তু তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা তার মনিবের কাছে আর বলা হলো না।

فَأَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ.

পরিণামে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আরো কয়েক বছর কারাগারে পড়ে থাকতে হলো। তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এভাবে রাজার নিকট সুপারিশ করার কথা বলা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পছন্দনীয় হয়নি, এজন্যে আল্লাহ পাক উক্ত ব্যক্তির উপর শয়তানকে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়েছেন এবং শয়তান তাকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে, তার পরিণতি স্বরূপ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আরো কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়েছে।

মূলতঃ কোন মানুষের বিপদ মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সাহায্য গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ না হলেও নবীর শানের খেলাফ। নবীর কাজ হলো সর্বদা সব কিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উপর অর্পণ করা। শুধু তাঁর প্রতিই ভরসা করা, আর শুধু তাঁর প্রতিই আশা করা। যুবকদ্বয়ের বিচারের পরও হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আরো সাত বছর কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন মানুষের সাহায্যের কথা বলার কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দ্বারা কোন গুনাহ হয়নি। তবে তাঁর জন্য উত্তম ছিল সবরের মকামে থাকা, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখা।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি ইউসুফ (আঃ) উপরোল্লিখিত কথাটি না বলতেন তবে তিনি এত সুদীর্ঘ সময় কারাগারে থাকতেন না।

হযরত ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আইউব (আঃ) সাত বছর যাবত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রথমে সাত বছর, এরপর আরো পাঁচ বছর মোট ১২ বছর কারাগারে ছিলেন। এটি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত। আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তিনি কারাগারে ১৪ বছর ছিলেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بِضْعَ শব্দটির তাৎপর্য হলো, তিন থেকে নয় বছর আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তিন থেকে সাত বছর। কালবী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) কারাগারে পাঁচ বছর ছিলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) মালেক এবনে দিনারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার সাকীকে বলেছিলেন "তোমার মনিবের নিকট আমার কথা বলবে" তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বলা হয়, ইউসুফ তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করেছ, এখন আমি তোমার বন্দী

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

জীবনকে আরো দীর্ঘ করবো। হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্রন্দণরত অবস্থায় আরজ করলেনঃ হে আমার পরওয়ারদেগার! অধিক বিপদাপদের কারণে আমার দ্বারা এ ভুল হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে এমন কথা আর বলবো না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কারাগারে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট হযরত জীব্রাইল (আঃ) আসেন। জীব্রাইল (আঃ) তাঁকে বলেছেনঃ হে পবিত্র পিতার পবিত্র পুত্র! আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেনঃ তোমার লজ্জা হয়নি যে তুমি মানুষকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছ, আমার ইজ্জতের শপথ! তোমাকে আরো কয়েক বছর কারাগারে রাখবো। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, এ অবস্থায় কি আমার প্রতি আল্লাহ পাক রাজী হবেন?

হযরত জীব্রাইল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আল্লাহ পাক যদি রাজী হন তবে কারাগারে অবস্থানের ব্যাপারে আমি চিন্তা করিনা।

কা'ব বর্ণনা করেন, হযরত জীব্রাইল (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বলেছিলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক। জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন) তোমাকে তোমার পিতার এত আদরের কে বানিয়েছিল?

ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক। জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ তোমাকে অন্ধকার কূপের কষ্ট থেকে কে নাজাত দান করেছেন?

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক। জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ তোমাকে স্বপ্নের তা'বির কে শিক্ষা দিয়েছিলেন?

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক। জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ ছোট বড় গুনাহগুলোকে কে তোমার থেকে সরিয়ে দিয়েছেন?

ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক। জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ এতদসত্ত্বেও তুমি তোমার ন্যায় একজন মানুষকে সুপারিশ করার জন্যে কেন বললে?[১]

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে বন্দীকে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে বলেছিলেন সে মুক্তি লাভের পর তার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এভাবে বহুদিন অতিবাহিত হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আরো কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা ভুলে যাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে শয়তানী কাজ বলা হয়েছে। শয়তান তাকে এ ভাল কাজটি ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, এ ভুলে যাওয়ার মধ্যেও আল্লাহ পাকের বিরাট হেকমত রয়েছে। আল্লাহ পাকের কুদরত, হেকমত, তাঁর লীলা বুঝবার ক্ষমতা কারোই নেই। কেননা হযরত ইউসুফ (আঃ) যে অসাধারণ সম্মান এবং উচ্চ মর্তবা নিয়ে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি চির স্মরণীয়, তিনি রাজার স্বপ্নের তা'বির বর্ণনা করতে আহুত হয়েছিলেন, তার পারিষদবর্গ তার ব্যাখ্যা করতে

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৬-৫৭

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় জীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সরাসরি রাজ দরবারে এসেছেন এবং শুধু রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যাই নয়; বরং দেশ ও জাতির সমস্যার সমাধানও তিনি দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে শুধু যে উচ্চ মর্তবা এবং সম্মান দিয়েছেন তাই নয়, বরং মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তাঁকে দান করেছেন। এটি ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত। বলাবাহুল্য, হযরত ইউসুফ (আঃ) যাকে সুপারিশ করার জন্যে বলেছিলেন যদি সে সুপারিশ করতো এবং রাজা তার সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দিত তবে এমন উচ্চ মর্তবা লাভের কোন সম্ভাবনা ছিলনা। রাজা তাঁকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না এমনকি, জনগণের মনেও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হতো না। আর নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব পালনের পথও সুগম হতো না।

মূলতঃ আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়। যাঁকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে চিরতরে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, যাঁকে তারা মাত্র কয়েকটি দিনারের বিনিময়ে পথিক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিল, যাঁকে মিশরের বাজারে গোলাম হিসাবে বিক্রয় করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন। তাঁকে নবুওয়্যত দান করেছেন এবং মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রথমে মিশরের কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন, এরপর মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে আহুত হয়েছেন। এর কারণও ছিল একটি স্বপ্ন, যার তা'বিরের এল্‌ম আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন। আর এ এলমই ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কারাগার থেকে মুক্তি লাভের এবং রাজ দরবারে সম্বর্ধিত হওয়ার মূল উপকরণ।

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজ দরবারে আহুত

বর্ণিত আছে যে, কারাগারে আরো সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর একটি ঘটনা ঘটলো। মিশরের তদানীন্তন রাজা রাইয়ান এবনে ওলীদ একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখলো। রাজা নিজেই বর্ণনা করলো, আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসলো। তাদের পেছনে আরো সাতটি গাভী সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসলো, এগুলো ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং জীর্ণ-শীর্ণ। আর দুর্বল গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেললো।হৃষ্ট-পুষ্ট গাভীগুলো দুর্বল গাভী গুলোর উদরস্থ হলো।

রাজা আরো বললেন, আমি সাতটি সবুজ সতেজ শস্য শীষ দেখলাম। এরপর অন্য আরো সাতটি শুস্ক শীষ দেখলাম। শুস্ক শীষগুলো কেটে ফেলার যোগ্য হয়েছে। শুস্ক শীষগুলো সবুজ শীষগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের সজীবতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। রাজা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্যে তার পারিষদ বর্গকে আহ্বান জানায় এবং বলেঃ যদি তোমরা জান তবে এর ব্যাখ্যা কর।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, শুধু রাজার পারিষদবর্গই নয়; বরং দেশের সকল গণক, যাদুকর, বুদ্ধিজীবী মহল এবং জ্ঞানী-গুণী পন্ডিতবর্গকে একত্রিত করে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু তারা সকলেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

রাজা বলে আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী তাদেরকে সাতটি দুর্বল গাভী গ্রাস করছে। আরো দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্যান্য গুলো শুস্ক। হে পারিষদবর্গ! যদি তোমরা এ স্বপ্নের তা'বির জান তবে ব্যাখ্যা কর।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা করেন তখন তিনি এর এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা মানুষের জন্যে হয় কল্যাণাতীত।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে যখন কারাগার থেকে নাজাত দেয়া মঞ্জুর হলো তখন মিশরের তদানীন্তন রাজা রাইয়ান এবনে ওলীদকে আল্লাহ পাক উল্লিখিত স্বপ্ন দেখান।

রাজা এমন বিস্ময়কর স্বপ্নই দেখলেন যার তা'বির বা ব্যাখ্যা দেয়া তার দরবারের কারো পক্ষেই সম্ভব হলোনা। কেউ এর তাৎপর্য বুঝতেই পারল না এমনি এক কঠিন সংকটময় মুহূর্তে রাজার সূরা পরিবেশেক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হলো।

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ
سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ ع

তরজমা

(৪৪) তারা বলল এ হলো কাল্পনিক স্বপ্ন। আর আমরা এরূপ স্বপ্নের তা'বির সম্পর্কে অভিজ্ঞ নই।

(৪৫) উভয় কারাবন্দীর মধ্যে যে লোকটি মুক্তি পেয়েছিল এবং অনেক দিন পর তার মনে পড়ে, সে বলে, আমি তোমাদেরকে এর তা'বির বলে দেব, অতএব তোমরা আমাকে প্রেরণ কর।

(৪৬) সে বললো হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও, সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী তাদেরকে সাতটি জীর্ণ-শীর্ণ গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্যগুলো শুস্ক। তুমি আমাকে এর ব্যাখ্যা দাও যেন আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং তারা অবগত হতে পারে।

(৪৭) ইউসুফ বললেন, তোমরা অনবরত সাত বছর যাবত উত্তমভাবে চাষ করবে, এরপর তোমরা যে শষ্য সংগ্রহ করবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে, তা ছাড়া অবশিষ্ট সব শীষসহ রেখে দেবে।

(৪৮) এরপর সাতটি বছর আসবে অত্যন্ত কঠিন, এ সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে, শুধু সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা বাদ দিয়ে।

(৪৯) এরপর আসবে আরেকটি বছর, সে বছর মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, আর সে বছর মানুষ অনেক ফলের রস নিংড়াবে।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই বিস্ময়কর, কল্পনাতীত। তিনি বহুদিন ধরে কারাগারে রয়েছেন। রাজার নিকট সুপারিশ করার জন্যে যাকে বলেছিলেন, সে তাঁর কথা ভুলে যায়। এরপর রাজা একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখে। রাজা স্বপ্নের বিবরণ তার পারিষদবর্গকে জানিয়ে দেয়। এমনকি স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যে দেশের গুণীজনকেও একত্রিত করা হলো।

কিন্তু রাজার পারিষদবর্গ বা অন্য কেউ স্বপ্নের কোন কথাই বুঝতে পারেনি। তারা কিছু জানেনা, একথা বলতেও তারা লজ্জাবোধ করে।

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ.

তাই তারা বলে এসব হলো বাজে স্বপ্ন। এসব স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা বা কোন তাৎপর্য নেই। তা'বির হয় সত্য স্বপ্নের। আর আমরা এমন স্বপ্নের তা'বির সম্পর্কে অবগতও নই। কাতাদা (রাঃ) লিখেছেন, রাজা যখন তার পারিষদবর্গের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করলো তখন তারা বললো, এসব হলো বাজে কথা, এর কোন অর্থই হয়না। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ

اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ

অর্থ হলো মিথ্যা স্বপ্ন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো মিথ্যা স্বপ্ন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো মিথ্যা স্বপ্ন। আর আমাদের নিকট এসব স্বপ্নের কোন তা'বির নেই।

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا.

বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, অনেক দিন পরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা তার মনে পড়লো। সে বললো আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, আমাকে তোমরা কারাগারে প্রেরণ কর।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, রাজার সূরা পরিবেশক রাজাকে বললো; কারাগারে এক ব্যক্তি আছেন যিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন। আমাকে তাঁর নিকট গমনের অনুমতি দান করুন। রাজা তাকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কারাগার শহরের ভেতর ছিলনা। সূরা পরিবেশক অবশেষে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলো এবং বললোঃ

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ.

হে ইউসুফ! হে সত্যের প্রতিমূর্তি! হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে একথা বলে সম্বোধন করার কারণ হলো, সে স্বপ্নের তা'বিরের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পারদর্শিতা দেখেছিল এবং তাঁর সততা এবং সত্যবাদীতা সম্পর্কেও সে অবগত হয়েছিল। সে বললোঃ

اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ

আমাকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে বলুন, সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী, তাদেরকে গ্রাস করছে সাতটি দুর্বল গাভী, এমনিভাবে সাতটি সবুজ শীষ, অন্যগুলো শুস্ক। এ স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা আমাকে দান করুন যা নিয়ে আমি মানুষের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং তারা যেন এ ব্যাখ্যা বুঝতে পারে। لَعَلَّ শব্দটির অর্থ হল হয়তো, যখন কোন বিষয় নিশ্চিত না থাকে তখন এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর যেহেতু বিষয়টি ছিল একটি স্বপ্ন সম্পর্কীয় এবং এমন স্বপ্ন যার ব্যাখ্যা দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। রাজার পরামর্শদাতারা এবং সকল গুণী-জ্ঞানী লোকেরা সকলেই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এর সত্যিকার তাৎপর্য সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারেনি, তাই বলা হয়েছে হয়তো আমি লোকদের নিকট এর সঠিক তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে যাব এবং হয়তো আপনার নিকট থেকে এমন ব্যাখ্যা নিয়ে যাব যার মাধ্যমে তারা এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। لعلهم يعلمون এর অর্থ হল আপনি স্বপ্নের যে তা'বির বর্ণনা করবেন তার কারণে হয়তো লোকেরা আপনার ব্যক্তিত্ব, উচ্চ মর্তবা এবং গুণ-জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হবে। এ ক্ষেত্রেও لعل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এজন্যে যে, স্বপ্নের তা'বির জানতে পারলে হয়তো

[১]। তফসীরে তাবারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৩৪

তারা আপনার উচ্চ মর্যাদাকে স্বীকার করে নেবে, কিন্তু একথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না, কেননা ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদারতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকা সত্ত্বেও আজীজ তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেছে।[১]

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার স্বপ্নের তা'বির বলে দিলেন। উল্লেখ্য, যে ব্যক্তিকে তিনি বলেছেন রাজার নিকট আমার কথা মনে করবে সে ব্যক্তি তাঁর কথা ভুলে যায়, তাকে তিনি এতদিন পর হাযির হওয়ার কারণে কোনরূপ অনুযোগ করলেন না; বরং অনতিবিলম্বে তিনি তাকে স্বপ্নের তা'বির বলে দিলেন। শুধু তাই নয়; তার কোন অনুরোধ ব্যতীতই দুর্ভিক্ষের সমস্যার সমাধানও বলে দিলেন। এমনকি এরপর যে সুদিন আসবে সে সুসংবাদও দিয়ে দিলেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যেহেতু তিনি নবী ছিলেন অথবা কিছু দিন পর নবুওয়্যত লাভ করবেন, তাই তাঁর পক্ষে এমনি উচ্চতর নৈতিক মানের পরিচয় দেয়া সম্ভব হলো।

স্বপ্নের তা'বির

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا

স্বপ্নের তা'বির হলো এই, সাত বছর অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো তোমরা উত্তমভাবে জমি চাষ কর, কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাও, জমির সামান্য অংশও বেকার ফেলে রেখোনা।

فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ

কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে ফসল তোমরা পাবে তা যত্ন সহকারে রেখে দেবে। আর তা শীষেই রেখে দেবে। তোমাদের খাদ্যের জন্যে নিতান্ত যা প্রয়োজন তা অতি হিসেব করে খরচ করবে।

মূলতঃ রাজা যে সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী দেখেছে তা হলো প্রথম সাত বছর যখন তোমরা ফসল পাবে, আর জীর্ণ-শীর্ণ যে সাতটি গাভী তিনি দেখেছেন তা হলো এর পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছর। প্রথম সাত বছর তোমরা যে খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখবে তা পরবর্তী সাত বছরে শেষ হয়ে যাবে। শুধু পরবর্তী মওসুমে বীজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে। তাই যদি তোমরা পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন না কর তবে চরম বিপদের সম্মুখীন হবে। এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ.

অর্থাৎ-এরপর অত্যন্ত কঠিন সাতটি বছর আসবে, তোমাদের বীজের জন্যে অল্প স্বল্প যা তোমরা সঞ্চয় করে রাখতে পারবে, এছাড়া আর সবই তোমরা খেয়ে ফেলবে। অবশ্য এ পর্যায়ে তোমাদেরকে একটি সুসংবাদ দিয়ে রাখি যে, এ দুর্ভিক্ষের অবস্থা অব্যাহত থাকবে না; বরং সাত বছর পর পুনরায় তোমরা সুদিন দেখবে। এরশাদ হয়েছেঃ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৯

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

অর্থাৎ-এই সাত বছর পর আবার একটি বছর আসবে, তখন বৃষ্টিপাত হবে এবং অনেক ফল, ফসল উৎপন্ন হবে। পুনরায় ফলের রস তোমরা বের করবে।

غيث يغاث থেকে নিস্পন্ন, এর অর্থ হলো বৃষ্টি। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।[১]

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, غيث সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যে বৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় হয়।

অথবা يغاث শব্দটি غوث থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ হলো কারো ফরিয়াদ গ্রহণ করা অর্থাৎ সাত বছরের দুর্ভিক্ষের পর মানুষ যখন রিয্‌কের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারের ফরিয়াদ করবে, কান্নাকাটা করবে, আল্লাহ পাক ঐ ফরিয়াদ শ্রবণ করে তাদের প্রতি দয়া করবেন।

وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

আর লোকেরা ঐ বছর ফলের রস বের করবে অর্থাৎ অনেক ফল ফলবে, আঙ্গুর ফলের রস বের করবে, জয়তুনের তেল বের করবে অর্থাৎ ফলে-ফুলে, শষ্য-শ্যামলিমায় তখন দেশ পরিপূর্ণ হবে।

এখানে উল্লেখ্য, রাজা সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট এবং আরো সাতটি দুর্বল গাভী স্বপ্নে দেখেছে। প্রথম সাতটি গাভী দ্বারা সেই সাত বছরকে বোঝানো হয়েছে যখন দেশে ফল ও ফসল পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হবে। আর দুর্বল গাভী দ্বারা অভাবের সাত বছর বোঝানো হযেছে। প্রশ্নকারী এ ১৪ বছরের সম্পর্কেই জানতে চেয়েছিল, কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) পরবর্তী বছরের সু-সংবাদও দিয়েছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মহান আদর্শ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মহান আদর্শ চির স্মরণীয়, চির অনুকরণীয়।

১. তিনি স্বপ্নের তা'বির বর্ণনা করতে এতটুকু বিলম্ব করেননি।

২. এ ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করেননি যে, সর্বপ্রথম আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত কর, এরপর আমি জবাব দেব, এমন কোন কথাও তিনি বলেননি।

৩. কেন এতদিন তাঁর কারাসঙ্গী তাঁকে ভুলে ছিল একথা বলেও তিনি তাকে লজ্জা দেননি।

৪. আল্লাহর হুকুমে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী থাকার অপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত আরাম-আয়াশের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি।

৫. যারা তাঁকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে প্রায় এক যুগ কারারুদ্ধ করে রেখেছে, তারা যখন বিপদগ্রস্ত হয়ে তাঁর নিকট হাযির হয়েছে এমন সময় তাঁর মুখে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-অনুযোগ নেই; বরং রয়েছে সহমর্মিতা, জনকল্যাণের চিন্তা, দুঃখী মানুষের দুঃখ

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯৫

নিবারনের বাস্তব প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা। তাই তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় যা একান্ত করণীয় তার পথ-নির্দেশ করেছেন।

৬. দুর্ভিক্ষের সাত বছর অতিবাহিত হলে অষ্টম বছরে তারা পুনরায় সুদিনের মুখ দেখবে, আবার তাদের মাঠ শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হবে, এ সুসংবাদ তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

৭. তিনি জনকল্যাণের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন কিন্তু নিজের ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি।

৮. অহেতুক কথা থেকে কিভাবে বিরত রয়েছেন তা-ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা, যখন তাঁর নিকট স্বপ্নের তা'বির জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেননি যে, স্বপ্নটি কে দেখেছে? আর তোমাকে কে প্রেরণ করেছে? হযরত ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের পর সুদিনের যে সুসংবাদ দিয়েছেন তা হয়ত ওহীর মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন।

বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ মিশরের রাজার স্বপ্নের তা'বির করতে গিয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ) যে দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়েছেন তা ছিল বিশ্বব্যাপী। তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঠিক সেভাবেই সারা বিশ্বের উপর নেমে এসেছিল তখন দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। এটি ছিল দুনিয়ার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুর্ভিক্ষ।

এটি শুধু মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিলনা; বরং তদানীন্তন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তওরাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।[১]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي
بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ
النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ
لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ
الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ
أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯৫
আল-জামাল ওয়াল কামাল, পৃষ্ঠা-১৫৩

তরজমা

(৫০) রাজা বললো তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। যখন দূত তাঁর নিকট উপস্থিত হয় তখন তিনি বলেন, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর যে সব নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের সঠিক অবস্থা কি? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৫১) রাজা নারীদেরকে বললেন, তোমরা যখন ইউসুফ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বলে আল্লাহ পাকের মহিমা, আমরা ইউসুফের সামান্যতম কলংক সম্পর্কেও জানিনা। আজিজের স্ত্রী তখন বলে এক্ষণে সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো, আমিই তাঁর থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলাম, আর নিশ্চয় তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৫২) ইউসুফ বলেন, আমাকে এজন্যে এ পন্থা অবলম্বন করতে হলো যেন আজিজ জানতে পারে যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে সফল করেন না।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের যে তা'বির বর্ণনা করেছিলেন তা শ্রবণ করে মিশরের রাজা আশ্চর্যন্বিত হলো এবং তার দূতের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রশংসা এবং গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর প্রতি তার অন্তরে ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হলো। বিশেষতঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না এবং এর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জন্যে তাঁর যে সহমর্মিতার প্রমাণ সে পেয়েছে এবং আসন্ন বিপদ মুক্তির যে ফলপ্রসূ কর্মসূচী তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর বিচার বুদ্ধির যে পরিচয় সে পেয়েছে, তার কারণে মিশরের রাজা রাইয়ান এবনে ওয়ালীদ তাঁর দর্শন লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো এজন্যে যে, এমন একজন মহাপুরুষ তার কারাগারে পড়ে আছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে দূত প্রেরণ করলো যে, তাঁকে দরবারে নিয়ে আস। আমরা তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করবো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

"রাজা বললো, "তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আস"।

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ

"যখন রাজার দূত তাঁর নিকট হাযির হলো তিনি বললেন, "তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও। তাকে জিজ্ঞাসা কর যে, যে সব নারীরা তাদের হাত কেটেছিল তাদের সঠিক অবস্থা কি"?

বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজার দূতের সঙ্গে রাজ দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা তিনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদা। তিনি সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। রাজার ডাক পেয়েই তিনি রাজার দরবারে কেন যাবেন? বিশেষতঃ যে অপবাদের কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হলো তার আসল তথ্য প্রকাশ না করে তিনি কারাগার থেকে বের হওয়া পছন্দ করলেন না। তিনি রাজ দূতকে বললেনঃ তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল আমার প্রতি যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক। সত্য প্রকাশিত হোক, প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হোক, তখনই আমি এখান থেকে বের হবো, তার আগে নয়। অনুসন্ধান করা হোক কেন নারীরা হাত কেটেছিল? প্রকৃত ঘটনা কি? কে এর জন্য দোষী, আমার উপর যে অপবাদ দেয়া হয়েছে তা যে পর্যন্ত খন্ডন না করা হয় এবং আমার পবিত্রতার কথা যে পর্যন্ত ঘোষণা না করা হয় সে পর্যন্ত আমি কারাগার থেকে বের হতে পারি না।

অতএব, তুমি রাজার নিকট ফিরে যাও এবং মূল রহস্য উদঘাটন কর। আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এই দৃঢ়তার প্রশংসা করে এরশাদ করেছেনঃ আমার ভাই ইউসুফের ধৈর্য, সহনশীলতা এবং উদারতা দেখে আমি বিস্ময় বোধ করি। যদি আমি এতদিন কারাগারে থাকতাম আর আমার মুক্তি লাভের আহ্বান আসতো তবে অবিলম্বে সে আহ্বানে আমি সাড়া দিতাম।

إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

(নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত) অর্থাৎ আমার নির্দোষ এবং নিঃস্পাপ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক সবই জানেন, আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। কিন্তু আমি চাই যে আমার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে জনগণও অবগত হোক এবং সকল অপবাদের অবসান ঘটুক এবং আমার নিঃস্পাপতার কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হোক। কেননা তিনি অপবাদের ব্যাপারটি সিদ্ধান্ত বিহীন অবস্থায় রাখা পছন্দ করেননি। তিনি চেয়েছেন তাঁর পবিত্রতা এবং নিঃস্পাতা যেন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মধ্যে ক্ষমা ও ঔদার্য এবং লজ্জা এত বেশী ছিল যে, তিনি নির্দোষ অবস্থায় ১২ বছর কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও জোলায়খার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তিনি শুধু চেয়েছেন সত্য প্রকাশিত হোক, অসত্যের অবগুণ্ঠন খুলে ফেলা হোক। কেননা নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব পালনে এ ঘটনার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

মহিলাদের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত

অবশেষে মিশরের রাজা রাইয়ান এবনে ওয়ালিদ মহিলাদের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করলেন। কেননা হযরত ইউসুফ (আঃ) এ আত্মপ্রত্যয় ঘোষনা করেছেন যে, আসল

রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং তাঁর নির্দোষীতা ঘোষণা করার পূর্বে তিনি কারাগার থেকে বের হবেন না। তাই রাজা এ সম্পর্কে নিজেই তদন্ত পরিচালনা করেন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ

রাজা মেয়েদেরকে বললেন, তোমরা যে ইউসুফ থেকে অপকর্ম কামনা করেছিলে তখনকার সঠিক খবর কি? যদিও এ ব্যাপারে একমাত্র জোলায়খাই দোষী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে অন্য মহিলারাও জোলায়খার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে, তাই রাজা ঐ মহিলাদেরকেও তার দরবারে হাযির করেছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

هَلْ وَجَدْتُّنَّ فِيْهِ مَيْلًا.

তোমরা কি ইউসুফকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট দেখতে পেয়েছিলে? তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ রাজা সমবেত মহিলাদেরকে এভাবে প্রশ্ন করেছেন যেন তিনি এ সম্পর্কে সবকিছু অবগত। তাই তারা যেন কোন প্রকার অসত্য বলতে সাহস না করে। মহিলারা অকপটে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দোষীতা এবং নিস্কলংকতার সাক্ষ্য দিয়ে কথা বললোঃ আল্লাহর মহিমা, আশ্চর্য! আল্লাহ্ পাক ইউসুফকে কত পবিত্র, কত নিঃস্পাপ নিস্কলংক করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর সম্পর্কে সামান্যতম দোষও লক্ষ্য করিনি। তাঁর কোন প্রকার কলংক সম্পর্কে আমরা জানিনা।

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ

যখন মহিলারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে তথা জোলায়খার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল তখন জোলায়খা নিজেও অপরাধ স্বীকার করলো।

অপরাধ স্বীকার

অবশেষে জোলায়খা নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করে বললো–

قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

"আজিজের স্ত্রী বললো, সত্য কথা এখনই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমিই তাঁকে তাঁর সংযম ত্যাগে প্ররোচনা দিয়েছিলাম। নিশ্চয় তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত"।

এভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অসাধারণ চরিত্র মহিমা এবং নিস্কলংক ও নিঃস্পাপ হওয়ার কথা ঘোষিত হলো। যখন মহিলারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিল এবং স্বয়ং জোলায়খাও রাজ দরবারে তার অপরাধ স্বীকার করে বললো, আমি তাঁকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তিনি সত্য, তিনি পবিত্র, তিনি নিঃস্পাপ, নিস্কলংক।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এরপর বললেনঃ আমি যে এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছি এর কারণ এই নয় যে, আমি তাদের শাস্তি বিধানে ইচ্ছুক, বরং এ ব্যাপারে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যেন একথা সুস্পষ্টভাবে সকলে জানতে পারে যে,

পয়গম্বরের চরিত্র সর্বদা সর্ব প্রকার কলংকের উর্ধ্বে থাকে। তাঁদের সততা সাধুতা চিরদিনই সন্দেহাতীত।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ.

বিশেষত আমার এ কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো এ সত্য আজিজকে জানিয়ে দেয়া যে, আমি গোপনেও তার সঙ্গে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ.

আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো ধোকাবাজী, ছলনা, প্রতারণা চলতে দেননা। যে যত চক্রান্তই করুক, আর তা গোপন রাখার যত চেষ্টাই করুক কিন্তু অবশেষে তা প্রকাশ পায়, কোন দিন গোপন থাকে না। ধোকাবাজদেরকে আল্লাহ পাক অপদস্ত করেন, কখনও সফলকাম করেন না, যেমন এ ঘটনায় এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, সত্যের জয় সব সময়ই হয় এবং অসত্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

এমনিভাবে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, শুভ পরিণতি শুধু তাদেরই হয়, যারা আল্লাহ পাকের অনুগত থাকে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে, তাদের পরিণাম হয় শোচনীয়।[১]

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ! অদ্য ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ইং মোতাবেক ২৮শে সফর ১৪১২ হিঃ রোজ রোববার রাত ১১.৪৫ মিঃ তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বাদশ খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এ সাধনা এবং এই মহান তফসীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। তোমার তৌফিক ব্যতীত কোন সৎ কাজই সম্ভব হয়না। হে আল্লাহ! কবুল কর, আমীন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৬১
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬২-৬৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮

লেখক পরিচিতি

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ) ১৯৩২ সালে কুমিল্লা জেলার বরুরা উপজিলাস্থ বাঘমারা মিয়া বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ মওলবী মোহম্মদ আলী মিয়া সাহেব একজন সুফী সাধক, অত্যন্ত বড় আবেদ, পরহেযগার, দানশীল ও সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদ্রাসায়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি ৫ম স্থান অধিকার করেন। সরকারী বৃত্তি পেয়ে পরবর্তী দু'বছর তিনি হাদীস শাস্ত্রে গবেষণা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি দেশ-বিদেশে ইসলাম প্রচার আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে প্রথম হজ্জ সম্পন্ন করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের উলামা ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সফর করেন। ১৯৮৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়াও গমন করেন। এছাড়া তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ বিভিন্ন সময়ে সফর করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৪০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থখানি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় তিনি "তফসীরে নূরুল কোরআন" শীর্ষক মৌলিক ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এর ১২তম খণ্ড পর্যন্ত ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনায় যেমন তৎপর রয়েছেন তেমনি ইসলামের প্রচার-প্রসারেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এই প্রখ্যাত তফসীরকার প্রতি শনিবার ঢাকার আব্দুল হাদীলেন মসজিদে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক তফসীর বর্ণনা করেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি উর্দু ও আরবীতে বক্তৃতা করেন। এসব ছাড়াও তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতিব, মাসিক আল-বালাগ পবিত্রকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ইসরামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বোর্ড অব গভর্নর্সের সদস্য জাতীয় জাকাত বোর্ডের সদস্য, জাতীয় চাঁদ দেকা কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের তফসীরে তাবারী প্রকল্পের সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন একাডেমিক কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিয়্যু কমিটির চেয়ারম্যান, আল-নাহইয়ান ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ এবং ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক সিলেকশন কমিটির সদস্য সহ বহু মাদ্রাসা ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তিনি ঢাকা রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে নিয়মিত পবিত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করেন।

তিনি তার মৌলিক রচনার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কারে (১৯৮৯) সম্মানিত হয়েছেন।